প্রথম প্রকাশ ঃ ৩১শে ভাদ্র ১৩৪৭

প্রকাশক ঃ প্রশান্ত তালুকদার
১৫বি, টেমার লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ প্রশান্ত তালুকদার
গদাধর প্রিণ্টার্স
৪২/৬/১এ, মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা-৬৭

প্রচ্ছদ ঃ বিমান নন্দী

উৎসর্গ

অনিল গুপ্ত ও সমর গুপ্ত

সহৃদরেষু

অন্দরমহল
অন্দরমহল
অন্দরমহল

আজ তাঁর চল্লিশ বছর পূর্ণ হল

টয়লেট কেস-এর ডালায় বসানো হেলানো আয়নায় তিনি তাঁর নিজের শান্ত মুখশ্রী দেখলেন।

সেই কবে তাঁর ষোল বছরের জন্মদিনের দিন, এই একই আয়নায় নিজের যে-মুখশ্রী দেখেছিলেন, মনে মনে তিনি তাঁর আজকের এই মুখের সঙ্গে তুলনা করছিলেন।

সেদিনটা ছিল ফুলশয্যাব পরদিন। অভ্যাসমত খুব ভোরেই উঠেছিলেন। আনকোরা নতুন পোষাক পবে এই ঘরটিতে ঢুকে প্রসাধন করাব টেবিলে বসলেন। নিজস্ব শান্ত ধরনে, স্থিবচরিত্রে নিশ্চল বসে তিনি নিজের কাঁচ মুখেব প্রতিবিম্বেব দিকে তাকালেন।

গতকাল আমি যে-রকম ছিলাম, আজও কি আমাকে সেরকমই দেখাচ্ছে! ফুলশয্যার পরদিন ভোরবেলায উঠে মনে মনে ভাবছিলেন তিনি।

খুঁটিযে খুঁটিযে সেদিন তিনি তাঁব মুখটা দেখছিলেন। চওড়া নিচু কপাল, টানা-টানা চোখ, ছোট্ট নাক, তার পাশে দুই গালেব ডিম্বাকৃতি উঁচু জায়গা, থুতনি, এবং ছোট লালচে ঠোঁট। সেদিন ভোববেলা যা ছিল টুকটুকে লাল। আজও ঠিক তাই আছে। এমন সনয় দ্রুত পাযে ঘরে ঢুকল ইং, তাঁর নতুন পরিচারিকা।

ও দিদিমনি—হেই মাগো, বৌদি! থতমত খেয়ে ইং বলল। আমি তো ভেবেছিনু যে তোমার উঠতি বেলা হবে গো বৌদি। ইংয়ের দুই গাল রক্তোচ্ছ্বাসে ঝকঝকে দেখাচ্ছিল।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর রক্তিম অধরোষ্ঠের ওপরে, দুই গালে মুক্তোর ম্লান আভা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই লেগে রয়েছে। তিনি ধীরে ও মৃদুস্বরে বললেন, ভোরে ওঠাই আমার অভ্যেস। এই কণ্ঠস্বর শুনে গত রাত্রের অপরিচিত যুবকটি বলেছিল যে তাঁর গলা নাকি পাখির গানের মূর্ছনার মত।

চব্বিশ বছর পরে, ঠিক এই একই মুহূর্তে, তিনি যেন জানতেন [redacted] পরিচারিকার মনে তখন কোন স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। ভাব[redacted]

পেছনে দাঁড়িয়ে ইং কথা বলছিল। তার হাত শ্রীমতী ওয়ায়ুর কালো লতানো কেশভারের পরিচর্যা করছিল। অনেক দিন ধরে এই কাজ করে করে সে এখন চুলের দিকে না তাকিয়েও কাজটা করতে পারে। আয়নার বুকে ভেসে ওঠা কর্ত্রীর রূপসী মুখের দিকে চোখ রেখেও এখন সে অনায়াসে করতে পারে কাজটা।

অ্যাদ্দিনে তুমি একটুও বদলা নিকো বৌদি, ইং বলল।

তুই কি সেই সেদিনের ভোরবেলার কথা ভাবছিস নাকি রে? শ্রীমতী আয়নায় ইংয়ের চোখে স্নিগ্ধভাবে তাকিয়ে বললেন। এ-বাড়ির রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে কুড়ি বছর আগে ওর বিয়ে হয়। এখন ওর বেশ ভারি-ভাঁতিক চেহারা। অথচ তার কর্ত্রী যেরকম তন্বীটি ছিলেন, অবিকল সে-রকমই আছেন।

জোরে হেসে উঠে ইং বলল, না গো বৌদিমণি, সেদিনকার সকালবেলাটায় আমার কিন্তু তোমার চেইয়ে ঢের বেশী লজ্জা লাগছিল। হ্যাঁ গো, তখন কীসব ছাতামাতা ব্যাপারেও আমায় কেমন লজ্জা এসে বেড়িয়ে ধরত, বুঝলে কি না! আর দ্যাখো মাগ-ভাতারের মধ্যে যা হয়, তা আর নতুন কী। কিন্তু তখন মনে করতাম, কী যেন যাদু আছে ওরি মধ্যে! শ্রীমতী ওয়ায়ু নিঃশব্দে হাসলেন।

কথা বলার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাঁর খাস ঝিকে। তবে যখন তাঁর কথাবার্তা চালিয়ে যেতে আর ইচ্ছে করত না, তখন তিনি তার কথার উত্তরে সংক্ষিপ্ত হাসি হাসতেন এবং তারপর চুপ করে থাকতেন। সে-ও তখন চুপ করে যেত।

চুলের একটা ছোট কুণ্ডলী নিয়ে সে কিছুটা বিরক্ত হবার ভান করল। ঠোঁট ফাঁক করে সেটাকে ঠিক করে ঝুলিয়ে দিয়ে দু'দিকে দুটো ক্লিপ দিয়ে কুণ্ডলী দুটো সযত্নে ঠিকঠাক করে তারপর হাতে একটা সুগন্ধি ক্রীম নিয়ে কর্ত্রীর সুচারু করপল্লবে মাখিয়ে দিল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর সুন্দর নিটোল গলায় বললেন, আমার জেডপাথরের দুলটা? তাঁর গলার স্বর এত রমনীয় ছিল যে তাতে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যেত।

আমি জানতুম, তুমি আজ ও-দুটো পরতে চাইবে। আমিও তাই ও দুটো বের করে রেকিচি, ইং বুঝদারের মত বলল।

সে বেগুনী ফুলতোলা রেশমী কাপড়ে মোড়া একটা ছোট বাক্স থেকে দুল দুটো বের করে তার কর্ত্রীর ছোট্ট কানে যত্ন করে পরিয়ে দিল।

... বছর আগে, যখন সে তার কর্ত্রীকে তাঁর জরির পাখি ও ফুলের নক্সাতোলা ... মখমলের স্কার্টের ওপর, টকটকে লাল রংয়ের ঢোলা হাতা মখমলের ... পরিয়ে দিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে দাদাবাবু এ-ঘরে ঢুকেছিলেন।

তাঁর হাতে ছিল এই বাক্সটা। তাঁর সুন্দর চোখে তখনও লেগে ছিল ঘুমের সুস্বাদু তৃপ্তি। নিপুণ শিষ্টাচার অনুযায়ী তিনি ঝির সামনে নতুন বৌর সঙ্গে কথা বললেন না। শুধু ইংয়ের হাতে বাক্সটা দিয়ে বললেন, তোর হুজুরাইনের কানে এটা পরিয়ে দিস।

সবুজ জেড পাথরের নিখুঁৎ স্বচ্ছতা দেখে ইং অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠে নতুন কর্ত্রীর চোখের সামনে তুলে ধরল দুল দুটো।

এক মুহূর্তের জন্য সেই চোখ দুটি তরুণ স্বামীর চোখের দিকে তাকাল, তারপর মধুর লজ্জার পীড়নে নেবে এল সেই চোখের পাতা। প্রায় ফিসফিস করে গুঞ্জনের মত বললেন, খুব সুন্দর, ধন্যবাদ।

তিনি মাথা ঝাঁকালেন। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুল পরানো দেখলেন। আয়নাতেই শ্রীমতী ওয়াং তাঁর মুখ দেখছিলেন। ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন গর্বিত এক যুবকের সুন্দর পরিপূর্ণ মুখচ্ছবি। আহ, পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। আয়নায় দুজনের চোখাচোখি হল। একে অপরের রূপ দেখলেন।

এই যা তো, বেশ গরম দেখে চা নিয়ে আয় আমার জন্য। হঠাৎ ইংকে বললেন। তাঁর গলার শব্দে সচকিত হয়ে ইং ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে গেল। আবার তারা দুজনে একা। যেমন গত রাত্রিতে ছিলেন। তিনি ঝুঁকে পড়লেন নব-পরিণীতার দিকে। তাঁর দুই কাঁধে নিজের দুই হাত রাখলেন। আয়নায় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর রমণীর দুই চোখের দিকে। যদি তুমি কুৎসিৎ দেখতে হতে, তবে কাল রাত্রিতেই তোমাকে আমি শেষ করে দিতাম। কুৎসিৎ মেয়েদের আমি ঘেন্না করি, তিনি বললেন।

চিত্রার্পিতভাবে বসে থেকে, উত্তরে তিনি শুধু অল্প একটু হাসলেন। তারপর তাঁর সুন্দর গলায় বললেন, কেন একেবারে মেরে ফেলার দরকার কী? বাপের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেই তো যথেষ্ট হত।

সেদিনের সকালবেলাটা ভারি চিন্তার মধ্যে কেটেছিল। এই লোকটা, যে তাঁর স্বামী, সে যত সুন্দর দেখতে ততটা বুদ্ধিমানও হবে! সেটা কি খুব বেশী আশা করা যাবে? কিন্তু যদি সত্যি সত্যি সে তাই হয়?

চব্বিশ বছর পরে, এই মুহূর্তে ইং বলে উঠল, তোমার কানে বৌদিমনি এই জেড পাথরের দুলটা আগের মতই সোন্দর দেখাচ্ছে গো। কালশেধরা অন্য কোনো গিন্নী এসে বলুক দেখি এমনটি হয় তাদের? আর হ্যাঁ, দাদাবাবু যে আবার একটা বিয়ে করে আনলনি তাতে এই আমি কিন্তু এট্টুও অবাক হইনি।

অত জোরে চেঁচিয়ে কথা বলিস না তো। উনি এখনও ঘুমোচ্ছেন, শ্রী[redacted] ওয়াং বললেন।

আজ তোমার চল্লিশ বছর হয়ে গেল ! বছরকার একটা দিন এই জন্মদিন। এদিন বাপু দাদাবাবুর একটু তাড়াতাড়ি ওঠা উচিৎ ছেল, বলে হাতের তালুর উল্টো পিঠ দিয়ে ইং তার নাকটা ঘসে নিল।

এ-বাড়িতে এত বছর ধরে কাজ করার জন্য ইংয়ের মনে হয়, সে দাদাবাবুকে চেনে। আর একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত যে, যে-বৌদিকে গোটা বাড়ির লোক এত ভালবাসে তাঁকে দাদাবাবু যতটা যত্ন করেন ততটা যেন সমাদর করেন না। হ্যাঁ, একান্নবর্তী এ-বাড়ির ষাটজন মানুষের মধ্যে এমন কে আছে যে-নাকি শ্রীমতী ওয়ায়ুকে ভালবাসেন না। বুড়ী ঠাকুমা থেকে ক্ষুদে নাতিটি পর্যন্ত সকলে তাঁকে ভালবাসে। এমন কি চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত। ঝেঁটিয়ে দরজার আড়ালে জড়ো করে রাখা ধূলোটুকু হুজুরানের চোখে পড়েছে বলে কোন ঝিকে তাদের মহলে বসেও কি কখনো ক্ষোভ প্রকাশ করতে শোনা গেছে ! ইং কান ঝাড়ল।

এটা ওয়ায়ু বংশের বাড়ি। ওয়াং বা হুয়াদের মত সাধারণ ঘর না। সে গলা জড়িয়েই বলল কথাটা। শুনে রান্নার বড় ঠাকুর বরাবর তার দাঁতের পাটি বের করে হেসেছে। স্বামী হিসেবে সে সারা জীবন জেনে এসেছে যে ইংয়ের চোখে তার কর্ত্রীর তুলনায় সে কিছুই নয়।

তবে এ-বাড়ির দুই পুত্রবধূরও কোন নালিশ নেই মনে। যে দুটি ক্ষীণ করতল শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর কোলে অঞ্জলিবদ্ধ করে রাখতেন, সংসার-পরিচালনার ব্যাপারে তা ছিল যেমনি দৃঢ় তেমনি মমতাময়।

সকালের খাবার নিয়ে আয়। খেয়ে নিয়ে বড় খোকার সঙ্গে কথা বলব। দুপুরের ভোজের আগে এসে আমার পোষাক পালটে দিবি। আর দেখিস, তোর দাদাবাবু কখন ওঠেন, উঠলে আমায় জানাস।

নিশ্চয় নিশ্চয়, সে আর আমায় বলতে হবে নি গো ? বলে ইং পড়ে-যাওয়া চিরুনীটা তুলে নিল মেঝে থেকে। সুগন্ধি চন্দনকাঠের চিরুনী। গন্ধটা শ্রীমতী ওয়ায়ুর বড় প্রিয়।

চিরুনী থেকে কয়েকটা চুল বের করে আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে, নীল পোর্সিনিলের বয়ামে রাখল। কর্ত্রীর যখন অনেক—অনেক বয়েস হবে সেদিনের জন্য এই খসা চুলগুলি সে সঞ্চয় করে রাখছিল। এমনও হতে পারে যে তখন তিনি তাঁর কেশসজ্জায় এগুলো লাগাতে চাইতে পারেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

[redacted] দিনটির জন্য তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন।

[redacted] ধনী ও বনেদী পরিবারের গিন্নীর চল্লিশ বছরের জন্মদিন এক বিশেষ [redacted] দিন.

বাইশ বছর আগে তাঁর শ্বাশুড়ী কীভাবে এই দিনটি পালন করেছিলেন, তা মনে পড়ল তাঁর।

সেদিনই তার শাশুড়ী তাঁর পুত্রবধূর হাতে বহু পরিজনসমন্বিত এই বিশাল বাড়ি ও সংসার পরিচালনার ভার অর্পণ করেছিলেন। গত বাইশ বছর ধরে সেই গুরুদায়িত্বভার পালন করে এসেছেন শ্রীমত ওয়ায়ু। সংসারের হালচালের বহিরঙ্গ দিকটায় তেমন কিছু বদলালেও তার ভেতরে অনেক পরিবর্তন সাধন করেছেন তিনি এই সময়ের মধ্যে। সুকৌশলে সন্তর্পণে করতে হয়েছে ঐসব পরিবর্তন, যাতে তার প্রৌঢ়া শাশুড়ী না খেয়াল করতে পারেন।

এই যেমন পূবের বাগানে পিওনীকুঞ্জগুলিতে কী ঝোপড়াই না হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু সেগুলি সব তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন মনে মনে। এই ঘরগুলির ঠিক লাগোয়া জায়গাটায় পিওনী গুল্মগুলি যথারীতি এক শীতে মরে গেল। মানে তিনিই মরে যেতে দিলেন। তারপর বসন্তকাল এলে, যখন দেখা গেল যে পিওনী গুল্মগুলি তাদের রাঙা মশালের মত শীষ উঁচিয়ে ধরে নি, তখন তিনি শাশুড়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝালেন যে পিওনী গুল্মগুলি নির্ঘাৎ জমির উর্বরাশক্তি শুষে নিচ্ছে এবং হাওয়াটাও খারাপ করে দিচ্ছে, অতএব···দু-এক বছরের জন্য এখানে অন্য কিছু লাগালে কেমন হয়! মাত্র আঠারো বছর বয়স তখন তাঁর। তিনি দ্বিধান্বিতভাবে বললেন নার্সিসাস? নয়ত অঁকিড? অথবা অন্য কোন ফলবাহারী গুল্ম? আপনি যেমনটি বলবেন মা, সেটাই হবে। যেটা পুঁতলে আপনি খুশি হবেন, সেটা বেছে দিন।

ইচ্ছে করেই অঁকিডের নামটা মাঝখানে রাখলেন। অঁকিড তাঁর দারুণ প্রিয়। অঁকিডের নামটা মাঝখানে বলায় শাশুড়ী ঠাকরুণ নিশ্চয়ই ভাববেন যে তিনি এর পক্ষপাতি নন।

অঁকিড, শাশুড়ী রায় দিলেন। এমনিতে ছেলের বৌকে তিনি ভালই বাসতেন কিন্তু নিজের কর্তৃত্ব জাহির করার লোভও ছিল তার দুর্নিবার।

অঁকিড, বেশ হবে; তিনিও মেনে নিলেন।

পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর অঁকিড-বাগান হয়ে উঠল শহরের সেরা বাগান। সেখানে তিনি অনেক সময় ব্যয় করতেন।

এখন, বছরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে, অঁকিডের অভিজাত রূপালী-ধূসর কুঁড়িগুলি ফুটতে শুরু করেছে। অষ্টম মাসে ঘোর রক্তবর্ণ অঁকিডগুলির [illegible] উঁচুতে মাথা তুলবে। নবম মাসে জাগবে হলুদ অঁকিডের ফুলগুলি।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে তিনি ধূসর রংয়ের দুটি গন্ধহীন [illegible]

নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

এর মধ্যে সকালের খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল ঘরে।

সামান্য খাবার। সকালে তিনি বেশী কিছু খেতে পারেন না। চা, চালের তৈরী একটা খাবার, দ্বটো বা তিনটে প্লেটে কিছু শুকনো নোনতা মাংস ঘরের মাঝখানের চৌকো টেবিলটায় সাজানো ছিল। তিনি বসে হাতির দাঁতের কাঠি দ্বটো হাতে তুলে নিলেন; কাঠি দ্বটোর শেষ দ্বটি সরু রূপোর শেকলে সংলগ্ন ছিল।

হাসিমুখে একজন ঝি একটা প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাতের প্লেটে দীর্ঘ জীবনের প্রতীক মোড়া রুটি। গরম। ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। পাঁচ ফলের রসে তৈরী রুটিটা অমরত্বের প্রতীক। প্রত্যেকটা রুটিতে লাল রং ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরো অনেকদিন বেঁচে থাকো গিন্নী মা! খসখসে কিন্তু আন্তরিক গলায় বলল ঝিটি।

সে বলল, আমাদের গিন্নীমা যে এই সাতসকালে মিষ্টি খাবার খেতে পারেন না, সে আমি জানি। তবে এ-সব পয়মন্ত খাবার আমাদের যে আনতিই হবে। ঠাকুর নিজের হাতে বানিয়েছে এসব।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ। তোমাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি, মৃদ্বস্বরে উচ্চারণ করলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

সৌজন্যবশতঃ, তিনি একটি ধোঁয়া-ওঠা রুটি তুলে নিয়ে, সেটি ভাঙলেন। বীন গুঁড়ো করে লাল চিনির সঙ্গে মিশিয়ে ভেতরের গাঢ় রংয়ের মিষ্টি পুরটা বানানো হয়েছে।

বেশ উৎসাহিত হয়ে ঝি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে উঁচু পর্দায় ফিসফিসিয়ে বলল, আপনাকে বলে দেওয়াটা আমার উচিত হবে না। তবে কিনা এ-বাড়ির মঙ্গল চিন্তা করি বলেই বলা। বুঝলেন কিনা গিন্নীমা, ওই যে বুড়ো ঠাকুরটা, সে না আপনার কাছ থেকে জ্বালানী ঘাসের দাম তিনগুণ বেশী নিচ্ছে। গতকাল বাজারে গিয়ে আসল দরটা জানতে পারনু—সত্যি, এখন দর চড়েছে, কারণ নতুন ঘাস এখনও বাজারে ওঠে নি—কিন্তু আশীর দরে এক বোঝা। ওতে যত চাও পাবে। তবু কিনা মিনসে দ্বশোর দর নিচ্ছে! রক্ষে করো মাগো! জানো! গিন্নীমা ওর ভারি ঠ্যাকর, ভাবে ওর মাগী ইং তোমার খাস ঝি বলে ও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কী কাণ্ডর কাণ্ড, মা ঠাকরুণ, সে যদি তুমি দেখতে!

শ্রীমতী ওয়ায়ুর পরিষ্কার কালো চোখ দূরত্বের আভাস টেনে নিল। তিনি [illegible]লেন, এবার যখন সে হিসেব নিয়ে আসবে তখন মনে করে দেখতে হবে। [illegible]। তাঁর গলা নিরুত্তাপ ও অবিচল শোনাল।

একটু সময় অপেক্ষা করে ঝি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী ওয়ায়ু হাত থেকে ঝুটিটা নাবিয়ে রেখে কাঠি দুটো দিয়ে এক টুকরো নোনতা মাছ তুলে নিলেন।
মনে আগের চিন্তাস্রোত বয়ে যেতে লাগল আবার। আজকের দিনে মেং-এর হাতে এই সংসারের কর্তৃত্বভার ছেড়ে দেবার কোন অভিপ্রায় নেই তাঁর। মেং বড় খোকার বৌ।
সবচেয়ে বড় কারণ হল এই যে খোকারা চার ভাই। দুটির বিয়ে হয়েছে। অথচ তাঁর শাশুড়ীর ছিল মোটে একটি ছেলে। কাজেই জায়ে জায়ে মন কষাকষির কোন প্রশ্নই ছিল না তাঁর নিজের বেলায়। তাছাড়া মেং এখনও ভারি ছেলেমানুষ।
লিয়াংমোকে বনেদী কায়দায়ই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিজেই তার বড় বৌমাকে নির্বাচন করেছিলেন। বৌমা তাঁর পুরানো সাথী শ্রমতী ক্যাং-এর মেয়ে।
এত তাড়াতাড়ি লিংয়ামোকে বিয়ে দিতে তিনি চান নি। মাত্র উনিশ বছর বয়েস ছেলেটার। তবে মেজটা, মানে সেমো সাংহাইর একটা স্কুলে পড়ত। ওখানেই ওর চেয়ে দু-বছরের বড় একটা মেয়েকে দেখে ছোঁড়া এমন মজে যায় যে তাকে বিয়ের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা এখন এ-রকম দাঁড়াচ্ছে যে মেজবৌমা রুলাং তার বড় জার চেয়ে বয়সে বড়, অথচ বড় বৌমা তা সত্ত্বেও সব দিকেই সেরা।
এখন এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে (এর জন্য শ্রীমতী ওয়ায়ু নিজেকেই দোষারোপ করেন, মেজছেলের ওপর আরও সতর্ক নজর রাখা উচিত ছিল বৈ কী) এখন তাঁর একমাত্র উদ্ধার পাবার পথ হচ্ছে আরো কয়েক বছর স্থিতাবস্থা বজায় রাখা অর্থাৎ নিজের হাতে কর্তৃত্বভার রাখা। এই সময়ের মধ্যে অন্য কিছুও তো ঘটতে পারে।
কাজেই তিনি আজ আর অনুরূপ ঘোষণা করবেন না।
তাঁর পরিবার কর্তৃক আয়োজিত ভোজে যোগ দেবেন এবং তাদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করবেন। তাঁর পরম প্রিয় নাতিদের আদর করবেন। তারপর শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করবেন। এই ভোজে যোগ দেবার জন্য দুপুরেই তাঁর শয্যা ছেড়ে উঠবেন।
এই দিনটির জন্য শ্রীমতী ওয়ায়ু বহুদিন থেকে প্রতীক্ষা করে আছেন। এই প্রতীক্ষায় মিশে রয়েছে স্বস্তি ও এক ধরণের শান্ত বিষাদ।
তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব অতিবাহিত হয়ে গেল।
দ্বিতীয় পর্বের সবে সূত্রপাত হবে।

বয়সকে ভয় পান না তিনি ; বয়স তাঁকে এনে দিয়েছে মর্যাদার মুকুট। এরপর থেকে প্রত্যেকটি বছরেই তিনি সংসার ও বন্ধুদের কাছ থেকে পাবেন আরও মর্যাদা ও শ্রদ্ধা।

সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলার আতঙ্কও তাঁর নেই।

কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন তাঁর রূপের। এখন তাঁর সেই রূপ অনেক বেশী প্রকাশ পাচ্ছে। বয়েসকালে যেসব ঝলমলে বাহারী রংয়ের পোষাক পরিচ্ছদ তিনি পরতেন, এখন তা আর না পরলেও তাঁর মুখ ও ত্বকের মসৃণ ভাবটা আগেব মতই পরিপাটি ভাবে মানিয়ে যায় এখনকার কোমল রূপালী নীল ও ধূসর সবুজ রংযের পোষাকগুলির সঙ্গে। তাঁর কাছে বয়েস এনে দিয়েছে সূক্ষ্ম মার্জিত ও অনন্দময় গৌরব. কিছু হারানোর দুঃখ তাই তাঁর নেই।

আর নিজেকে এখনও যথেষ্ট রূপসী বলে জানেন বলেই, যে-পরিকল্পনা তিনি করে ছিলেন সেই অনুযায়ী কাজ করতে আজ তিনি উদ্যত হয়েছেন। যে-নারী তার সৌন্দর্য হারিয়েছে, সে ঈর্ষা বা পরাজয়ের গ্লানিব আবর্তে পড়ে, এ-কাজ করতে হয়ত ইতঃস্তত করত! তাঁব ক্ষেত্রে সেকথা ওঠে না।

ঈর্ষা করার কোনই কারণ নেই তার। যা তিনি আজ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, তা তাঁরই নিজের সহজ ও শান্ত ইচ্ছার সিদ্ধান্ত।

ছোট হাজরী খাওয়া হয়ে গেল। বিশাল বাগানের এক কোণে তাঁর নাতিদের নিযে আয়ারা খেলা দিচ্ছে, যতক্ষণ ওদের বাবা-মা না ওঠে ৩তক্ষণ ওরা খেলবে। বাড়ির সবাই এখনও ঘুমে।

তাঁর নির্দেশ না পেলে বাচ্চা নাতিদের কখনোই তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয় না। কাজেই তাঁর ঘরের সামনের অদূরে একটা কলরব শুনে তিনি একটু অবাক হয়ে তাকালেন সেদিকে।

একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আমার বান্ধবীর চল্লিশ বছরের জন্মদিন তো রোজকার ঘটনা নয়। তা আমি কি তাড়াতাড়িই এসে জুটলাম নাকি?

হ্যাঁ চিনতে পারলেন। বড় বেয়ানের গলা। বড় বৌমা মেং-এর মা শ্রীমতী ক্যাং-এর গলা। তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছেন।

আরে! এসো এসো, দু-হাত বাড়িয়ে তিনি অভ্যর্থনা করলেন। টেবিল থেকে সেই জাপানী ধূসর রংয়ের অর্কিড ফুল দুটি এক হাতে ধরে তিনি বান্ধবীকে স্বাগত জানালেন।

[redacted] পেরিয়ে শ্রীমতী ক্যাং এগিয়ে আসছিলেন; এখন তিনি বেশ মুটিয়ে গেছেন, অথচ তাঁর বান্ধবী যথেষ্ট তন্বী। শ্রীমতী ওয়ায়ুকে তা সত্ত্বেও

যথেষ্ট ভালবাসার মত মানসিক উদারতার অভাব তাঁর হয় নি। আইলীয়েন, বেঁচে থাকো, চিরজীবী হও। হ্যাঁরে, আমিই কি প্রথম বলছি নাকি ?

তোমার কাছ থেকেই প্রথম শুভেচ্ছা পেলাম। চাকর-বাকরেরা অবিশ্যি শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, শ্রীমতী ওয়ায়ু হেসে বললেন।

তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এসেছি এমন নয়, বলে শ্রীমতী ক্যাং বিরক্ত দৃষ্টিতে ইংয়ের দিকে তাকালেন। ঝিটা তাঁকে দেরী করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। এ-বাড়িতে এটা নিয়ম যে শ্রীমতী ওয়ায়ুর প্রাতরাশ খাবার সময় কেউ তাঁকে বিরক্ত করবে না। কারণ, তাহলে শ্রীমতী ওয়ায়ু আর খেতে পারবেন না। এজন্য ইংকে মোটেই লজ্জিত দেখা গেল না। শ্রীমতী ক্যাংকে কেউই ভয় করত না। এমন কি স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে তার মনিবানির সঙ্গে সকালবেলা ঘণ্টাখানেক সময়ের জন্যও দেখা করতে চাইলে ইং তা মঞ্জুর করবে না।

অন্য কেউ না এসে তুমি আসতে ভালই হয়েছে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। তারপর বান্ধবীর মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাপাকলির মত আঙুলগুলি জড়িয়ে তিনি তাঁকে অর্কিড বাগানে নিয়ে গেলেন।

একটা নুয়ে-পড়া উইলো গাছের নিচে বাঁশের তৈরী দুটো চেয়ার বসানো ছিল। তাঁরা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের পায়ের কাছে ডিম্বাকৃতি একটা জলাধার।

জলাধারের নিচে জলজ লিলির শিকড় দেখা যাচ্ছে। জলের ওপর দুটি নীল লিলি ফুল ভেসে রয়েছে। শ্রীমতী ওয়ায়ু পদ্মফুল তেমন পছন্দ করেন না। ওই ফুলগুলি ভারি মোটাসোটা, ওদের গন্ধও চড়া। ছোট ছোট লাল নীল মাছ জলের মধ্যে ফুলের পাশে পাশে খেলা করছে, স্থির হয়ে থাকছে তাদের মুখ প্রায় জলরেখার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে। সেখানে কোন খাবার-দাবার না দেখে চকিতে সরে যাচ্ছে ওদের হালকা পুচ্ছ জলের মধ্যে সঞ্চালিত করে। তোমার বড় খোকার ছেলেটা কেমন আছে গো ? শ্রীমতী ওয়ায়ু তার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর যখন চারটি ছেলে ও তিনটি সন্তান হয় (যার মধ্যে একটি ছিল মেয়ে) যে তিনটি সন্তান পরে মারা যায়, শ্রীমতী ক্যাং তখন এগারটি সন্তানের জন্ম দেন। এর মধ্যে দুটিই ছিল মেয়ে। এ-বাড়ির অঙ্গণে যে শান্তি রয়েছে, শ্রীমতী ক্যাং-এর বাড়িতে তার কণা মাত্র নেই। এই সাদাসিধে মোটাসোটা মানুষটাকে ঘিরে অনবরতই চলেছে সন্তান ও ঝি-চাকরদের কলরব। তা সত্ত্বেও শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর বান্ধবীকে ভালবাসতেন। তাঁদের

মায়েরা ছিলেন পরস্পরের বন্ধু। যখন একজন অন্যজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তখন তাঁরা তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। যখন তাঁরা সারা দিন-রাত ধরে দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হয়ে থাকতেন, তখন তাদের কন্যা দুটি সহোদরার মত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত।

আমার সে-নাতিটা ভাল নেই রে। ভাবছি ওকে ওই সাহেবদের হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে যাব নাকি। তুমি কী বল, শ্রীমতী ক্যাং বললেন। তার রক্তিম গোলাকার মুখ, যা থেকে এতক্ষণ আলো ঠিকরে পড়ছিল, তা হঠাৎ নিষ্প্রভ দেখাল।

সে কী! একেবারে সঙ্কট অবস্থা নাকি? বিষয়টা ভাবতে ভাবতে শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

হতেও বা পারে কয়েক দিনের মধ্যে। শ্রীমতী ক্যাং বললেন, ওরা বলে কি যে ওই বিদেশী ডাক্তারগুলো নাকি রোগীকে কাটাছেঁড়া না করে তার রোগ ধরতে পারে না। তার নাতিটা যে একেবারে কচি, পাঁচ বছরের বাচ্চা মোটে। আচ্ছা বোন, তুইই বল—ও কি সেই কাটা-ছেঁড়ার ধকল সইতে পারবে?

অন্তত আগামীকাল অবধি দেখে নাও। আজকের দিনটা নষ্ট করে কাজ নেই। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। পাছে স্বার্থপরতা হয়ে যায় এই ভয় করে তিনি আবার বললেন, এর মধ্যে আমি না হয় আমার দিদার মার দেওয়া একটা ওযুধ পাঠাচ্ছি ইংয়ের হাতে। ওর এ-রকম কাশির পক্ষে ওষুধটা ভারী উপকারী হতে পারে। আমার বড় আর মেজ ছেলের অসুখের সময় ওষুধটা ব্যবহার করে ফল পেয়েছি। ওদের বাবাকে একাধিকবার ওষুধটা দিয়েছি। জানোই তো গেল দু-শীতে এই কাশিতে ওঁর কি ভোগান্তি গেছে।

আইলীয়েন, তোর এত মায়া! শ্রীমতী ক্যাং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বললেন।

ভোরবেলা। বাগানে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এর মধ্যে নিজের আস্তিনের ভাঁজ থেকে একটা ছোট পাখা বের করে শ্রীমতী ক্যাং হওয়া খেতে খেতে বললেন, বরফ গলে গেলেই আবার গরম লাগতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ তাঁরা নীরবে বসে থাকলেন। শ্রীমতী ক্যাং প্রীতিপূর্ণ এবং ঈর্ষাহীন চোখে তাঁর বান্ধবীর দিকে তাকালেন, আইলীয়েন, তোকে জন্মদিনে কী দেব ভেবে না পেয়ে এটা নিয়ে এলাম, দ্যাখ—

তিনি তার ঢিলেঢালা মখমলের পোষাকের পকেট হাতড়ে ছোট একটা বাক্স বের করে এনে তাঁর বান্ধবীর হাতে দিলেন।

হাতে নিয়েই বাক্সটা চিনতে পারলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু. এই মিচেন, তুই তোর মুক্তোটা আমাকে দিচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ রে! শ্রীমতী ক্যাং-এর নিরীহ মুখের ওপর দিয়ে একটা বেদনার রেখা চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।
কেন দিচ্ছিস? দেখতে দেখতে শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন। একটু ইতস্তত করে শ্রীমতী ক্যাং বললেন, গেলবার যখন এটা পরেছিলাম, ছেলেদের বাপ দেখে বলল, ঠিক যেন তরমুজের ওপর শিশরবিন্দু জমে আছে।
শ্রীমতী ক্যাং হাসলেন। তাঁর চোখে জলের আভাস দেখা দিল। তিনি খেয়াল করেন নি। সেই অশ্রুবিন্দু তাঁর গাল বেয়ে নেবে বুকের পুরু সাটিনের পোষাকে পড়ে জমে রইল, মিলিয়ে গেল না। শ্রীমতী ওয়ায়ু লক্ষ্য করলেন, কিন্তু বুঝতে দিলেন না।
চেয়ারে বসে তিনি একটুও নড়লেন না। হাতে মুক্তোর বাক্সটা তেমনি ধরা আছে। অনেকবারই তিনি তার এই বান্ধবীটিকে শ্রীযুক্ত ক্যাংকে নিয়ে তাঁর নানান অসুবিধার কথা জানাতে দেখেছেন। তবে ক্যাং-দম্পতি কখনোই শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর সঙ্গে কথা বলেন নি। ওই শ্রীমতী ক্যাং যা দু-একটা কথা বলেছেন তা ছাড়া অবশ্য।
আর আইলীয়েন, তোর কর্তাটি বেশ, তাঁকে নিয়ে তোর কোন ঝামেলা পোয়াতে হয় না রে। এ-পর্যন্ত তাঁকে কখনো বাপু কোন ফুলবাগানে মধু খেতে ঢুকতে শুনলাম না, আর আমার কর্তাটি—না, সে-ও ভাল। তবে হ্যাঁ কেবল—
এ জায়গায় এসে শ্রীমতী ক্যাং বরাবরই চুপ করে যান, তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন।
অনেক বছর আগে শ্রীমতী ওয়ায়ু একবার বলেছিলেন. আচ্ছা মিচেন, ভদ্রলোক রোজই যখন ভোর রাত্রে বাড়ি ফেরেন, তখন যতদূর ওর প্রাণ চায় ভোগ করে নিতে দে না।
এ-কথা শুনে বান্ধবীর সজল দুই চোখে যে লজ্জা নেমে আসতে দেখেছিলেন তা তিনি কখনো ভুলবেন না। শ্রীমতী ক্যাং বলেছিলেন. ঈর্ষায় আমার বুক ফেটে যায় রে, আমার হিংসে হয়, এত হিংসে হয় যে মনে হয় আমার রক্তে বুঝি আগুন ধরে গেছে।
ঈর্ষার সঙ্গে অপরিচিত শ্রীমতী ওয়ায়ু চুপ করেই থাকতেন। তাঁর বান্ধবীর এই দিকটা তিনি মোটে বুঝতে পারতেন না। আর যখনই তিনি তাঁর বান্ধবীর স্বামীর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ক্যাং-এর কথা ভাবতেন তখন সেই সাধারণ ধনী ব্যবসায়ীটি, যে নাকি ভাল দেখতেও না, এমন একজন লোকের ছবি ভেসে উঠতো। এঁকে নিয়ে বান্ধবীর এত মনোকষ্টের কারণও তিনি বুঝতে পারতেন না। ভদ্রলোক চতুর, তুখোর—কিন্তু বুদ্ধিমান নন। এমন লোকের বৌ হয়ে যে কী সুখ তা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না।

অনেকদিন ধরেই তোকে একটা কথা বলব বলে ভাবছি। একটু থেমে তিনি বললেন, প্রথম যখন এটা মনে এল তখন ভেবেছিলাম যে তোর সঙ্গে পরামর্শ করব—তোর মতামত নেব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। এখন মনে হচ্ছে যে বিষয়টার জন্য আর কোন পরামর্শের দরকার নেই। এটা এখন অবধারিত হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী ক্যাং বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন। মাঝে মধ্যে হাতপাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন। পাখার মৃদুমন্দ হাওয়া তাঁর চোখের জল শুকিয়ে দিয়েছিল। তিনি তাঁর অতিরিক্ত সৎ স্বভাবের জন্য যেমন সহজে কেঁদে ফেলতেন তেমনি আবার সহজেই হাসতেন। বান্ধবীর সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাপারেও তিনি জানতেন যে তাঁর স্থানটি ছিল দ্বিতীয়। এর মানে এই নয় যে তিনি সুন্দরী নন কিন্তু মনের দিক দিয়ে তিনি কোনমতেই শ্রীমতী ওয়াযুর গৃহিনীপনার অধিকারিনী ছিলেন না। কাজেই শত চেষ্টা করেও, এই বাড়ির মতই বিশাল ও সুন্দর তাঁর নিজের বাড়িটি ক্বচিৎ পরিচ্ছন্ন থাকত বা সুশৃঙ্খল থাকত। তাঁর নিজের উদ্যম সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত চাকর-বাকররাই সব সামলাত—আদর্শ নয়, তাৎক্ষণিক সুবিধা অনুযায়ীই তা নিয়ন্ত্রিত হত। এ-বাড়িতে পা দিলেই, এই তফাৎটা তাঁর কাছে বড় প্রকট হয়ে উঠত, যা তিনি নিজের বাড়িতে কখনোই টের পেতেন না!

কী যেন বলবি বলছিলি? শ্রীমতী ওযাযু তাঁর দীর্ঘায়ত চক্ষু দুটি তুললেন। চোখের সাদা জমির মধ্যে টলটলে দুটি আঁখিতারা যেন এক নীরব রহস্যময় ভাষায় ঘোষণা করছিল তাদের চাউনির চিরতারুণ্য। শান্ত স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, জানিস আমি ঠিক করেছি খোকাদের বাবাকে বলব যেন উনি একটা মেয়েমানুষ রাখেন মানে, উপপত্নী হিসেবে আর কী।

বলিস কী! তবে··তবে··উনি···উনিও···শ্রীমতী ক্যাং-এর ছোট্ট হাঁ-মুখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন।

না রে, তেমন কিছু না। মোটেই সেরকম কিছু নয়। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ও কী করে, তা আমি কখনো জিজ্ঞেসই করি নি। আমি বা সংসারের ব্যাপারে ও কিছু নয়। এটা শুধু ওর দিক চেয়ে—আর আমার জন্যও বৈকী।

তুই কী বলছিস—তোর জন্যও, শ্রীমতী ক্যাং জিজ্ঞেস করলেন।

হঠাৎ নিজের দাম্পত্য-জীবনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে হল তাঁর। এ-রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। সতীন হিসাবে স্বামীর রক্ষিতা পাকাপাকিভাবে বাড়িতে থাকবে এক পরিবারভুক্ত হয়ে—তার সন্তানরা বাড়ির ছেলেপুলেদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করবে! ভাবা যায়? তিনি বরাবর পুরুষের এক বিয়েরই পক্ষপাতী—না, না, এ যে বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার চেয়েও খারাপ!

আমি এটা চাই, স্বচ্ছ লিলিপুলের জলের গভীরে তাঁর দৃষ্টিকে অবগাহন করতে দিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। কিছুক্ষণ আগে তুলে-আনা অঁকিড ফুল দুটি তাঁর কোলের ওপর রাখা আছে—তারা এখনও তাজা। তিনি এত শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন যে তাঁর সংস্পর্শে এসে ছিন্ন ফুলগুলিও অনেকক্ষণ তাঁদের সজীবতা ধরে রাখতে পারত।

উনি রাজী হবেন ? উনি তোকে এত ভালবাসেন—শ্রীমতী ক্যাং গভীর হয়ে বললেন। প্রথমটায় নিশ্চয় হবেন না, প্রশান্ত গলায় উচ্চারিত হল।

খবরটা শুনে শ্রীমতী ক্যাংয়ের মনে অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল। তাঁর হাত থেকে হাতপাখাটা কখন খসে পড়েছিল খেয়াল করেন নি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা সেই মেয়েটাকে কে বাছবে—তুই না তোর কর্তা ? আচ্ছা আইলীয়েন, সেই মেয়েমানুষটা যখন পোয়াতি হবে, সইতে পারবি ? একই সংসারে এক মদ্দের দুই মাগী থাকলে কোঁদল অশান্তি লেগে থাকবেই, উঃ মা গো !

যদি আমার ইচ্ছেমত সে মেয়েমানুষ রাখে তবে আমার কোন অভিযোগ থাকবে না।

তুই যেন তোর কর্তাকে চাপ দিস নে বাপু।

ওঁকে আমি কখনোই চাপ দিয়ে কিছু করাই নি, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। একটা কাশির শব্দ শুনে দুজনেই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। দরজার কাছে ইং দাঁড়িয়ে আছে। তার গোলগাল হাসিখুশি মুখে দুষ্টুমির হাসি চিকচিক করছে, যার অর্থ তার কর্ত্রীর কাছে স্পষ্ট।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, আজকের দিনে যেন আবার বলিস না যে মিশনারীদের লিটল সিস্টার সিয়া এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা-মাখা খুশি ঝিলিক দিল।

তিনিই বটে গো, বলে হেসে ফেলল ইং। ভগবানের দোহাই, কিছুতেই শুনবে নি গো, আবার হেসে ফেলল ইং। দ্যাকো বৌদি, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তিনি মানা করলেও বুঝতে পারেন না। আমি কতবার বলনু যে. বৌদি এখন অতিথির সঙ্গে কথা কইচেন। তা কে বোঝে কার কথা।

জন্মদিন বলে নয়, ও'কে আমি নেমন্তন্ন করতে চাই না—শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। এত বোকা পাও নি আমাকে, হ্যাঁ। আমি ওনাকে বলিচি যে ক্যাং বৌদি আছেন এখানে। ইং জবাব দিল।

এবার তবে উঠি। আজ আর ওসব পরদেশী ধর্ম্ম-আলোচনা শোনার সময় নেই ভাই। আর হাতের কাজও ফেলে রেখে এসেছি। ওদের মায়ের

দিলে কাজ হবে না। শুধু তোকে এই উপহারটা দেবার জন্য এলাম, আইলীয়েন।

কিন্তু শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর মৃণাল-ভুজে বেষ্টন করলেন সখীকে, বস না লক্ষ্মীটি। মিচেন, আয় আমার সঙ্গে বসে না হয় একটু শুনবি। তবে আধ ঘণ্টার মধ্যে বিদায় না নিলে, না হয় চলে যাস তখন।

শ্রীমতী ক্যাং বসে পড়লেন আবার। যাকে ভালবাসেন তার কথা ঠেলে দিতে তিনি কখনো পারেন না।

ইং চলে গেল। একটু পরেই একজন শ্বেতাঙ্গিনীকে এনে হাজির করল, এই লিটল সিস্টার সিয়া এসেছেন।

এই যে শ্রীমতী ওয়ায়ু—এই যে শ্রীমতী ক্যাং। লিটল সিস্টার সিযা বললেন। তিনি পাতলা গড়নের লম্বাটে চেহারা, গায়ের রং পাণ্ডুর। মাঝবয়েসী। বাড়ি ইংল্যাণ্ডে। তাঁর মাথার চুল অল্প, বালির মত রঙ চুলের। মাছের মত চোখ দুটি। ফিনফিনে উঁচু নাক। ঠোঁট নীলচে। ধূসর রংয়ের ডুরে টানা সুতীর পাশ্চাত্য পোষাকে তাঁর বয়েস যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে সাজলে-গুজলেও তাঁকে কখনোই সুন্দরী দেখাত না। বহুদিন আগেই তাঁর সম্পর্কে এই দুই চীনা মহিলার সিদ্ধান্ত ছিল এ-রকম। তবে তাঁরা তাঁকে ভালোমানুষ বলে পছন্দ করতেন এবং তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য অনুকম্পা করতেন। এই শহরে তাঁর মত জীবন ক্বচিৎ দেখা যায়। তাঁদেব অন্যান্য বান্ধবীরা যেমন এই মিশনাবী মহিলাকে নানা ওজব দেখিয়ে কাটিয়ে দিতেন, তাঁরা কিছু সেরকম করতেন না। এই বিষয়ে এই দুই সখীই অত্যন্ত মমতাপরায়না। লিটল সিস্টার সিয়া কুমারী কাজেই তাঁর সামনে উপপত্নী-সংক্রান্ত কথাবার্তা চলতে পারে না।

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন লিটল সিস্টার। জলখাবার হয়েছে? মিষ্টি স্বরে প্রশ্ন করলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

মিশনারী মহিলা হাসলেন। এই শহবে অনেকদিন থাকলেও এই মহিলাদের সঙ্গে সহজ হতে পারেন নি। কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমাগত হাসতেন। চীনা ভাষা মন দিয়ে শিখলেও তাঁর কানটা এখনও মোটেই দুরস্ত হয় নি। তাই তিনি পাশ্চাত্য-জগতের লোকদের মতই এই ভাষাটা বলতেন এবং অনেক সময় উচ্চারণের দোষে ভাষার গণ্ডগোল করে ফেলতেন। যেমন এখন একটা ভুল উত্তর দিলেন মহিলা, যদিও তিনি বোঝাতে চাইছিলেন অন্য কথা। ভুলটা ধরা পড়তেই লজ্জায় আকর্ণ রক্তিম হযে উঠল। তাঁকে এই অস্বস্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, যা তো ইং, এর জন্য চা আর কয়েকটা পিঠে নিয়ে আয়। আর দ্যাখ ওই পরমায়ু-লক্ষপাতী-

ুলিটাও আনিস যেন। তারপর আবার যোগ করলেন, আমাদের এই বিদেশী বন্ধুকে বলব না কেন যে আজ আমার জন্মদিন?

আরে, আপনার জন্মদিন! লিটল সিস্টার সিয়া আবেগভরে বললেন, আমি মোটে জানতাম না।

জানার কথা নয়। আজ আমার চল্লিশ পূরল—শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

সন্দিগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, চল্লিশ? আবার বললেন চল্লিশ? হাত কচলাতে কচলাতে তাঁর সেই অর্থহীন লাজুক হাসি হাসতে হাসতে বললেন, জান শ্রীমতী ওয়ায়ু আপনাকে ঠিক কুড়ি বছরের মেয়ের মত দেখায়।

আপনার কত বয়স হল লিটল সিস্টার? শ্রীমতী ক্যাং নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

মৃদু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন শ্রীমতী ওয়ায়ু, মিচেন তোমাকে বলিনি বটে কিন্তু পশ্চাত্য দেশের আদব কায়দা-অনুযায়ী মেয়েদের বয়েস জিজ্ঞেস করাটা উচিত না। আমার মেজবৌমা সাংহাইতে মানুষ, বিদেশীদের চলন-বলন দেখেছে, ও আমাকে বলেছে এটা।

উচিত না? কেন? শ্রীমতী ক্যাংয়ের গোলাকার কালো চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল।

ও হা হা, লিটল সিস্টার হাসলেন। এতে কিছু যায় আসে না। এতদিন রইলাম এখানে। এখন ওসব আমার অভ্যেস হয়ে গেছে—

তাহলে বলে ফেলুন আপনার বয়েসটা। শ্রীমতী ক্যাং মৃদু উৎসুকপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

লিটল সিস্টারকে চুপচাপ দেখাল, দ্রুত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, এই তিরিশের মত:

শ্রীমতী ক্যাং তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না। তিনি মোলায়েমভাবে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কত? ছত্রিশ?

ছত্রিশ? না, না, অত হয় নি। লিটল সিস্টার আবার হাসলেন, কিন্তু সেই হাসিতে প্রতিবাদের সুর ছিল?

সুরটা শ্রীমতী ওয়ায়ুর কানে বাজল। তিনি বললেন, বয়সে কী আসে যায়? জীবনের প্রত্যেকটা বছরকে উপভোগ করে, বছরের পর বছর বেঁচে থাকাটা কত ভাল, বলুন।

অন্যের মনের কথা আঁচ করতে পারার দুর্লভ ক্ষমতার সাহায্যে শ্রীমতী ওয়ায়ু বুঝতে পারলেন যে বয়সের ব্যাপারটা পাশ্চাত্যের এই নারীত্বের মর্মে কাঁটার মত বিঁধে আছে, কারণ তিনি তখনও কুমারী। বুড়ী আইবুড়ী! মেয়ের

মামা বাড়িতে একবার এমনটি দেখেছিলেন তিনি। দিদিমার সবচে ছোটবোন এরকম আইবুড়ো ছিলেন। কারণ যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ের ঠিক তিনি হঠাৎ মারা যান। গোটা পরিবার সেই মহিলাকে ভালও বাস আবার তাঁদের সংসারের প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পাশে পাশে একা আইবুড়ো মেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছে এটা দেখে তীব্র অস্বস্তি অনুভব করত। শেষে, তাঁর নিজের সব জ্বালা জুড়োতে, তিনি একটা ম গিয়ে তপস্বিনীর জীবন অবলম্বন করেন। কে বলতে পারে, পাশ্চাত্যে এই নারীর জীবনের পেছনেও সেরকম কোন করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে কিনা। তিনিও বোধহয় তপস্বিনী।

গভীর মমতাবোধ থেকে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, অতিথিরা এই এল বলে লিটল সিস্টার। এর মধ্যে আমাদের কিছু অধ্যাত্মিক কথা শোনান না। তিনি জানতেন মানুষটাকে খুশি করার সেরা উপায় এটা।

লিটল সিস্টারের চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটে উঠল। তিনি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই ঘোর কালো রংয়ের ঝোলাটা হাৎড়ে চামড়ায় বাঁধাই একটা মোটা মতন বই আর তাঁর চশমার পুরোনো খাপ বের করলেন। তারপর নাকে চশমা লাগালেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু আজ আপনাকে সেই মানুষটির গল্প শোনাব. যে বালির ওপর তার ঘর বানিয়েছিল।

শ্রীমতী ক্যাং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মাপ করবেন। বাড়ির কাজ পড়ে আছে। আমি আজ বরং উঠি। তাঁর ভারী ভারী পা ফেলে তিনি চলে গেলেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বিদায় জানাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার তিনি আবার বসলেন। তারপর ইংকে কাছে ডেকে শ্রীমতী ক্যাংয়ের নাতির জন্য যে পাঁচনটা পাঠাবার কথা সেটা দিয়ে আসতে বললেন। বলা শেষ হলে, লিটল সিস্টার সিয়ার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে সৌজন্যসহকারে বললেন, এবার বলুন, বালির ওপর যে-লোকটি ঘর বানিয়েছিল. তাকে আপনাদের প্রভু কী বলেছিলেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু তিনি যে আপনারও প্রভু। আপনাকে শুধু তাঁকে গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু হাসলেন। অসীম কৃপা তাঁর। আপনি তাঁর কথাই বলবেন। নিন ভাই এবার শুরু করুন।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্যের আবরণটা এমন ছিল, যা নাকি ভেদ করা যেত না। তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে লিটল সিস্টার সিয়া থতমত খেয়ে

পড়তে শুরু করলেন। তাঁর ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করার দরুণ গল্পটা তেমন বোধগম্য হচ্ছিল না। তবু শ্রীমতী ওয়ায়ু একাগ্র মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। লিলিপুলে ক্রীড়ারত সোনালী মাছগুলির দিকে তাঁর দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে দু-দুবার ইং দোরগোড়ায় এসে মাথা ঝাঁকিয়ে গেছে, তা দেখেও শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁকে ব্যাঘাত করতে নিরস্ত করেছেন ইঙ্গিতে।

পাঠ শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন ধন্যবাদ লিটল সিস্টার। গল্পটা চমৎকার। আমার অবসর সময়ে আবার আসবেন।

লিটল সিস্টার তখন একবার প্রার্থনা করার কথা ভাবছিলেন। এখন একটু প্রার্থনা করলে হয় না ?

উচ্চারণের দোষে 'প্রার্থনা' শব্দটি এমনভাবেই বললেন যার মানে গিয়ে দাঁড়াল 'পিঠে'। মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। মিশনারীরাতো পিঠে খায়ই। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন। বুঝে মনে মনে হাসলেন। তিনি বললেন, আপনি বরং ফিরে গিয়েই আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। এখন আমার হাতে অনেক কাজ রয়েছে।

লিটল সিস্টার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ইং কোথা থেকে এগিয়ে এসে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

এখন বাগানে শ্রীমতী ওয়ায়ু আবার একা।

তিনি লিলিপুলের কাছে এসে জলের দিকে তাকালেন।

তাঁর তন্বী দেহবল্লরীর পূর্ণ প্রতিবিম্ব সেই জলে ভাসছিল।

তিনি দেখলেন যে, সেই অর্কিড ফুল দুটি তখনও তাঁর হাতে। হাত তুলে জলে নিক্ষেপ করলেন ফুল দুটি।

এক ঝাঁক সোনালী মাছ ছুটে এল ভাসন্ত ফুল দুটির কাছে, তারপর তারা চলে গেল।

ফুল, শুধু ফুল, মাছগুলিকে উদ্দেশ করে কৌতুকের সুরে বললেন। ভারি রাক্ষস এই ক্ষুদে মাছগুলি ! সব সময় খিদে লেগেই আছে ওদের। বালির প্রাসাদ ? না, অত নির্বোধ নন তিনি। যে বাড়িতে তিনি বাস করছেন তা শত শত বছরের পুরোনো। ওয়ায়ু পরিবারের বিশ পুরুষের বাস এখানে।

মা, তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আমার দেরী হয়ে গেল। দরজার কাছ থেকে বড়খোকার গলা শোনা গেল।

আয়, এদিকে আয়। তিনি বললেন।

অনেকদিন বেঁচে থাক মা-মণি, লিয়াংমো আদরের গলায় বলল। আসতে আসতেই সে মাথা নুইয়েছিল। গুরুজনদের জন্মদিনে হাঁটু গে[illegible]

প্রণাম নিবেদন করার মান্ধাতার আমলের প্রথা এখন আর প্রচলিত নেই এই পরিবারে। ততটা পুরোনো ঐতিহ্যের ধারক নয় ওয়ায়ু পরিবার। তবে ওই মাথা নোয়ানোর মধ্যেই সেই প্রাচীন প্রথার ভগ্নাবশেষ রয়ে গেছে।
শ্রীমতী ওয়ায়ুও ঈষৎ নুয়ে পড়ে ছেলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, বেঁচে থাক্ খোকা। বোস্, তোর সাথে কথা আছে।
ছেলের সুদর্শন মুখ দেখে তিনি বললেন, কী সুন্দর দেখতে আমার খোকাকে। এই বয়সে ওর বাবা যত সুন্দর দেখতে ছিলেন, তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর হয়েছে ছেলে ; ওর শরীরে মিশিয়ে দিয়েছেন আপন লাবণ্য-মাধুরী।
লিয়াংমো আজ সকালবেলা সবুজ জল রংয়ের মত একটা নরম রেশমী জোব্বা পরেছিল। তার ছোট ছোট করে ছাঁটা ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশ উল্টিয়ে আচড়ানো। পুষ্টিকর খাদ্যে পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য তার জলপাই রংয়ের গায়ের ত্বকে একটা দীপ্তি এনে দিয়েছে। তার শান্ত চোখে পরিতৃপ্তির আভা বেরুচ্ছে।
বিয়ে করে সুখী হয়েছে বড়খোকা, মনে মনে বললেন তিনি। তারপর বললেন, এই ছোট্ট সোনাটা, আমার নাতিমশাই কোথায় রে ?
সকালে উঠে ওকে দেখিনি। শরীর-টরীব খারাপ হলে কানে অবশ্য আসত, লিয়াংমো উত্তর দিল। মায়ের হাসির উত্তবে সেও হাসল।
মাতা-পুত্রের মধ্যে গভীর স্নেহ বয়ে যেত। সে তাঁর বুদ্ধিমত্তার চেয়েও মার প্রজ্ঞার ওপর বেশী আস্থা রাখত।
এইজন্য সংসারে শৃঙ্খলা রাখতে মেজ ভাইয়ের বিয়ের আগে যখন তার মা তাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন, তখন সে অনুগত পুত্রের মতই বলেছিল, তোমার যাকে পছন্দ তার সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করো তাহলে। আমাকে তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশী চেন।
মেংকে পেয়ে সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিল—সুন্দরী গৃহিণী মেং। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই মেং তাকে একটি ছেলে উপহার দেয়। এখন সে আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। আজকের দিনে বলব বলে একটা সুখবর চেপে রেখেছিলাম মা, লিয়াংমো বলল।
আজ তো সুখবরেরই দিন, শ্রীমতী ওয়ায়ু উত্তর দিলেন।
তোমার বড়বৌমার তো আবার বাচ্চা হবে, গর্বিতভাবে সে বলল। দু-মাস হয়ে গেল, এখন ও নিশ্চিত হয়েছে। দিন তিনেক আগে আমাকে বলল। আমি বললাম, দাঁড়াও মা'র জন্মদিনটা অবধি সবুর কর, সেদিন জানাব এ সুখবর।
বৌমাকে বলিস আমি একটা জিনিস উপহার দেব। পোর্সিলিনের টেবিলের ওপর মুক্তার যে ছোট বাক্সটা তিনি রেখেছিলেন সেদিকে তাঁর নজর [illegible] তিনি বললেন, এই আমার সেই উপহার ! বাক্সটা তুলে নিয়ে

ডালা খুলে বললেন, ঘণ্টাখানেক আগে তোর শাশুড়ি এসে আমাকে এটা দিলেন। তবে মুক্তো কিনা কাঁচ কাঁচ বৌদেরই মানায়। তাই আমার বৌমাকে এটা পরতে দেওয়াটাই ভাল। তুই যখন ওর কাছে যাবি—না থাক, তোকে নিয়ে আমিই যাব। একটা কথা বলে নি। আজকের অতিথি-অভ্যাগতদের ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় আছে নাকি রে?

কিছুটি না মা। তোমার হয়ে আমরাই সব করে-কম্মে নেব।

তোমার ছেলেপুলেরা তোমাকে আজকের দিনটার জন্য পূর্ণ অবকাশ দিতে চায়—তুমি সেই অবকাশ উদ্‌যাপন করো পূর্ণ কর্মবিরতির মধ্যে। বাবা কোথায় মা?

আমার জন্ম দিনেও বোধহয় তোদের বাবা দুপুরের আগে উঠবেন না ঘুম থেকে। তিনি হেসে বললেন। আর আমি তাঁকে বলেওছি যে, তিনি যেন তাড়াতাড়ি না ওঠেন। বেলায় উঠলে দিনটা উনি বেশ খোশমেজাজে কাটান। ভোজের সময় দেখবি উনি কেমন তরতাজা হয়ে শরীফ মেজাজে থাকেন।

মা, তুমি আমাদের সবাইকে এত ভালবাস, লিয়াংমো বলল।

তিনি তাঁর সুন্দর চোখে ছেলেকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। তার কথা যেন তাঁর কানে ঢোকেই নি।

তিনি বললেন, খোকা একটু পরেই কেউ না কেউ এসে পরবেন। তখন আর বলতে পারব না। তাই আমি যা করব বলে ঠিক করেছি, তা তোকে এক্ষুনি বলে ফেলতে চাই। সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি, তবু বড় ছেলে বলে তোকে তা জানানো আমার উচিত। আমি ঠিক করেছি তোদের বাবাকে বলব, তিনি যেন একটি উপপত্নী গ্রহণ করেন।

এই সাংঘাতিক শব্দগুলি তিনি তাঁর শান্ত ও মধুর স্বরে উচ্চারণ করলেন।

লিয়াংমো শুনল কিন্তু তাঁর মাথায় কিছু ঢুকল না। তারপর শব্দগুলি তাঁর মন অধিকার করল, বজ্রনির্ঘোষের মত তারা তাকে বধির করে দিল। তার সুন্দর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

মা, চাপা গলায় সে ডাকল, মা—বাবা কি—তিনি কি—

না, না, সেরকম কিছু না। বললেন বটে, কিন্তু লিয়াংমোও যে প্রথমে এ-রকম একটা সন্দেহ প্রকাশ করবে, তাতে তিনি মনে মনে আহত হলেন। এটা কি সম্ভব যে যারা অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গ করে তাঁর স্বামীকেও সেরকম মনে হতে পারে?

তিনি বললেন, তোমাদের বাবা এখনও কেমন সমর্থ পুরুষ। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও তিনি কত রূপবান। তাই এটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়

তুমি তাঁর ছেলে হয়েও এ-কথা জিজ্ঞেস করবে। তবে আমি বলতে পারি যে তিনি আগের মতই এখনও অত্যন্ত একনিষ্ঠ।

তিনি একটু জিরোলেন। তারপর যে-সংশয় তাঁর ছেলে কখনো দেখে নি, প্রায় তার কাছাকাছি ধরনের তিনি বলে চললেন, এর পেছনে আমার নিজস্ব কতগুলি কারণ আছে। তবে তোমার কাছ থেকে এই আশ্বাস-টুকুই আমি চাই যে, তুমি তাকে মেনে নেবে এবং যখন সবাই এটা জানবে তখন বাড়ির আর সবাইকেও এটা মেনে নিতে সাহায্য করবে। এটা স্বাভাবিক, অনেক কথা উঠবে গণ্ডগোলের কথা আমি কিন্তু শুনব না। তবে তা খেয়াল করবে এবং তোমার বাবা মার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে।

তার মুখের পাংশুভাবটা কেটে না গেলেও, এতক্ষণে লিয়াংমো নিজেকে সামলে নিয়েছে। তার কুঞ্চিত-ভ্রূদ্বয় এখন স্থির। সে বলল, অবশ্য ব্যাপারটা তোমার আর বাবার মধ্যে। একান্তই যদি আমাকে অধিকার দাও, তবে আমি এই পরামর্শই দেব যে বাবার যদি এ-ধরণের ইচ্ছে না থেকে থাকে, তবে তুমি যেন তাঁকে এ-বিষয়ে কোন অনুরোধ জানিও না। আমাদের পরিবার, সুখী পরিবার। কোন অপরিচিতা নারী এই পরিবারে কী নিয়ে আসবে, তা আমরা কী করে জানব! তার সন্তান-সন্ততিরা, তোমার নাতি-নাৎনীর বয়েসী হবে। এটা আমাদের বংশধারায় কি একটা বিশৃঙ্খলা আনবে না? যদি সে খুব অল্পবয়েসী হয়, তবে বাবার সঙ্গে তার মর্যাদার গুরুত্বের জন্য তোমার পুত্রবধূরা কি তাকে হিংসে করবে না। আমি অনেক অশান্তির ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি মা।

তোমার অল্প বয়েসের জন্যই আমাদের বয়েসী নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্কটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, বরং এটা এইজন্য যে তোমাদের বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই সুখের। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও তেমনি। না খোকা, তুমি ছেলের মত কথা বলো। আমি চাই, অন্য সব ব্যাপারেও যেমন তুমি আমার বাধ্য ছেলে, তেমনি এ-ব্যাপারেও তুমি তোমার মার আজ্ঞা শিরোধার্য করে নেবে। তোমার ছোট ভাইদের ওপর তোমার কথার প্রভাব পড়বে। মেং যা বলবে তাতে ওর জায়েরা প্রভাবিত হবে। তাকেও তুমি সাহায্য করবে।

লিয়াংমো মনে মনে বোঝাপড়া করছিল।

কিন্তু মার প্রতি তার আনুগত্য এত গভীর যে, সে এখনও তাঁর বাধ্য হয়েই বলল, যথাসাধ্য করব মা। তবে এ-কথা লুকিয়ে লাভ নেই যে তুমি যা বললে তা আজকের দিনটাকে বিরস করে দিল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু অল্প হাসলেন। এবং তিনি বললেন,

ভবিষ্যতে অনেক বেশী বিরস দিনগুলির কবল থেকে আজ আমি তোমাদের সবাইকে বাঁচাতে চাইছি।

কিন্তু তাঁর কথা, যুবা-পুত্রের কাছে একটা প্রহেলিকার মত শোনাল। তাই তিনি মুক্তোর বাক্সটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল আমরা মেংকে দেখে আসি, ওকে এই উপহারটাও দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেও উঠল। ছেলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। তরুণ সুগঠিত স্বাস্থ্য, ঠিক ওর বাবার মত। তিনি ওর কাঁধের নিচে পড়ে গেছেন। তিনি মুহূর্তের জন্য তাঁর হাত ওর বাহুতে বাৎসল্যভরে স্থাপন করলেন। কিন্তু তা এত অপ্রত্যাশিত যে, সে চমকে উঠল। তিনি অন্য কোন মানুষের, এমন কি তাঁর সন্তানদের স্পর্শও সহ্য করতে পারতেন না। সে মাথা নিচু করে তাঁর দিকে তাকাল। তার চোখের তারা ওপর দিকে মেলে-দেওয়া।

তোকে দিয়েই, তিনি স্পষ্ট স্বরে বললেন, আমি এই সংসার গড়েছি অচল অনড় পাথরের বুনিয়াদের ওপর।

এই বিশাল বাড়িতে তার নিজের মহলের উঠোনে, মেং তার শিশুপুত্রকে নিয়ে খেলছিল। আয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। আয়াও খেলছিল ছুটোছুটি করে। সারা দিন ধরে মা ও আয়া, দুজনের চোখের মণি ছিল এই শিশুটি। রাত্রিবেলা সে আয়ার কোলে ঘুমোবে। এই বাচ্চাটিকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে এক নিবিড় সখীত্ব গড়ে উঠেছিল। তারা দু'জনে মিলে শিশুটির জন্য যত যত্ন ও ভালবাসা প্রয়োজন তা ঢেলে দিত উজাড় করে।

মেং-এর শরীর সন্তান-ধারণের জন্য। তার বুকে দুধের প্রাচুর্য। কিন্তু কেউই, এমন কি সে নিজেও ভাবতে পারত না যে তার ওই সুন্দর ছোট ছোট তাজা নৈবেদ্যের মত স্তন বাচ্চাটা মুখ দিয়ে টেনে টেনে শিথিল করে দেবে। লিয়েনকে তাই রাখা হয়েছিল বাচ্চাকে দুধ দেবার জন্য। সে ওয়াংদের জমির একজন চাষীর তরুণী বধূ। তার নিজের শিশুপুত্রটিকে মার বুকের দুধের বদলে তার শাশুড়ি খেতে দেয় ময়দা চাল আর জল মিশিয়ে তৈরী একরকম ঘন তরল খাদ্য। এ-জন্য ছেলেটা মোটেই বাড়ছে না, রোগা আর ফ্যাকাশে হলদেটে হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। আর এদিকে লিয়েনের বুকের দুধ খেয়ে তার মনিবের ছেলেটি হয়ে উঠেছে মোটাসোটা, দুধে-আলতা রংয়। মাসে একবার বাড়ি যাবার ছুটি পেত লিয়েন। বাড়িতে গিয়ে নিজের বুকজোড়া স্তন গুঁজে দিত নিজের সন্তানকে। তার নিটোল স্তনবৃন্ত থেকে দুধ ঝরে পড়ত। জন্ম অবধি বুকের দুধ কখনও খায় নি বাচ্চাটা তাই

করতে জানত না সে। বুকের টনটনানির জন্য লিয়েন কখনোই বাইরে গিয়ে স্বস্তি পেত না। বিকেলবেলা সে আবার ফিরে যেত ওয়াঙ্-ভবনে। সেখানে তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুটি রাগে ক্ষিদেয় চেঁচিয়ে হুলস্থুল বাঁধিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

একে দেখেই সে ভুলে যেত নিজের সেই শীর্ণকায় রুগ্ন পাণ্ডুর ছেলেকে। সে হেসে দু-হাত মেলে ধরত। নধরকান্তি ডাগর শিশুটি মায়ের কোল থেকে তার কাছে আসার জন্য কান্না জুড়ে দিত। তক্ষুনি গায়ের কোট খুলতে না খুলতে সে ছুটে গিয়ে মেং-এর পাশে বসে পড়ত। আর বাচ্চাটা তার একটি স্তনকে পেয়ালাব মত আঁকড়ে ধরে বড় বড় ঢোঁকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দুধ খেত। মেং আর লিয়েন হাসাহাসি করত, দুজনেই শিশুটির এ-দৃশ্য অনুভব করত।

বাচ্চাটার সঙ্গে দু'জনকে এভাবে দেখে তাদের মুখ দেখে বলা কঠিন যে তাদের মধ্যে কে শিশুটির জননী। সত্যি, শিশুর আচরণে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সে দু'জনের দিকে তাকিয়েই কলকলিয়ে হাসত। সে হাঁটতে শিখেছিল এবং দু'জনের দূরত্বটা টলমলে পা ফেলে পেরিযে গিয়ে একবার মার পরের বার লিযেনের গায়ে ঢলে পড়ত।

মেং সর্বদাই সুখী। কিন্তু গত কযেক দিন যাবৎ সে আরও এক গভীরতর সুখের মধ্যে সাঁতবে বেড়াচ্ছে। স্বামী ছাড়া কাউকে সে এতদিন বলে নি তাব নতুন সন্তান-সম্ভাবনার কথা।

অবশ্য দাসী মহলে লিয়েন জানত। জেনে সে আগের চেয়ে অনেক বেশী উৎফুল্ল। কিন্তু যে বাড়িতে দুধ দেবাব জন্য তরুণী আয়া থাকে সে বাড়ির ভাগ্য মন্দ। নিজের ছেলের প্রতি স্নেহ ক্রমশ শুকিয়ে আসছিল। নিজস্ব প্রাচুর্যপূর্ণ জৈব ভালবাসার সবটুকু ওর পালিত শিশুটিকে অভিষিক্ত করছিল। তার নিজের সংসারে কঠোর দারিদ্র্য। খাদ্যের অনটন লেগেই আছে। শাশুড়ির জিভেব ধারও বড্ড বেশী। খেটেখুটে লিয়েন মাসান্তে সামান্য যা কিছু রোজগার করবে, তা থেকে কতটা বেশী আদায করা যায় সেই দিকে নজর থাকে বুড়ীর।

প্রথম যখন শাশুড়ি ওয়াঙ্-বাড়িতে এই কাজে পাঠায় তখন সারা দিন-রাত্রি ধরে কেঁদেছিল বেচারী লিয়েন কিন্তু এখন ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, এ-বাড়ির ভাল খাবার-দাবার স্বাচ্ছন্দ্য আরাম এবং আলস্যে। এই শিশুটির পরিচর্যা করা ছাড়া আর কোন বাড়তি কাজ করতে বলা হয় না তাকে। বরং তাকে খেতে, পান করতে এবং ঘুমোতে যেতে বিশেষভাবে বলা হয়। সুখের পিপাসু তার তরুণ শরীরটা এতে বড় তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়েছিল।

এটাই তার নিজের বাড়ি। লিয়েন মনে করত এবং সে তার পালিত পুত্রকে নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসত।

ও মা-মা ছোও ছোনামনিটা, সে আদর করে বলল, ওর মতনটি আর কোথাও দেখুন না গো বৌদি।

হেসে মেং কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় তারা আগত পদধ্বনি শুনতে পেল। বাচ্চটা এক ছুটে লিয়েনের কোলে উঠে তার কোল থেকে বাবা ও ঠাকুরমাকে দেখতে লাগল। মেং উঠে দাঁড়াল।

এই যে মেং। থাক থাক, বোস বৌমা। ও নাতি মহারাজ, দেখি দেখি দাদাভাই আমার। আয় তো দেখি ঠাম্মার কাছে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। লিয়েন ছেলেটাকে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সামনে নিয়ে গেল তার বাহুচ্যুত না করে।

এভাবেই বাচ্চাটা তার ঠাকুরমার হাঁটুর ওপর দাঁড়িযে বড় বড় কালো চোখ মেলে ধরল তাঁর দিকে। ওর চোখের কোণগুলি ভিতরমুখী ঢোকানো। ছেলেটা মুখে আঙুল দিযে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু মুখ থেকে আঙুল সরিয়ে দিলেন আস্তে আস্তে।

চমৎকার ছেলে, তিনি অস্ফুটে বললেন, ওর কি কিছু নাম রেখেছ নাকি?

তাড়াতাড়ির কিছু নেই। যদ্দিন না স্কুলে যাচ্ছে ততদিন নামের দরকার হচ্ছে না, লিয়াংমো বলল।

শিশুর সুন্দর কচি মুখ থেকে তিনি চোখ ফেরালেন। এখানে কেন তিনি এসেছেন তা তাঁর মনে পড়ল।

মেং, লিযাংমোর কাছে শুনলাম যে তুমি আবার আমাদের এরকম একটা ক্ষুদে সোনামণি দিতে যাচ্ছ। আমি তাই তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসছি। আর নাও, এই জিনিযটা তোমাকে এই উপলক্ষ্যে উপহার দিলাম।

মেং লজ্জায় রাংঙা হয়ে উঠল। সে তার ছোট্ট মাথাটা নাড়াল। তার সৌন্দর্যের একমাত্র ত্রুটি ছিল তার চুলে। সে যতই চন্দন তেল দিয়ে তার কেশদান আলুলায়িত কবে আঁচড়াবার চেষ্টা করত, ততই তারা কুঁকড়ে যেত। এখন মুখের সঙ্গে তার মনে এই ভয়টাও দোলা দিচ্ছিল। পাছে শাশুড়ির চোখে তার কবরীর একটি চুলও কোঁকড়ানো দেখায়! শ্রীমতী ওয়ায়ুকে সে যেমন ভালবাসত' সেরকম ভয়ও করত। শ্রীমতী ওয়ায়ুর সুঠাম কেশ-বিন্যাস থেকে কেউ কখনো একটি চুলও স্থানচ্যুত হতে দেখে নি। সে দু'হাত বাড়িয়ে উপহার গ্রহণ করল। আমার মার মুক্তো, নিশ্বাস ফেলে সে বলল।

সই আমাকে দিয়ে গেল এইমাত্র। কিন্তু মুক্তো পরার বয়েস কি আর আমার

আছে। এখন এ-বাড়িতে সব কিছুই কল্যাণের জন্য ঘটছে। আজ তোমার বংশবৃদ্ধির সুসংবাদটা দিলে, আর আমিও তোমাকে এই মুক্তোটা দেব বলে ঠিক করলাম।

এই মুক্তোগুলোর ওপর আমার বরাবরই লোভ ছিল, বাক্সটা খুলে মুক্তোটা দেখতে দেখতে মেং বলল।

নাও, পরে ফেলো, লিয়াংমো তাকে বলল।

মেং তার সরু সরু সুন্দর আঙুল দিয়ে নির্ভুলভাবে মুক্তোর দুলটা পরে নিল। তার নরম গাল দুটি আরও রাংঙা হয়ে উঠল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এমন কি ছোট বাচ্চাটা পর্যন্ত। এই দুলটা আমি মাঝে মধ্যে পরতাম। মাকে কতবার বলেছি, যেন দুলটা আমাকে দিয়ে দেয়।

এবার বুঝি এ-দুলজোড়া যোগ্য হয়েছে। দ্যাখো মুক্তোজোড়া কেমন গোলাপী দেখাচ্ছে, ওদের রং ছিল রূপালী ধূসর, শ্রীমতী ওয়ায়ূ বললেন।

সে কথা সত্যি। মেং-এর নরম ত্বকের আভা শুষে নেওয়াতে মুক্তো দুটোকে গোলাপী দেখাচ্ছিল।

এই মাগো, বৌদিমণিকে সৌন্দর না দেখানই ভাল, তাইলে মেয়েসন্তান আইসবে গো, ইং ঘোষণা করল।

তারা সবাই হেসে উঠল। ফিরে যাবার জন্য উঠে পড়ে শ্রীমতী ওয়ায়ূ বললেন, নাতনীও আমার সমান আদরের হবে। পৃথিবীতে ছেলেদের যেমন থাকা উচিৎ তেমনি মেয়েদেরও থাকা উচিৎ। আমরা এটা ভুলে যাই, তবু এটা সত্যি, তাই না মেং ?

মেং লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারল না।

জন্মদিনের বিশেষ খাওয়া-দাওয়া উপলক্ষ্যে ভোজের পরিপাটি আয়োজন হয়েছে।

শ্রীমতী ওয়ায়ূ তাঁর শাশুড়ির বাঁ পাশে বসেছেন। বংশের প্রাচীনা এবং বয়েসে প্রবীনা বলে শাশুড়ির আসন সর্বোচ্চ। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ূ তাঁর মার ডানদিকে বসেছেন। তার ওপাশে বসেছে লিয়াংমো। মেজছেলে সেমো বসেছে তার মার বাঁদিকে। সেমোর বাঁদিকে বসেছে সেজছেলে ফেংমো। ন' ছেলে ইয়েনমো নেহাৎই বালক, সাত বছর বয়েস। কিন্তু সে বাবার ঘরেই ছিল, এখনও বাবার বাহুর কাছে পরের থাকে দাঁড়িয়ে আছে।

এইভাবে পরিবারের সবাই যে যার জায়গা নিয়েছে। বড় ও মেজ ছেলের বৌ তাদের স্বামীদের নিচের থাকে আসন নিয়েছে। মেং এর কোলে তার ছেলে। একটি ঝি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটা দুরন্তপনা করলে সরিয়ে নেবে। ওর প্রপিতামহী তার প্রপৌত্রকে নিয়ে বেজায় খুশি হলে

কী হবে, সহজেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। শ্রীমতী ওয়ায়ুর ধৈর্য এসব ক্ষেত্রে অসীম।

বাস্তবিক, কিছুতেই যেন তার মেজাজ ভারসাম্য হারাত না। মসৃণ মুক্তো রংয়ের মুখটি খুশি মনে পরিবারের এই বিরাট ভোজ-সভা পরখ করছিল।

অন্য দুটি টেবিলের প্রত্যেকটিতে আটটি করে আসন। সেখানে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর সম্পর্কিত ভাই ও ভাইবৌরা তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ছেলেমেয়েরা বসেছে। একটা টেবিলে শ্রীমতী প্রধানার আসন নিয়েছেন। আগের দিনগুলিতেই যে যার উপহার পাঠিয়েছেন। এই উপহার সামগ্রী অনেক রকমের—জোড়া ফুলদানি, খেজুরের প্যাকেট, বাক্সভর্তি কেক ও মিষ্টি, সোনালী কাগজ কেটে রেশমের কাপড়ের ওপর বিভিন্ন চরিত্রের ধরনে অ্যাপ্লিকা-করা আর তার তলায় শুভেচ্ছা লিখে-দেওয়া। এ-ছাড়াও আরও অনেক উপহার। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু দিয়েছিলেন পুরু ব্রোকেডের দু'প্রস্থ কাপড়। তাঁর মা দিয়েছিলেন দু-বাক্স চমৎকার চা।

সমগ্র পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে যে উপহার দেওয়া হল, তা বেশ দামী। শহরের সেরা শিল্পীকে দিয়ে তার দীর্ঘ-জীবন দেবীর একটি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে ছিলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ুকে যারা যারা প্রথম শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন সেই অতিথিরা এক বাক্যে এই ছবিটির প্রশংসা করেছেন। ছবিটা সুন্দর জায়গায় যত্ন করে ঝোলানো হয়েছিল। ছবিটির খুঁটিনাটি অংশও হয়েছিল অত্যন্ত নিখুঁৎ ও নিপুণ তুলিতে আঁকা। দেবী তাঁর এক হাতে অমরত্বের প্রতীক একটি পীচফল ধরে আছেন। এমন কি দীর্ঘজীবী উদ্ভিজ্জগুলিকে আঁকতেও শিল্পী ভুলে যান নি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেইসব উদ্ভিজ্জগুলিকে শিল্পী দেবীর করধৃত দণ্ডে সংলগ্ন করে দিয়েছেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু যেখানে বসেছেন, তার পেছনের দেয়ালে একটা লাল সাটিন ঝুলছে। যাতে কালো মখমল থেকে কেটে কেটে কিং উপকথার দীর্ঘজীবী নানা চরিত্রের ছবি অ্যাপ্লিকার মত সেলাই করে লাগানো। এই উজ্জ্বল সাটিনের পটভূমিতে শ্রীমতী ওয়ায়ুর কৃষ্ণকেশমণ্ডিত ছোট মাথাটি যেমন বাহুল্যবর্জিত তেমনি নয়নাভিরাম দেখাচ্ছিল।

অতিথিদের সমস্ত অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার জন্য তার জননীর পক্ষ থেকে লিয়াংমো প্রত্যুত্তর জানাল। সে এবং মেং বাড়ির বড় ছেলে ও বড় বৌ হিসেবে প্রত্যেক অতিথির টেবিলের কাছে গিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ুর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাল।

সব কিছুই অনায়াসে সম্পন্ন হল। তবু তাতে কিছুটা আনুষ্ঠানিকতার ছোঁয়া ছিল, যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে ওয়ায়ু পরিবার যেমন প্রবীন ঐতিহ্যকে

মূল্য দেন তেমনি এই আধুনিক যুগকেও উপলব্ধি করতে পেরেছেন।
শ্রীমতী ওয়ায়ু মাঝে মাঝেই তাঁর আসন থেকে উঠে অতিথিদের মাঝখানে গিয়ে দেখছিলেন, সবাইকে ঠিকমত পরিবেশন করা হচ্ছে কিনা। তিনি সামনে আসতেই অতিথিরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে তদারকীর এই কষ্ট স্বীকার না করতে অনুরোধ করছিলেন এবং তিনিও তাঁদের আসন গ্রহণ করবার জন্য মিনতি করছিলেন।
দু'বার এইভাবে পরিক্রমা করে আসার পর, তৃতীয়বার যখন তিনি উঠলেন তখন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন, লিয়াংমোর মা, এভাবে বারবার আর তোমাকে উঠতে হবে না। মিষ্টি দেবার সময় আমিই দেখব সবাই পেল কিনা। শ্রীমতী ওয়ায়ু হেসে মাথা নোয়ালেন সৌজন্যসহকারে।
এবার তাঁর দেওয়া আশ্বাস অনুযায়ী, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু প্রত্যেক অতিথির টেবিলের সামনে গিয়ে তাঁদের লজ্জা না করে মিষ্টি খেতে বললেন। শ্রীমতী ওয়ায়ুর চোখ চিন্তিতভাবে তাঁকে অনুসরণ করছিল। কিন্তু তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, যে-টেবিলে শ্রীমতী ক্যাংয়ের পাশে বসে তাঁর সুশ্রী তৃতীয় তরুনী কন্যাটি খাচ্ছে তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর স্বামী ক্ষণকাল থমকে দাঁড়ালেন!
পায়েস, পায়েস! শ্রীমতী ওয়ায়ুর শাশুড়ী পরবর্তী পদের জন্য হাঁক দিলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর সুঠাম হাত দুটি বের করে. আস্তিন গুটিয়ে একটা পোর্সিলিনের চামচে দিয়ে শাশুড়ির বাটিতে বেশী পরিমাণে পায়েস ঢেলে দিলেন।
চামচ-আমার চামচ কই গেল? প্রৌঢ়া বিড়বিড় করলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর হাতে একখানা চামচে ধরিয়ে দিলেন।
তারপর যখন সবাই তারিফ করে পাত্রের সুখাদ্য খাচ্ছে, তখন শ্রীমতী ওয়ায়ু চিন্তান্বিত মুখে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি সুনিশ্চিতভাবে শ্রীমতী ক্যাংয়ের সুদর্শনা কন্যার পাশে দাঁড়িয়ে একটু দেরী করছেন। মেয়েটি আধুনিকা, অতি আধুনিকা। কারণ চুল কাঁধ অবধি ছাঁটা। বিদেশী কায়দায় ঢেউ খেলানো। শত্রু কর্তৃক সাংহাই অধিকৃত হওয়ার আগে, বছর খানেকের জন্য সে সেখানের স্কুলে পড়েছিল। এখন এই ছোট্ট প্রাদেশিক শহরে থাকতে এসে সে অনবরত তার মা-বাবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু দেখলেন তাঁর স্বামীর কথার উত্তরে মেয়েটি মাথা তুলে উত্তর দিচ্ছে প্রগল্‌ভার মত। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু হেসে এগিয়ে চললেন এবং শ্রীমতী ওয়ায়ুও বাটি থেকে এক চামচ পায়েস তুললেন। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু ফিরে এলে তিনি দীর্ঘায়ত চোখের সহজ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন।
ধন্যবাদ, সুরেলা গলায় তিনি বললেন।

এদিকে ভোজনপর্ব উপসংহারের দিকে এগিয়ে চলছিল। এরপর এল মাংস। সর্বশেষে নিয়ে আসা হল ছ'টি গামলা। তাতে ভাতের বদলে ছিল লম্বা লম্বা চিকন নুড্‌ল। জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই খাওয়া-দাওয়া বলে ঠাকুর লম্বা লম্বা নুড্‌ল রেঁধেছিল, কারণ লম্বা নুড্‌ল হল দীর্ঘ পরমায়ুর প্রতীক। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে শীমতী ওয়ায়ু চিরকালই সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্না। তিনি মাংস নিলেন না। তবে কিছুটা নুড্‌ল মুখে দেওয়াটা রীতি। উৎসাহী পাচক আবার নুড্‌লগুলিকে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তার চেয়ে বেশী লম্বা করে তৈরী করেছিল। তিনি সুকৌশলে তাঁর কাঠির ডগায় নুড্‌লগুলি জড়িয়ে নিলেন।

কিন্তু প্রৌঢ়ার অত সবুর করার ধাত না। তিনি বাটিটা সরাসরি মুখে তুলে কাঠি দিয়ে বাটি ভর্তি নুড্‌লগুলি ঠেলে ঠেলে মুখগহ্বরে চালান করে নিতান্ত শিশুর মত সমস্ত আহার্য পরিতোষের সঙ্গে ভোজন করে বললেন, আজ রাত্রে ঠিক আমার শরীর খারাপ হবে। তবে বুঝলে কিনা বৌমা, এ হল গিয়ে তোমার চল্লিশতম জন্মদিন। নিকুচি করেছে শরীবের।

আপনি আপনার ইচ্ছেমত খান মা, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

হাতে ছোট ছোট মদের বোতল নিয়ে অতিথিরা একে একে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শ্রীমতী ওয়ায়ুর জন্মদিন ও দীর্ঘ জীবনকে উৎসর্গ করে সবাই সেই মদ্য পান করলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ু চুপচাপ মানুষ বলে উত্তরে কিছু বললেন না। তার হয়ে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু সমাগত অতিথিবৃন্দকে তাঁদের এই শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। কেবল শ্রীমতী ক্যাং তাঁর সখীর চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে পানপাত্র তুলে ধরলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ুও নীরবে তাঁর পানপাত্র উঁচু করে ধরলেন, তারপর গোপন সমঝওতার মধ্যে উভয়ে একসঙ্গে পানীয় নিঃশেষ করলেন।

এতক্ষণে প্রৌঢ়ার পরিপূর্ণ আহার সমাপ্ত হয়েছে। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে তাঁর পরিবারমণ্ডলী পরিদর্শন করছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, লিয়াংমোটাকে যেন রুগ্ন রুগ্ন দেখাচ্ছে।

প্রত্যেকে লিয়াংমোর দিকে তাকাল। সে সত্যই অসুস্থ লোকের মত হাসল, তারপর চটপট বলল, না ঠাকুমা, অসুখ টসুখ হয় নি আমার।

মেং তার স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। সকাল থেকেই তোমাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

মেং-এর কথায় তার দেওয়র ও জা লিয়াংমোর দিকে তাকাল। শ্রীমতী ওয়ায়ু কোন কথা বললেন না। তিনি বুঝলেন যে, আজ সকালের কথাটা লিয়াংমো মন দিয়ে এখনও নিতে পারে নি। সে এবার মিনতিপূর্ণ

চোখে মার দিকে তাকাল। তিনি শুধু সামান্য হেসে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। মুখ ফেরাবার সময় তিনি চতুর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী মেজবৌমার চোখে পড়ে গেলেন। সেমোর বৌ বুলাং খাওয়া-দাওয়ার সময় একটিও কথা বলে নি। কিন্তু তার চারপাশে কী ঘটছে তা বুঝবার জন্য বাক্যব্যয় করা এই তরুণীটির পক্ষে সম্পূর্ণ নিস্প্রোয়োজন। শ্রীমতী ওয়াংও বুঝতে পারলেন যে বড় ছেলের এই মিনতি এবং তার নিঃশব্দ উত্তর দেওয়াটা বুলাং লক্ষ্য করেছে। কিন্তু সেমোর এইসব ব্যাপারে কোন খেয়াল নেই। স্বভাবে সে অধৈর্য। চেয়ারে হেলান দিয়ে মাটিতে পা ঠুকছিল সে।

তার ভাবটা এই যে খাওয়া-দাওয়াব জন্য ঢের সময়ইতো দেওয়া হয়েছে। একদিকে একটি ছেলে বেশ কতকটা বমি করল মেঝের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তাতে চাকর-বাকরদের মধ্যে বেশ গণ্ডগোল উঠল। কয়েকটা কুকুরকে ডেকে নিয়ে এলেই তো হয়, শ্রীমতী ক্যাং পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ইং তার কাছে গিয়ে নম্রভাবে বলল, খাবার ঘরে কুকুর ঢোকাতে দেবেন না কর্তা মা।

দেখলে তো মা, আমি তোমায় বলিনি, আজকাল ওসব কেউ করে না—ওসব আদ্যিকালের। বাড়িতে তুমি যখন কুকুর দিয়ে নোংরা খাইয়ে সাফ করার পাট চোকাও, তখন এত লজ্জা করে আমার, শ্রীমতী ক্যাং-এর সুশ্রী সেজ মেয়েটি বলল।

বেশ, বেশ, এখন অন্যের সামনে তোমায় লজ্জার ব্যাখ্যান আর করতে হবে না। শ্রীমতী ক্যাং জবাব দিলেন।

খুব কথা হয়েছে মেয়েদের, শ্রীযুক্ত ক্যাং বললেন। তবে তিনি লিনউয়িকে খুবই স্নেহ করতেন। কারণ মেয়েদের মধ্যে সেজ মেয়েই সবচেয়ে সুন্দরী। মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন।

প্রৌঢ়া পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে বলতে শোনা গেল, নাঃ! যাই, শুই গিয়ে। অসুস্থ হবার জন্য তৈরী হই গিয়ে যাই।

শ্রীমতী ওয়াংও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন মা। অতিথিদের নিয়ে আমরা অন্য ঘরে বসছি।

দু'জন ভৃত্য তাঁকে নিয়ে গেল সঙ্গে করে। ঘর থেকে তাঁর না যাওয়া পর্যন্ত শ্রীমতী ওয়াং দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। অতিথিরাও আসন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হলে স্বামীর দিকে তাকালেন শ্রীমতী ওয়াং। অতিথিদের বড় হলঘরটায় নিয়ে যাবে তুমি? নম্রভাবে তিনি নির্দেশ দিলেন। মেয়েরা আমার বসার ঘরে যাবেন, বলে তিনি এগোতেই মহিলারা তাঁকে অনুসরণ করলেন। পুরুষেরা শ্রীযুক্ত ওয়াং-র সঙ্গে গেলেন। ছোটদের উঠোনে নিয়ে গেল তাদের আয়ারা। অনেকে ঘুমে ঢলে পড়েছিল।

দোরগোড়ায় গিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু একবার দাঁড়িয়ে বললেন, যে-বাচ্চাটা বমি করেছে ওকে বাঁশের তৈরী শোবার ঘরটায় নিয়ে যাও, ঘরটা ঠাণ্ডা। ও একটু ঘুমোতে পারবে।

বাচ্চাটা কাঁদছিল। তাঁর গলা শুনে আচমকা কান্না থামাল সে।

ভোজসভা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তবু তাঁর বসার ঘরেও শ্রীমতী ওয়ায়ুর সমাগত মহিলাদের সামনে তাঁর সুমার্জিত সৌজন্য বজায় রেখেছিলেন। খুব অল্পই কথা বলছিলেন; তবে স্বভাবতই চুপচাপ মানুষ বলে। সেটা নজরে পড়ছিল না। কেবল যখন কোন বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো দরকার, তখনই মাত্র সবাই কেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর দিকে চাইছিলেন, কারণ সবাই জানতেন যে এ-বাড়িতে তিনিই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনিও অল্প কিছু স্বচ্ছ শব্দে মতামত জানাচ্ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সুচারু, মসৃন ও নম্র। পাথরের ওপর জলের গতিভঙ্গীর মত।

তাঁর চারপাশে কথার স্রোত কখনো ক্ষীণ কখনো প্রবল হচ্ছিল। বিনোদনের জন্য অভিনেতাদের ছোট্ট একটা দলকে বায়না করে আনা হয়েছিল। তারা হরেকরকম প্রমোদ বিতরণ করছিল। ছোটরা বেশ মজা করে দেখছিল। বয়স্করা, গ্রীষ্মকালীন বর্ষণের আগে চয়ন-করা সেরা চা-পাতা দিয়ে তৈরী চায়ে চুমুক দিতে দিতে, কথার ফাঁকে ফাঁকে সেই তামাসা দেখছিলেন।

তরুণীদের সামনে বর্ষিয়সীদের কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়। শ্রীমতী ক্যাংতো ছোটখাট একটি ঘুমই দিয়ে নিলেন।

একবার শ্রীমতী ওয়ায়ু ইংকে বললেন, যাতো—দেখে আয়, মার কোন অসুখ-বিসুখ করল কিনা।

ইং চলে গেল। একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে এল, কর্তামার শরীল খারাপ হয়েছে গো। যা খেয়েছে বে-বাক উগরে দিয়েছেন। হেই মা, কী কাণ্ড! তবু কিনা কর্তামা বলতিছে যে এমন খাওয়া-দাওয়ার জন্যি এটুকু কষ্ট করা সাত্থক।

শুনে সবাই হেসে উঠলেন। সমবেত হাসির উচ্চরোলে শ্রীমতী ক্যাংয়ের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে তিনি শ্রীমতী ওয়ায়ুকে বললেন, এখন আমরা উঠি। আর তোকে ক্লান্ত হতে হবে না, একশটা বছর বাঁচতে হবে তো তোকে। শ্রীমতী ওয়ায়ুর ঠোঁটের কোনে স্মিত হাসি দেখা দিল। অতিথিরা একে একে তাঁর কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মিষ্টির ঠোঙা, নানান উপহার ও অতিথিদের দেওয়া বখশিস চাকর-বাকরদের জন্য একটা ট্রেতে রাখা হয়েছিল। ইং ট্রেটা নিয়ে এল। দাস-দাসীরাও আসতে শুরু করল। তারা শ্রীমতী ওয়ায়ুর সামনে এসে ঝুকে বিনীতভাবে দু'হাত জুড়ে মাথা নিচু

করে অভিবাদন করে দাঁড়াতে লাগল। তিনিও যথাযোগ্য শিষ্টাচার দেখিয়ে তাদের হাতে উপহার তুলে দিতে লাগলেন।

সবশেষে তিনি একা। মুহূর্তের জন্য তিনি নিজেকে ক্লান্ত বলে অনুভব করলেন। যেসব ছোট ছোট মাংসপেশী তার মেরুদণ্ডকে রমণীয় ঋজু ভঙ্গীতে ধরে রেখেছিল, তারা যেন গলার কাছটায় কোমরে শিথিল হয়ে পড়ছিল। ক্ষণকালের জন্য তাঁকে বাসি ফুলের মত দেখাচ্ছিল; এখন যেন তিনি প্রায় নিজের বয়েসের ভারে ন্যুজ। কিন্তু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তার সরু কাঁধ জোড়া সোজা করলেন।

এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হলে চলবে না। দিন যে এখনো শেষ হয় নি।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের মধ্যে বার সাতেক পায়চারি করলেন। জানলার কাছে গিয়ে জানলার নিচের চৌকাঠে হেলান দিয়ে বসলেন। জানলার বাইরে উন্মুক্ত অঙ্গণ। যেখানে আজ সকালবেলা তিনি প্রথমে শ্রীমতী ক্যাং ও পরে লিয়াংমোর সঙ্গে বসেছিলেন। তিনি যা করতে উদ্যোগী হয়েছেন তা শুনে তাদের আতঙ্কের কথা তার মনে পড়ল। অবচেতন ভাবে একটি মনোরম স্মিত হাসির রেখা তাঁর ঠোঁটে দেখা দিল। সেই হাসি না দুঃখের, না আনন্দের।

এই সময়ে অঙ্গণের অর্দ্ধচন্দ্রাকার ফটকে ইংকে দেখা গেল। সে তাঁর মুখের হাসিটা লক্ষ্য করেছিল। সে বলল, এই চাঁদনী রাতে তোমাকে ঠিক একেবারে ছুকরী মেয়ের মত দেকাচ্ছে বৌদি!

শ্রীমতী ওয়ায়ুর হাসিটা তখনো মিলিয়ে যায় নি। কিন্তু তিনি ফিরে এসে টয়লেট টেবিলে বসলেন।

ইং এসে আস্তে আস্তে পোষাক খুলে দিতে লাগল। সাদা রেশমী অন্তর্বাসটি পর্যন্ত খোলা হয়ে গেল। তারপর শ্রীমতী ওয়ায়ুর লম্বা চুল খুলে দিয়ে তা আঁচড়াতে শুরু করল চন্দন কাঠের সরু দাঁত-ওয়ালা চিরুণীর লম্বা আঁচড়ে। আয়নার বুকে তিনি নিজের শান্ত মুখ দেখলেন। দেখলেন আজ রাতে তাঁর চক্ষু দু'টি কী বিশাল, কত কালো দেখাচ্ছে।

তোমার কি কেলান্ত লাগছে নাকি গো, বৌদি? ইং জিজ্ঞেস করল।

একটুও না, তিনি উত্তর দিলেন।

তবু ইং বলে চলল, তা আর বলার কী আছে। সারাটা দিনভর যা গেল! কিন্তু বৌদি, এখন তোমার চল্লিশ বছর পূরল। এখন থেকে তোমার জেবন হবে অন্য রকম। আমি বাপু বলবই যে অত খাটা তোমার সহ্য হবে নি, হ্যাঁ এই বলে দিনু। বাড়ি আর দোকান চালাবার ভার তুমি বড় খোকাবাবুকে দাও। ওনার বৌ হেঁসেল দেখবে খন।

আর তোমার মেজবৌ চাকর-বাকরদের দেখাশোনা করুক এখন।

এখন তুমি তোমার মহলে বসে বসে কেবল বই পড়বে আর ফুলবাগান দেখবে। আর বইসে বইসে ভাববে কত সোন্দর জেবন তুমি কাটিয়েছ, কত নাতি-নাতনী আসবে বৌমাদের পেটে।

হয়ত তুই ঠিকই বলছিস রে। আমারও এ-সব মনে হচ্ছিল। জানিস ইং, আমি তোর দাদাবাবুকে একটা আধা-বৌ রাখতে বলব।

এত ঠাণ্ডা গলায় তিনি কথাটা বললেন যে, ইংয়ের তা বোধগম্য হল না। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন, চিবুণীর গতি থেমে গেছে। ইংয়ের হাত তাঁর চুলের গোড়ার দিকে গোছাসমেত আঁট করে ধরে আছে।

তোর আর কিছু বলার দরকার নেই, শ্রীমতী ওয়াষ্ বললেন।

আবার চিবুণী চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। তিনি বললেন, উঃ চুলে বড় টান লাগছে।

চিবুণীটা মেঝের ওপব ছুঁড়ে ফেলে ইং ফেটে পড়ে বলল, তুমি ছাড়া আর কারো সেবা করতে আমি পারব নি বাপু।

তোকে তো তা করতে বলিনি, শ্রীমতী ওযায়্ উত্তর দিলেন।

তবু ইং তার মনিবানীর পাশে টালিব মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এই উৎসব উপলক্ষে যে নতুন সাটিনের জামাটা পরেছিল, তাতে চোখ মুছতে লাগল।

ও বৌদিমণি গো, দাদাবাবু কি এর জন্য তোমাব ওপব জবরদস্তি করছেন মা-লক্ষ্মী? তুমি যে কত সোন্দর, তুমি যে কত ভাল তা কি উনি ভুলে গেছেন। আমায় শুধু এই কথাটি বল তুমি—

না রে, এটা আমার নিজের ইচ্ছে। নে আর বসে থাকিস না। ওঠ্। মাটি থেকে চিবুণীটা কুড়িয়ে নিল ইং এবং চোখেব জল মুছে আবার শ্রীমতী ওয়াষ্র চুল আঁচড়াতে শুরু করল। শ্রীমতী ওয়ায়্ তাঁর শান্ত যুক্তিপূর্ণ স্বরে বলতে শুরু করলেন, তোকেই প্রথমে বললাম ইং। যাতে অন্যসব দাস-দাসীদের মধ্যে কীভাবে চলতে হবে এই ব্যাপারে, তা আমি তোকে বুঝিয়ে বলতে পারি। এ নিয়ে তোদের মহলে যেন কোন কানাকানি না হয়, যে এর দোষে হল বা ওর দোষে হল—এইসব নিয়ে। যখন সেই মেয়েটি আসবে—

কে সে? ইং জিজ্ঞেস করল।

এখনও তা আমি জানি না। শ্রীমতী ওয়ায়্ উত্তর দিলেন।

কবে আসবে?

এখনও তা ঠিক করি নি। তবে সে যখনই অসুক না কেন, তাকে সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নিতে হবে এই বাড়িতে। মর্যাদায় সে আমার পরেই,

পুত্রবধূদের আগে। যাত্রা-থিয়েটার করা মেয়ে বা বাঈজীদের মত গানওয়ালী মেয়ে না সে, ভাল গেরস্থঘরের মেয়ে! সবকিছুই সুশৃঙ্খলভাবে করে যেতে হবে। সবচেয়ে বেশী নজর রাখতে হবে, যেন তোদের দাদাবাবুর বিরুদ্ধে বা যে-মেয়েটি আসবে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলা না হয়। কারণ সে তো আর যেচে আসছে না। আমিই তাকে ডেকে নিয়ে আসছি। শ্রীমতী ওয়ায়ু থামলেন।
ইং এটা সহ্য করতে পারছিল না। সে বলে ফেলল, আচ্ছা বৌদি, এত বছর ধরে তুমি আমি একসঙ্গে আছি। তা আমি কি তোমাকে শুধোতে পারি না, কেন তুমি এমনধারা করতে যাচ্চো?
শুধোতে পারিস কিন্তু আমি তোকে বলব না, শ্রীমতী ওয়ায়ু শান্তভাবে উত্তর দিলেন।
নীরবে ইং চুল আঁচড়ে সুগন্ধি তেলে চানের জন্য খোঁপা বেঁধে বলল, তোমার চানের জল তৈরী বৌদি। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর দেহের শেষ পরিধেয়টিকেও খুলে ফেলে, তরুণীর মত তন্বী শরীরে এগিয়ে গেলেন চানের ঘরে। তিনি তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। কুমারীর মত নিবিড় স্তন দু'টিকে জলের ভিতর পদ্মকলির মত ভাসিযে দিলেন।
জল থেকে উঠে এলে ইং তাঁর গায়ে রেশমী তোয়ালে জড়িয়ে গা মুছিয়ে দিল এবং ধুইয়ে আনা রেশমী রাত্রিবাস পরিয়ে দিল গাযে। তাবপর হাত ও পায়ের নখের পরিচর্যা করল। সব কাজ সারা হলে শোবার ঘরের দরজা খুলে ধরল সে।
শয়ন-মন্দির তখনো শূন্য। কারণ ইং চলে না গেলে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু সচরাচর ঘরে ঢুকতেন না। তবে এমন অনেক রাত গেছে যখন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু এ-ঘরে পা-ও দিতেন না। তেমন রাতের সংখ্যা অবশ্য কম। বিছানার পাশে উঁচু টুলটায় পা রেখে শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর উঁচু খাটে উঠে পড়লেন। খাটের ওপর রেশমী চাঁদোয়া টানানো রয়েছে।
মশারিটা ফেলে দেব কি বৌদি? চাঁদের আলো যেন পিনিক দিচ্ছে!
না, থাক। একটু জ্যোৎস্না দেখি, শীমতী ওয়ায়ু বললেন।
কাজেই বড় বড় রূপোর হুকে টানানো মশারি তোলাই রইল। ইং টী-পট আর রাত্রিবেলা ঘুম না এলে কখনো কখনো শ্রীমতী ওয়ায়ু যে রূপোর পাইপে ধূমপান করেন সেটা ঠিক করে রাখল। তার পাশে দেশলাই মোমবাতি গুছিয়ে রাখল।
কাল আবার দেখা হবে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
কাল আবার দেখা হবে, বৌদি, ইং জবাব দিল। তারপর চলে গেলে শ্রীমতী ওয়ায়ু হাল্কা রেশমী কাঁথা গায়ে দিয়ে নিশ্চল ও ঋজু হয়ে চুপচাপ শুয়ে

পড়লেন। কিছু ভাবছিলেনও না, কিছু মনে করার চেষ্টাও করছিলেন না। কেবল নিজের অস্তিত্বের মধ্যে অবগাহন করছিলেন। তিনি কারুর জন্য অপেক্ষাও করছিলেন না, কাউকে আশাও করছিলেন না। যদি আজ তাঁর স্বামী না-ই আসেন এ-ঘরে, তবে তিনি এখন ঘুমিয়ে পড়বেন এবং পরে একসময় তাঁকে বলবেন কথাটা। সময়কে নির্বাচিত করতে হয়, নির্দ্ধারিত করে নিতে হয়। ঠিক এই মুহূর্তে উঠোনে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর ভারী পদধ্বনি শুনতে পেলেন। তারপর দরজা খুলে গেল এবং শোবার ঘরে ঢুকলেন তিনি। এতক্ষণ মদ্যপান করছিলেন। উত্তেজক, অ্যালকোহল তাঁর নিশ্বাস ও রোম-কূপের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হচ্ছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ুর ঘ্রাণের প্রখর অনুভূতি কিন্তু তিনি বিব্রত হলেন না। কারণ তাঁর স্বামী মদ্যপানের সময় কখনোই মাত্রা ছাড়িয়ে যান না। আজ রাত্রে নিশ্চয় তিনি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছিলেন। এ-ধরনের ভোজসভায় দিনের উপসংহারে কিছু মদ্যপান করা ছাড়া আর কোন কাজটা বেশী স্বাভাবিক হত? হাতের পাইপটা টেবিলে নাবিয়ে রাখতে গিয়ে এক মুহূর্ত দেরী করলেন এবং পাইপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তুমি কি ক্লান্ত? তিনি আচমকা জিজ্ঞেস করলেন।

মোটেই ক্লান্ত না, শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রশান্ত স্বরে উত্তর দিলেন।

তিনি পাইপটা নাবিয়ে হুক থেকে মশারিটা খুলে বিছানায় উঠে পড়লেন। চব্বিশ বছরের দাম্পত্য-জীবনে তাঁদের মধ্যে অবশ্যই এক ধরনের রুটিন তৈরী হয়ে গিয়েছিল। আজ তিনি সেই রুটিনের কিছু বৈচিত্র্য পেতে চাইলেন কারণ আজ যে রজনী যাবে স্বামীর সঙ্গে, সেটাই তাঁর শেষ রজনী। তিনি ইতি-মধ্যে এই বৈচিত্র্যের বিষয়ে ভেবেছিলেন আবার এর বিপক্ষেও ভেবেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা তাঁর স্বামীকে বোঝানো কঠিন হবে।

আজ তোমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সবাই তাই বলল, তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন।

বালিসে মাথা রেখে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে-পড়া স্বামীর চোখে চোখ রেখে শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর স্বাভাবিক সুন্দর হাসি হাসলেন। বিছানার পাশের ছোট টেবিলটার ওপরে রাখা মোমবাতির করুণ শিখার ক্ষীণ আলো-ছায়ায় তাঁর স্বামীর কালো চোখ-জোড়া জ্বলছে নিবছে।

তিনি তাঁর চোখ দুটি বন্ধ করলেন।

তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতি চঞ্চল হল। তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য তিনি কি অনুতাপ করবেন?

এর পর দু-ঘণ্টা ধরে তুলে-আনা কোমল ফুলের মত শায়িত থাকলেন তিনি।

অনেকবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন এই প্রশ্নটা। তিনি কি অনুতাপ করবেন পরে? তিনি কি অনুতাপ করবেন না তখন?

দু-ঘণ্টা পরে বুঝতে পারলেন যে, পরে এ নিয়ে কোন হা-হুতাশ করবেন না তিনি। স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে, তিনি উঠে নিঃশব্দে বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডাজলে ভাল করে আবার চান করলেন। বিছানায় তাঁর স্বামী হাত-পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে নিদ্রিত। চান করে এসে আর সেই বিছানায় গেলেন না। তাঁর সেই পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে মিষ্টিতামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন। এরপর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে লাগলেন। চাঁদ প্রায় ডুবে গেছে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এই প্রাচীন বাড়ির ছাদে পাঁচীলের পেছনে সে ঢাকা পড়ে যাবে। তাঁর সমগ্র সত্তায় শান্তি নেবে এল। বাকী জীবনটা তিনি আর এ-ঘরে শোবেন না। এর মধ্যেই তিনি তাঁর নিজের জায়গা বেছে রেখেছিলেন। শাশুড়ির মহলের পাশেই খালি ঘরটায় শ্বশুর থাকতেন, সে ঘরটাই নেবেন তিনি। দিনরাত্রি শাশুড়িকে দেখাশুনা করতে পারবেন, এই অজুহাতে ঘরটা নেবেন। বিশাল বাড়িটার ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে ঘরটা। সেখানে শান্তিতে একা কাটাবেন বাকী জীবন। এক হৃদয় আর নিজেকে নিয়ে বেঁচে থাকবেন তিনি।

হঠাৎ হাই তুলে জেগে উঠে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুদ বললেন ইস্ আমার নিজের ঘরে গিয়ে শোয়া উচিৎ ছিল। সারাটা দিন যা ধকল গেল তোমার! একটু ঘুমিয়ে নাও।

যখনই শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুদ এ-কথা বলতেন, তখনই শ্রীমতী ওয়ায়ুদ উত্তর দিতেন, এই তুমি উঠো না লক্ষীটি। আমি স্বচ্ছন্দে বেশ ঘুমোতে পারব।

কিন্তু আজ রাত্রে সে-উত্তর দিলেন না তিনি। মাথা না ফিরিয়ে বললেন, ধন্যবাদ! হয়ত তোমার কথাই ঠিক।

এই কথায় তাঁর স্বামী এত অবাক হলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেবে পড়ে তাড়াতাড়ি চটিজুতো খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শ্রীমতী ওয়ায়ুদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে চটিজুতোজোড়া বের করলেন এবং ওইভাবে বসে থেকেই স্বামীর পায়ের কাছে চটিজুতোজোড়া দিলেন। তিনিও বিশাল এক শিশুর মত শ্রীমতী ওয়ায়ুদের কাঁধে মাথা রেখে বাহুবেষ্টনে বেঁধে ফেললেন তাঁর কোমল দেহবল্লরী। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, জুঁইফুলের চেয়েও তোমার সুগন্ধ বেশী।

আলিঙ্গনে ধরা পড়ে শ্রীমতী ওয়ায়ুদ হাসলেন। বললেন, তোমার নেশা কি এখনও যায় নি?

নেশা—মাতাল—নেশা ! তিনি অস্ফুট স্বরে বলছিলেন। আবার শ্রীমতী ওয়ায়ুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। তিনি ভয় পেয়ে উঠে বললেন, এই না, না, আর না।

তারপর বললেন, তোমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দেব কি ?

সহসা ইস্পাতের মত কঠিন শক্তিতে তিনি তাঁর স্বামীকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন ওই আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়।

তোমার লেগেছে ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত। শ্রীমতী ওয়ায়ু স্বামীর কালো চোখ থেকে লালচে ভাবটা মিলিয়ে যেতে দেখলেন।

না, তিনি উত্তর দিলেন। চব্বিশ বছর পরেও কি আমার আঘাত লাগতে পারে তোমার কাছ থেকে ?

কিন্তু—কিন্তু আমি শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছ !

আজ আমার চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই সেই মুহূর্ত। এই রাত্রির মধ্যে যখন বাড়ির আর সবাই ঘুমে অবলুপ্ত, তখনই এসেছে সেই নির্ভুল মুহূর্ত। তিনি পালঙ্কের ওপর বসে-থাকা স্বামীর কাছ থেকে সরে গেলেন এবং জ্বলন্ত মোমবাতিটা থেকে অন্য মোমবাতিগুলি জ্বালিয়ে দিতে লাগলেন। একটার পর একটা মোমবাতি জ্বলে উঠল দীপাবলির মত। সমস্ত ঘর আলোময় হয়ে গেলে তিনি টেবিলের পাশে বসলেন। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বিছানায় বসে তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

অনেক বছর ধরে আমি এই দিনটির জন্য প্রস্তুত করেছি নিজেকে, তিনি বললেন। হাঁটুর ওপর দু-হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে তিনি বসেছিলেন সাদা রেশমী পোষাকে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়, হাঁটুর ওপর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তাঁর সত্তার সবটুকু সবল শক্তিকে আহ্বান করলেন।

তাঁর স্বামী সামনের দিকে ঝুঁকলেন। তাঁর হাত দু-হাঁটুর মাঝখানে জড়ো করা, দু-চোখ চেয়ে আছে শ্রীমতী ওয়ায়ুর দিকে।

বৌ হিসেবে তোমার কাছে ভাল ভাবেই চলে এসেছি, তিনি বললেন।

স্বামী হিসেবে আমিও কি সেরকম থাকি নি ?

সেভাবেই তো সবসময় আমরা চলেছি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এর চেয়ে ভাল হতে পারে না। কিন্তু এখন আমার আর্দ্ধেক জীবন পার হয়ে গেছে।

মাত্র আর্দ্ধেক ! তাঁর স্বামী জবাব দিলেনন।

কিন্তু তোমার জীবনের আর্দ্ধেক পার হতে এখনও ঢের দেরী। নারী ও পুরুষের সামর্থ্যের মধ্যে ঈশ্বর এই পার্থক্য করে দিয়েছে।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তাঁর কথা যেমন মন দিয়ে শুনতেন সেভাবেই শুনছিলেন। তিনি জানতেন যে শব্দের খাঁচা থাকলেও তাঁর কথা অতিরিক্ত একটা অর্থের ভার বহন করে সবসময়। অনেক সময় যে-অর্থ তাঁর বোধগম্যও হয় না।

তুমি এখনও যৌবন হারাও নি। তোমার কামনা-বাসনা এখনও জ্বলন্ত এবং প্রবলভাবেই তারা জ্বলছে। আরও অনেক সন্তানের জনক হওয়া উচিৎ তোমার। কিন্তু···কিন্তু আমার হল সারা। আমি নিজে শেষসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তাঁর আলস্য-শিথিল শরীর টানটান করে নিলেন। তাঁর সুদর্শন মুখাবয়ব কঠিন আকার ধারণ করল। আমি যা বুঝতে পারছি তুমি কি তাই বলতে চাইছ!

তুমি ঠিকই বুঝেছ, তিনি উত্তর দিলেন।

চব্বিশ বছর সময় পেরিয়ে তারা পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। যে চব্বিশ বছর তাঁরা এ-বাড়িতে কাটিয়েছেন, যেখানে তাঁদের সন্তানরা এখনও নিদ্রিত! যেখানে তাঁর শাশুড়ি জরাগ্রস্ত হয়ে জীবনের শেষ প্রহর গুণছেন। আমি অন্য কোন মেয়েমানুষ চাই না। অন্য কোন স্ত্রীলোকের দিকে আমি কখনো চোখ মেলে তাকাই নি। এ-পর্যন্ত যত নারী আমি দেখেছি, তারা কেউ তোমার মত সুন্দরী নয়। এখনও সৌন্দর্যে তুমি যে-কোন রমণীর কাছে অপরাজিতা।

তিনি একটু ইতঃস্তত করলেন। তাঁর চোখ স্ত্রীর মুখ থেকে সরে হাতের দিকে গেল। বললেন, আমি আজ ওই তরুণীটিকে দেখলাম—যখন তাকে দেখলাম আমি ভাবলাম, ওর চেয়ে তুমি আরও কত বেশী রূপসী!

শ্রীমতী ওয়ায়ু তক্ষুনি বুঝলেন কোন মেয়েটির কথা তিনি বলছেন। তিনি মেনে নিয়ে বললেন, আহ্ লিনউয়ি দেখতে মোটামুটি ভাল। মনে মনে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে পুনর্জীবিত করলেন। যখন কথাবার্তা আরও এগোবে এবং উপপত্নী নির্বাচন করার কথা উঠবে তখন তিনিই সে-কাজের ভার নেবেন। যদি দুই প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্কগত গণ্ডগোল থাকে তবে এই পরিবারের পক্ষেই সেটা খারাপ। লিয়াংমোর সংগে তো মেং-এর বিয়ে হয়েছে। মেং আর তার বোন লিনউয়ি দু'জনেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মেয়ে।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তাঁর ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর ঈষৎ উন্মুক্ত করলেন। না, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী নই। আমার বন্ধু-বান্ধবরা কী বলবে? মেয়েমানুষের পেছনে ছোটার মত লোক আমি নই।

কোমল হাসিতে শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখ ভরে উঠল। হাসতে গিয়ে যারপরনাই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন তার মূল। যদি বন্ধু-বান্ধবের চোখে কাজটা

কেমন দেখাবে, এই তাঁর চিন্তাধারা হয়, তবে যতটা দেরী হবে বলে মনে করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক আগেই স্বামীকে বোঝানো যাবে। চল্লিশ বছর পেরুবার পরও ছেলেপুলে হলে, যে-কোন মহিলার পক্ষেই সেটা লজ্জাকর, খারাপ। সেজন্য তোমার বন্ধু-বান্ধবরা তোমাকেই দোষ দেবে। আর কোন সন্তানের জন্ম দেওয়া কি তোমার দরকার? শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু পালটা প্রশ্ন করলেন।

সবসময়েই তার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তোমাকে বিব্রত করার ভয় থেকে আমি রেহাই পেতে চাই।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে আর একটুও ভালবাস না? স্বামীর দিকে ঝুঁকলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। এবার হৃদয় থেকে হৃদয়ে। তিনি বললেন, তোমাকে আমি এখনও সেই আগের মতই ভালবাসি। তোমার মুখ ছাড়া আর অন্য কিছুই আমি চাই না।

এতে আমার সুখ হবে? বিষণ্ণ গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তুমিতো জানোই যে বরাবর আমার হাতেই তোমার সুখের আয়োজন করে এসেছি, বলে দু-হাত এমন ভাবে তুললেন যেন সেই হাতে তিনি একটি হৃদয় ধরে আছেন। তিনি আবার বললেন, এ-ভাবেই সেই শুভদৃষ্টির সময় থেকে আমি তোমার সুখের পাত্র ধরে আছি। আমরণ এ-ভাবে ধরে থাকব।

আমাকে ফেলে রেখে যদি তুমি মরে যাও, তবে আমার সুখও মরে যাবে। না, তা আমি হতে দেব না। মরার আগে অন্য কারো হাতে দিয়ে যাব। যার হাত আমি এ-জন্য মনের মত করে গড়ে নেব।

তিনি দেখলেন স্বামীর ওপর তাঁর কথার প্রভাব ক্রমশ কার্যকর হচ্ছে। নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু।

পেয়ালার মত নিজের দু-হাত একত্র করে ফিসফিস করে বললেন, আমার ওপর আস্থা রেখো।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন, তোমার ওপর কখনোই আমার আস্থার অভাব হয় নি। পেয়ালার মুদ্রা থেকে নিজের দু-হাত বিযুক্ত করলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

নাছোড়বান্দার মত শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন কথা দিচ্ছি না, এত তাড়াতাড়ি কথা দিতে পারি না—

কোন কথা দিতে তোমাকে হবে না। পারলেও তোমার ওপর এ-বিষয়ে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। জোরজার করে কখনই বা কী করেছি? নাও এখন আমার এই বিষয়টা একপাশে সরিয়ে রাখো। শুয়ে পড়ো তো গিয়ে, তোমার গাটা ঢেকে দিই। ভোর হয়ে আসছে, শেষরাতে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে। তুমি ভাল করে ঘুমোও দেখি তাড়াতাড়ি, ওঠার দরকার নেই।

হাত, বাহু কাঁধের ওপর দ্রুত মৃদু চাপ দিয়ে তিনি তাঁকে শুতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি অনিচ্ছাসহকারে স্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করলেন। শুধু বললেন, মনে রেখ আমি কিন্তু কোন কথা দেই নি।

না দাও নি। কোন কথা দাও নি। তিনি স্বীকার করলেন। স্বামীর গা ঢেকে একটা পর্দা তুলে যে-দিক দিয়ে ভোরের আলো ঢুকবে সে-দিকের পর্দাটা ফেলে দিলেন।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু চট করে তাঁর হাত ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় ঘুমোবে ?

ও—সেকথা ! আমার বিছানা তৈরী আছে, মৃদু কৌতুকমাখা স্বরে তিনি বললেন। কাল ভোরবেলা আমাদের দেখা হবে। এ-বাড়ির কোন কিছুই বদলাবে না। আমরা বন্ধুর মতই থাকব, কথা দিচ্ছি, ভয় বা লজ্জার জন্য আমরা দূরে সরছি না।

এই প্রতিশ্রুতি, এই সুরেলা কণ্ঠস্বরে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিলেন।

তিনি ঘুমিয়ে পড়লে শ্রীমতী ওয়ায়ু লঘু পদসঞ্চারে বেরিয়ে পড়লেন এবং একা-একা উঠোন পেরিয়ে শাশুড়ির মহলের পাশের মহলের দিকে এগিয়ে চললেন। শ্বশুরমশাই বিগত হবার পর থেকে এত বছর ধরে তিনি নিয়মিতভাবে ঘরটাকে ধুইয়ে-মুছিয়ে রেখেছেন এবং মাত্র কয়েকদিন আগে মেঝের ওপরে পাটির গদির ওপর নতুন বিছানা পাতিয়েছেন, আজ তিনি সেই নতুন বিছানায় উঠলেন।

চল্লিশ বছর অতিক্রম করার পর এই প্রথম দিনটিতে চোখ মেলে শ্রীমতী ওয়ায়ুর মনে হল, মন থেকে একটা ভার নেবে গেছে। চেনা কিন্তু অনভ্যস্ত ঘরের দেওয়ালে তাঁর চোখ পড়ল। আগে যে-ঘর সাজানো হয়েছিল একটি তরুণীর জন্য। যে একমাত্র ছেলের বৌ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিলেন ' এ-বংশের সন্তানদের গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আজও, এই চব্বিশ বছর পরেও যা বদলাবার মোটেই দরকার হয়নি, এ-রকম ভারী টেঁকসই উজ্জ্বল রংয়ের সাটিনের পর্দা দিয়ে পুত্রবধূর জন্য ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি। কেবল ওই পাহারের গা-বেয়ে-ওঠা মানুষের মূর্তির ছবিটা তাঁর যোগ করা। সেই ছবিটার অভাব বোধ করলেন তিনি। ছবিটা আনিয়ে নিতে হবে, জামা-কাপড় আনাবার সঙ্গে।

এ-ছাড়া নবীনা সেই উপপত্নীর জন্য ঘরটা বেশ মানান সই হবে। ঘরের পর্দায় আঁকা ফল ও বংশবৃদ্ধির নানা প্রতীক এবার সেই তরুণীর জন্যই হক। তাঁর আগের বিছানার চেয়ে অনেক বড়সড় বিছানায় শ্রীমতী ওয়ায়ু শুয়ে শুয়ে

হৃদয়ের অতল তলে ডুব দিলেন।
গোলাপফুল আঁকা তাঁর বিছানায় আরেকটি মেয়ে এসে শোবে এ-কথা ভাবতে কি তাঁর মনে কষ্ট হচ্ছে?
মৃদু একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবে সে-যন্ত্রণা যেন নিয়তি নির্দিষ্ট। বেশ অনেকক্ষণ ধরে তিনি ভাবলেন। হায় ভগবান! কেন যে পুরুষের দ্বিগুণ পরমায়ু দিয়ে মেয়েদের এ-জগতে পাঠান নি! কেন যে পরিপূর্ণতার জন্য পুরুষকে নারীর গর্ভে তার ঔরসের বীজ অত দীর্ঘকাল ধরে বারেবারে নিক্ষেপ করে যেতে হয়?
এভাবে ভাবতে ভাবতে সেই মৃদু ও সূক্ষ্ম সব জড়ানো যন্ত্রণা যেন গলে মিলিয়ে গেল। তিনি মুক্তির আলো দেখতে পেলেন। মনের ভেতরটা স্থির হল। যেন সেই অল্পবয়েসের বালিকা-জীবনের মত তিনি তাঁর এই নতুন স্বাধীনতাকে অনুভব করলেন! কী অদ্ভুত অথচ মনোরম ভোরের আলো না-ফোটা পর্যন্ত সারারাত নিজেকে বা কাউকে বিব্রত না করে ইচ্ছেমত ঘুমোনো বা বিছানা ছেড়ে ওঠা! কমনীয় নিজের হাত দেখলেন—এরা এখন মুক্তির উল্লাসে দীপ্ত। তিনি এখন থেকে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যকে বরণ করে নেবার জন্য অপেক্ষা করবেন কিন্তু তাঁর স্বামীকে ছেড়ে নয়। কোন সম্পর্ক বাদ দিয়ে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সহজ হবে না, একথা ঠিক। তাঁকে তাই এমন কোন পথ খুঁজে বের করতে হবে, যে-পথে গেলে স্বামীর ওপর তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে, আবার নবাগতাও বঞ্চিত হবে না।
সবার প্রতি আমার যা কর্তব্য আমি তাই করব, তিনি ভাবলেন।
এখন কথা হচ্ছে এই নবাগতা হিসেবে কাকে আনা যায়? শ্রীমতী ওয়ায়ু এ নিয়ে অনেক ভেবেছিলেন। এখন আবার ভাবলেন। এটা ঠিক যে, সে এমন একটি মেয়ে হবে, যে তাঁর চেয়ে অনেকটা আলাদা।
তার অল্পবয়েস থাকবে, তবে বৌমাদের চেয়ে ছোট হবে না। হলে সংসারে অশান্তি দেখা দেবে। বাইশ—হ্যাঁ তার বাইশ বছর বয়েস হলেই সবদিক রক্ষা হবে। খুব শিক্ষিতা হবার দরকার নেই। কারণ তিনি নিজে সুশিক্ষিতা। আধুনিকা হবে না; আধুনিক মেয়েরা উপপত্নী হয়ে থাকতে চাইবে না। আর যদি চায়ও তবে অল্পদিনের মধ্যেই সে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মন ও সময়কে পুরোপুরি অধিকার করতে চাইবে তাঁকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। এর ফলে ছেলেদের সামনে তাঁকে লজ্জায় পড়তে হবে! কোন বয়স্ক লোকের পক্ষে উপপত্নী রাখাটা অমর্যাদাকর কিছু নয় কিন্তু তিনি যেন তার খপ্পরে না পড়েন। দেখতে সে মোটামুটি ভাল নিশ্চয় হবে কিন্তু বাড়ির ছেলেদের বা শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মন টলিয়ে দেবার মত রূপের আকর্ষণ যেন

তার না থাকে। মোটামুটি লাবণ্য-শ্রী চেহারা থাকলেই যথেষ্ট হবে। তাঁর নিজের রূপ যে-ধরনের, নবাগতার রূপ হবে তা থেকে অন্য ধরনের। তার চালে সে হবে একটু গোলগাল গঠনের, রংটা হবে গোলাপী। হাড় চওড়া হলেও কিছু এসে যাবে না। শ্রীমতী ওয়ায়ু যা ভাবলেন তাতে তাঁর একটি গ্রাম্য যুবতীর কথাই মনে এল। তাছাড়া গ্রাম্য যুবতীর স্বাস্থ্য ভালই থাকে এবং তার সন্তানেরাও হবে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। গ্রামের মেয়েদের বদভ্যাসও কিছু থাকে না। সন্তান তাকে দিতেই হবে। সন্তান ছাড়া কোন মেয়েই খুশি হয় না। নিঃসন্তান মেয়েরাই খিটখিটে হয় এবং হরেকরকম চাহিদার বেড়াজালে পুরুষকে বেঁধে ফেলে। রক্ষিতা রেখে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর সুখ যেন কমে না যায়। একটু বোকাসোকা ধরনের হবে যাতে সে যেটুকু পাচ্ছে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে তাতেই সন্তুষ্ট হয় এবং তাঁর ও শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে মাথা না ঘামায়।

এখন এই নবাগতা মেয়েটির একটি পরিষ্কার ছবি তার মনে ফুটে উঠল। তিনি স্বাস্থ্যবতী, ঈষৎ নির্বোধ, মোটামুটি ভাল চেহারার একটি যুবতীকে দেখতে পেলেন। যে নাকি খাবার-দাবারের ভক্ত. যে এর আগে কোন বিশাল বাড়িতে বাস করে নি বলে এ-বাড়ি সম্পর্কে বেশ কিছু ভয় ভয় ভাব মনে পোষণ করছে, যে জেদী বা গর্বিতা নয়—যাকে সে মেজাজ দেখিয়ে বা চেঁচামেচি করে সেই ভয়ের ভাবটা দূর করে দিতে পারে।

প্রফুল্ল মনে শ্রীমতী ওয়ায়ু ভাবলেন, এমন মেয়ে ঢের পাওয়া যাবে।

তিনি ঠিক করলেন, উঠে দিনের কাজ শুরু করবেন সেই বুড়ী ঘটকীকে ডেকে যে মেং-এর ব্যাপারে দু-পক্ষের যোগাযোগ ঘটিয়েছিল।

এবার তিনি এই মহলের ঘরগুলির কথা ভাবলেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী শ্বশুর আগে তাঁকে মাঝে মাঝে এই ঘরের লাইব্রেরী থেকে কোন বই পড়ে শোনাবার জন্য ডেকে পাঠাতেন। তাঁর নিজের কোন মেয়ে ছিল না। তাই যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ শুধু রূপসীই নয়, সুশিক্ষিতাও তখন পুত্রবধূর সঙ্গে শ্বশুরের কথা বলতে নেই এই পুরোনো নিয়মটা বাতিল করে পরম স্নেহে তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর পড়ার বাতিক নেই। তাই ইচ্ছে হলেও তিনি বই পড়তেন না। শ্রীমতী ওয়ায়ু মনে মনে ঠিক করলেন, এখন থেকে তিনি এই লাইব্রেরীতে বই পড়তে পারবেন। এই মহলের কোন অদল-বদল করবেন না তিনি। তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুরের স্মৃতি রয়েছে এই তিন ঘরের মহলে, তার মধ্যে একটা শোবাব ঘর। লম্বা বসার ঘরটা শেষ হয়েছে উঠোনের দিকে। উঠোনের দিকটায় সামান্য বদলাতে হবে। গাছগুলি সেখানে এত গায়ে গায়ে আছে যে যথেষ্ট রোদ্দুর তার

ফাঁক দিয়ে আসতে পারে না। তলাকার পাথরের পথটা তাই শ্যাওলা ধরে পিছল হয়ে উঠেছে। এমন সময় দরজায় কে যেন করাঘাত করল।

ভেতরে এস, তিনি বললেন।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইং ঢুকল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, তুমি যে বৌদি কোতায় রয়েছো তা বুজতে পারি নি বলে, তোমার সে-ঘরে ঢুকে দাদাবাবুকে জাগিয়ে ফেলেচিনু; তা দাদাবাবু অনেক বকলেন।

আমরণ তুই আমাকে এ-ঘরেই দেখতে পাবি রোজ সকালবেলা, শান্তস্বরে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

ধীরে ধীরে খবরটা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল।

সবাই জানল যে তাঁর শ্বশুরমশাই যে-ঘরে থাকতেন, সে-ঘরে শ্রীমতী ওয়ায়ু থাকেন। একসময় খাস-চাকরানীর মুখ থেকে তাঁর শাশুড়ির কানেও উঠল কথাটা। কথাটা ইচ্ছে করে তিনি নিজে বয়ে নিয়ে যান নি। তাহলে প্রৌঢ়ার রাগের প্রথম ঝাপটা তাঁর ওপরই পড়ত। এর চেয়ে ঝিব ওপর দিয়ে প্রথম রাগটা বয়ে যাওয়াই ভাল।

উঠোনের গাছগুলি কাটানো হয়েছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু দেখতে পেলেন যে খাস-চাকরানীর হাতের ওপর ভর দিয়ে তাঁর শ্বশ্রূমাতা চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছেন। তাঁর অন্য হাতে ড্র্যাগনের মাথাওয়ালা একটা লাঠি যাতে ভর দিয়ে তিনি চলছিলেন।

চীনের-গবব গাছটা কেটে ফেললে! অনুযোগের সুরে প্রৌঢ়া বললেন।

তাঁকে দেখেই শ্রীমতী ওয়ায়ু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হেসে এগিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে বললেন, এত জন্মায় গাছগুলি, আর এত ওদের বাড় যে বলা যায় না। এটা পোঁতা হয় নি। দুটো পাথরের মাঝখানে গাছটা নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রৌঢ়া দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর কনুই ধরে ভেতরে যেতে সাহায্য করতেই তিনি বিরক্তিভরে সেই হাত ঠেলে সরিয়ে দিলেন, আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার ওপর আমি খুব রাগ করেছি, খিটখিটে স্বরে তিনি বললেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শাশুড়ির পেছনে পেছনে বসার ঘরে গেলেন। প্রৌঢ়া কর্কশ চড়া বুড়োটে গলায় বললেন, তুমি যে এ-ঘরে থাকবে আমাকে তো তা বল নি? এ-বাড়ির কোন কথাই আমাকে জানানো হয় না।

আসন গ্রহণ করলেন তিনি।

আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল।' আমার অন্যায় হয়ে গেছে ; এজন্য আমাকে ক্ষমা করুন, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

প্রৌঢ়া আবার তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, খোকার সঙ্গে কি তোর ঝগড়া হয়েছে বৌ ?

মোটেই না মা। আমরা কখনো ঝগড়াঝাটি করি না। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

আমায় কথায় ভুলাস নি বৌ ; সত্যি কথা শোনার ক্ষমতা আমার আছে রে। মা, আপনাকে কেন আমি মিছিমিছি কথা দিয়ে ভোলাব। গতকাল আমার চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। অনেকদিন ধরেই ভেবে আসছি যে এই বিশেষ দিনটি যেদিন আসবে, সেদিন থেকে আমি নারী হিসেবে আমার কর্তব্য থেকে অব্যাহতি নিয়ে অন্য কোন মেয়ের হাতে সঁপে দেব আপনার ছেলেকে। তিনি এখনও সমর্থ পুরুষ। বয়েসও তাঁর মাত্র পঁয়তাল্লিশ। তাঁর অনেক কাল পরে আছে এখনও।

ছড়ির ড্র্যাগনের মাথাটার ওপর তাঁর অস্থিচর্মসার হাত দুখানা স্থির হল। তিনি এক নজরে পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে আছেন। দৃঢ় গলায় জানতে চাইলেন, ও কি অন্য কাউকে ভালবাসে নাকিবে ! ওকি রাঢ়মাগীদের কাছে যায় ? যদি যায় তবে—তবে—

না মা। এর পেছনে কোন মেয়েমানুষ নেই। আপনার ছেলে সেরা মানুষ। আমার সঙ্গে সব সময়ই তিনি ভাল ব্যবহার করেছেন। এজন্য আমি আমাদের এই সুন্দর সতেজ সম্পর্ক স্বার্থপবের মতই ধবে রাখতে চাই। এই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে যদি এই বয়েসেও পেটে ওর ছেলে ধরার ভয়টা সবসময় জেগে থাকে। যদি আমার বাসনা মিটে গিয়ে থাকে, ওরটা না মেটে, তবে তো তা হতে পারে না।

কিন্তু লোকে তো বলবে যে খোকা তোকে বোকা বানিয়েছে। আর তুই এভাবে তার শোধ তুলছিস। কঠিন গলায় প্রৌঢ়া বললেন। তিনি আবার যোগ করলেন, বল্ কে বিশ্বাস করবে যে তুই নিজের ইচ্ছায় সরে এসেছিস অথবা ওকে তোর আর ভাল লাগে না ?

ওর ওপর টান আমার কমে নি মা।

একসঙ্গে না শুলে স্বামী-স্ত্রীর টানের আবার কী দাম রে, শাশুড়ি জিজ্ঞেস করলেন।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, তা আমি বলতে পারব না। একথা অনেকবার আমারও মনে হয়েছে। এবার তার উত্তর আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। শাশুড়ি বললেন, আশা করি এজন্য

আমাদের সবাইকে ভুগতে হবে না। আরও আশা করি নতুন অশান্তিটা এ-বাড়িতে আদপে ঢুকবেই না !
তার দায়িত্ব আমার। যদি কোন অশান্তি এ-বাড়িতে হয় তবে সেজন্য আমি নিজেকেই দোষী বলে ভাবব।
সেই মেয়েছেলেটা কোথায় ? অসন্তোষের সুরে প্রৌঢ়া জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর মনে তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি বুঝলেন, তাঁর রাগ গলে মিলিয়ে গেছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তাঁরও এরকম দুর্ভাগ্য হয়েছিল কিছু ভাগক্রমে সেই উত্তরচল্লিশ সন্তান মৃত অবস্থাতেই প্রসব করেছিলেন তিনি। তবুও গত কালের কথা স্পস্টভাবেই তাঁর মনে পড়ল। অথচ তিরিশ বছর আগেকার কথা। ওই বয়েসে যখন জানলেন যে তিনি মা হতে চলেছেন, তখন কী গভীর লজ্জাই না পেয়েছিলেন। প্রসব হবার আগে পর্যন্ত এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সমানে ঝগড়া করেছিলন। বলেছিলেন, যাও যাও এবার একটা রাঁড়মাগী নিয়ে থাকো গে। এমন একটা ছুকড়ি জোটাও—যার চিৎ হতে আপত্তি নেই কখনো !
তাঁর কথায় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এত গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন যে তিনি আর তাঁর ছায়া মাড়ান নি বাকী জীবন। তেমন করে ভালও বাসেন নি। এই নীরবতা তাঁর ভাল লাগে নি। তিনি ছিলেন লাজুক ও ভদ্র—
অনেক বই পড়া পড়ুয়া মানুষ যেমন হয়। তবে গোটা ব্যাপারটা ছিল একটা দুর্ঘটনা বই তো আর কিছু না। তবু এতদিন পরে নিজের সেই রাগের জন্য একটা অস্পষ্ট পাপবোধ তাঁকে পীড়িত করল।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাশুড়ি বললেন, সেই মেয়েছেলেটা কোথায় ? তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে এই প্রশ্নটা আগেই জিজ্ঞেস করেছিলেন।
এখনও তাকে পাই নি।
খুঁজে বের করা মুশকিল হবে, শাশুড়ি বললেন।
আমার তা মনে হয় না। সে কীরকম হবে, সে-সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারনা আমার আছে। এখন শুধু দেখতে হবে যেন অন্যরকম না হয়ে সে হুবহু সেরকমই হয়।
শাশুড়ি বিদায় নিলে শ্রীমতী ওয়ায়ু কিছুক্ষণ একা-একা বসে রইলেন। সারাদিন কেউ এদিকে এল না। এমন কি তাঁর স্বামীও না ; তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর আকস্মিক সিদ্ধান্তের ধাক্কা ছেলে-বৌরা বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এ-বিষয়ে তারা এখনও একমত হতে পারে নি। তিনি বসে বসে হিসেবের খাতাগুলি দেখছিলেন। ধোপা-নাপিত, বাড়ি মেরামতি, চাষবাষ ও দোকান গুলির হিসেব। তাঁর স্বামী বা ছেলেরা ক্বচিৎ

এ-সব বিষয়কর্ম তদারক করেন। গোমস্তা, চাষীদের মুখ থেকে তিনিই প্রতিবেদন শুনতেন ও হিসেবপত্র দেখতেন।

সারাটা দিন এই কাজেই কেটে গেল। মাঝখানে কেবল 'চীনের গরব' গাছটা কাটার সময় ও স্ক্রোলটা টানাবার সময় একবার উঠেছিলেন। বিরাট বাড়িটা নিঃশব্দের মধ্যে ডুবে ছিল। বড় ভাল লাগল এই স্তব্ধতা। এই ক্ষণকালের স্তব্ধতা বড় শান্তি এনে দিল। উত্তরচল্লিশ জীবনে একটি দিন এ-রকম নিঃশব্দতার মধ্যে অতিবাহিত করাটা ভারি মনোরম।

হিসেবপত্র নিখুঁৎ সন্তোষজনক। যা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে কমই খরচা হয়েছে। মড়াইতে যথেষ্ট শষ্য রয়েছে, শিগগিরই নতুন ফসল গোলায় উঠবে। ভাঁড়ারে শুকনো নুন-মাখানো খাবার ও তাজা খাদ্যও প্রচুর। ভাণ্ডারী গুঁড়ি গুঁড়ি অক্ষরে হিসেবের খাতার নিচে লিখেছে—ঊনিশটা তরমুজ। সাতটা হলদেটে, বাকীগুলি লাল, উত্তর দিকের কূয়ো দুটোর মধ্যে ঝুলছে। ঘুমোবার আগে একটা তুলিয়ে আনলে হয়। কিড্‌নীর পক্ষে তরমুজ উপকারী।

হিসেবের খাতা বন্ধ করার পর তিনি মধুর শব্দহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে বসে রইলেন। তাঁর ভেতর থেকে ক্লান্তি নির্গত হয়ে আসছিল! এখন তিনি বড় ক্লান্ত—যতটা আত্মিক, ততটা যেন শারীরিক নয়। ঠিক কোথায় যে এই ক্লান্তির উৎস, তা নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। নিশ্চয় তাঁর মনে নয়, কারণ মন এখনও সক্রিয়। হঠাৎ তাঁর মনে হল যে এতদিন ধরে হিসেবের খাতার অর্বেক বা ছোটরা কোন স্কুলে ভর্তি হবে না হবে কিংবা পারিবারিক কলহের মীমাংসা করা ছাড়া তার মনকে অন্য কোন কাজে তিনি বাস্তবিক ব্যবহার করেন নি।

হয়ত এই ক্লান্তি তাঁর শরীরের গোপনতম কোন জায়গায় জমে ছিল—হয়ত উদরদেশে, হয়ত জরায়ুর মধ্যে। গত চব্বিশ বছর ধরে তিনি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এখন তাঁর সন্তানেরাই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। মা ও ঠাকুমা—এতদিন জন্মদানের পালায় তিনি মগ্ন ছিলেন। এখন সেই কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

উঠোনে পদধ্বনি শোনা গেল। মেজবৌমা বৃলাং ঘরে ঢুকল। এদিকে এস বৌমা, ভেতরে এসে বোস। এইমাত্র হিসেবপত্তর দেখা শেষ করলাম। ভাগ্য ভাল—ফসল এবার বেশ হয়েছে। মেজবৌ দেখতে তেমন সুন্দরী নয়। তার গালের হাড়দুটো উঁচু। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় সে তেমন মার্জিত বা সৌজন্য বজায় রেখে চলে না। বরং মাঝেমধ্যে উদ্ধত ও হঠকারী হতে ভালবাসে। চেয়ারে বসে মেজবৌমাকে দেখছিলেন তিনি।

তারপর বললেন, চেহারার যত্ন নাও না কেন বৌমা ?
মানে ! কী বলছেন ? অস্বস্তির সঙ্গে রূলাং জিজ্ঞেস করল।
এখন তেমার মুখটা সুন্দর আছে কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মুখের রূপ বদলাতে থাকে। তোমার মুখ হয় আরো সুন্দর সতেজ থাকবে, নয়ত রুক্ষ হয়ে উঠবে। নিস্তাপ নিরাসক্ত গলায় তিনি বললেন।
তাঁর কথায় রূলাং-এর অস্বস্তি বেড়ে গেল। সে দু-ঠোঁট চেপে ভ্রু কোঁচকালো।
তুমি কি আমাকে কিছু বলবে বৌমা ? আরামদায়ক একটা চেয়ারে স্থির হয়ে বসে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন।
মা—একটু থেমে রূলাং আবার বলল, মা আপনি সবাইকে বিব্রত করে তুলেছেন !
আমি ? তাঁর গীতিময় কণ্ঠে বিস্ময় ফুটল।
হ্যাঁ, আপনি। আপনার মেজ ছেলে বলেছেন যে, এ-বিষয়ে আপনাকে কিছু বলার এক্তিয়ার আমার নেই। কারণ এটা আপনার বড় ছেলের কর্তব্য কিন্তু আপনার বড় ছেলে বলতে চান না। তাঁর সঙ্গে আপনার কথা বলে কোন ফল হবে না। আর মেং কান্নাকাটি করা ছাড়া আর কিছু করছে না। আমি কাঁদি নি। আমি চাই, কেউ এসে এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলুক।
তা তুমি ছাড়া আর কেউ এল না ! শ্রীমতী ওয়ায়ু মৃদু হেসে বললেন।
রূলাং হাসল না। তার কোমল মুখ লজ্জা ও দৃঢ়তার দ্বন্দ্বে বিক্ষত দেখাচ্ছিল।
সে আবার বলতে শুরু করল, মা আমি জানি আপনি আমাকে পছন্দ করেন না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসার পক্ষে আমি সবচেয়ে কম অধিকারী।
তুমি ভুল বুঝেছ বাছা। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাকে আমি অপছন্দ করি। এমন কি লিটল সিস্টার সিয়াকেও নয়।
একটু কুঁকড়ে গেল রূলাং। তারপর তর্কের সুরে বলল, আপনি আমাকে সত্যিসত্যি পছন্দ করেন না, মা। আমি জানি, আমি সেমোর চেয়ে বয়েসে বড়। আর সেজন্যই আপনি আমাকে অপছন্দ করেন। সাংহাইতে আমাদের অন্তরঙ্গতা এবং আপনাকে কিছু করতে না দিয়ে আমরা নিজেরাই যে নিজেদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেজন্য আপনি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না।
সত্যিই আমি সেটা পছন্দ করি নি। তবে পরে যখন ভাবলাম, সেমোর সুখই আমার কাম্য ; আর তোমাকে দেখে বুঝলাম সেমো সুখী হয়েছে, তখন আমি তোমার ওপর সন্তুষ্টই হয়েছি। তুমি যে ওর চেয়ে বয়েসে বড়, সেটাতো তুমি বদলাতে পার না। পরিবারে এ নিয়ে বিরক্তি দেখা দিয়েছিল। আমি তা সামলে নিয়েছি। ইচ্ছে করলে সবকিছুই সামলাতে পারে মানুষ।

কিন্তু আমি যদি মেং বা অন্য বৌদের মত হতাম তবে আপনি যা করেছেন সেজন্য এত বেশী উদ্বিগ্ন হতাম না। মা আপনার দোহাই, আপনি কিছুতেই বাবাকে একটা মেয়েমানুষ রাখতে দেবেন না। বূলাং ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ স্বরে বলল।

এটা তাঁকে রাখতে দেবার কথা নয় বৌমা ! এ-পথ তাঁর পক্ষে সবচেয়ে ভাল বলে আমি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বূলাং-এর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আপনি কী করতে যাচ্ছেন তা কি আপনি জানেন ?

আমার ধারনা, যা করছি তা আমি বুঝে সুঝেই করছি।

সবাই আমাদের ঠাট্টা করবে। রক্ষিতা রাখা সেই পুরোনো যুগের প্রথা, বূলাং বলল।

হয়ত সাংহাইর লোকদের চোখে তাই, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বর বূলাংকে জানিয়ে দিল যে সাংহাইর লোকেরা কী ভাবল তাতে কিছুই এসে যায় না।

হতাশায় এবং নিজের একরোখা মনোভাব নিয়ে বূলাং তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। এই মহিলাটি এত ঠাণ্ডা মাথার, এত নিখুঁৎ তাঁর কাজকর্ম যুক্তি-যে রাগ করে তাঁর কাছে পৌঁছনো যায় না। তার নিজের স্বামীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এতই চূড়ান্ত যে সে ভাবে তার মঙ্গলের জন্যই সব কিছু করছে।

এবার সে বলল, মা আপনি কি জানেন যে পুরুষের উপপত্নী রাখাটা এখন কার্যত আইনবিরোধী।

কোন আইনের ? শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

নতুন আইনের। রিভলিউশনারি পার্টির আইনে, চড়া গলায় বূলাং নতুন সংবিধানের কথা বলল।

এই আইনের অস্তিত্ব এখনও কাগজ-পত্রে মাত্র। শ্রীমতী ওয়ায়ু উত্তর দিলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ুব মুখে 'সংবিধান' শব্দটি উচ্চারিত হতে দেখে বূলাং কিছুটা হকচকিয়ে গেল। সে বোধ হয় আশাই করে নি যে তার শাশুড়ি সংবিধান শব্দটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

এই উপপত্নী প্রথার বিলোপসাধন ঘটাবার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সাংহাইর নিদারুণ গরমকালেও আমরা পথে পথে মিছিল করে ঘুরেছি এই কু-প্রথা রদ করাবার জন্য। গরমে ঘামতে ঘামতে হাতে 'উপপত্নীপ্রথা নিপাত যাক' লেখা ব্যানার নিয়ে ঘুরেছি। এখন যখন আমার বাপের বাড়ির কেউ জানবেন যে আমার নিজের শাশুড়িই এই

পুরোনো প্রথা চালু করছেন ! যা এত, এত খারাপ—এটা সত্যিই খারাপ—পুরোনো যুগের হৃদয়হীন প্রথার শিকার হওয়া—

আচ্ছা বাছা, যদি সেমো কোনদিন তোমার চেয়ে কর্মশক্তি ও বুদ্ধিতে কম, কোন কোমল ও আরামদায়ক একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসে তবে তুমি কী করবে ? মধুর যুক্তিপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রশ্ন করলেন

তক্ষুনি ওকে ডিভোর্স করব। সতীনের সঙ্গে স্বামী ভাগ করে নেব না, রূলাং গর্বিত স্বরে জবাব দিল।

ছোট পাইপটা আবার ধরিয়ে নিয়ে বার দু'য়েক টানলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। তারপর বললেন, দ্যাখো বৌমা, পুরুষমানুষের জীবনটা বিচিত্র ! বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তা বুঝতে পারে।

নারী পুরুষের সমানাধিকারে আমি বিশ্বাস করি। রূলাং নিজের মতে অটল থাকল।

আহ ! দুটো সমান জিনিস মানে তো আর দুটো এক জিনিস নয়। তারা গুরুত্বে সমান, জীবনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সমান অপরিহার্য। কিন্তু তারা এক নয়।

আজকাল আমরা তা ভাবি না। যদি একটি পুরুষকে নিয়ে একটি মেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে, তবে একটি নারীকে নিয়ে পুরুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

পাইপটা নাবালেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

তোমার এত অল্প বয়েস বৌমা যে আমি ভেবেই পাচ্ছি না, কীভাবে কথাটা তোমাকে বোঝাব ! দ্যাখো লক্ষ্মী মেয়ে, সন্তোষটা ভারি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—নারীর সন্তোষ, পুরুষের সন্তোষ। আচ্ছা, যদি কোন দম্পতির মধ্যে একজন সন্তোষের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যায় তবে কি সে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ডেকে বলবে যে—ওহে এবার থামো, কারণ আমার পূর্ণ সন্তোষ লাভ হয়ে গেছে ?

লিয়াংমো কিন্তু আমাদের বলেছেন যে বাবা অন্য কোন মেয়েমানুষ রাখতে অনিচ্ছুক, একগুয়ে স্বরে রূলাং বলল।

লিয়াংমো তাহলে আবাব তার বাবার কাছে জানতে গেছে। আহা-বেচারী ! বিনা দোষে জবাবদিহি করতে হচ্ছে তাঁকে। তারপর বললেন, দ্যাখো, চব্বিশ বছর কোন পুরুষের স্ত্রী হিসেবে দাম্পত্য জীবন যাপন করার পর কোন মহিলার সেই জীবন সম্পর্কে আর কিছু জানার থাকে না।

একটা নিঃশ্বাস ফেললেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। একবার ভাবলেন যে বৌমা এবার গেলেই পারে। তবু সাহসে ভর করে তাঁর পুত্রবধূর এই একা আসার জন্য তাকে ভারি ভালও লাগছিল।

তিনি বললেন, বাছা, আমার মনে হয় মোটের ওপর মেয়েদের ওপর ভগবান

সদয় ! আজীবন একনাগাড়ে ঘর আর অাঁতুর ঘর করতে পারে না কেউ। ভগবান তাই অসীম কৃপা করে চল্লিশ বছরে একটা সীমা টেনে দিয়ে বলেছেন, এরপর থেকে তোমার আত্মা শরীর, বাকী জীবনটাই হবে তোমার নিজস্ব। বারবার তুমি তোমার সত্তাকে ভেঙে ভেঙে সন্তানের জন্ম দিয়েছ। এবার থেকে তুমি নিজেকে পূর্ণ বরে গড়ে তোল। যাতে এই জীবনকে তুমি অভিনন্দিত করতে পার—শুধু যা দিয়েছ তার জন্য নয়, যা পেয়েছ তার জন্যও। আমার বাকী জীবনটা আমি আমার মন ও আত্মাকে একত্র সংহত করার কাজেই ব্যয় করবো। আমি সাবধানে আমার এই শরীরটার খুব যত্ন নেব। পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টি আহরণ করার জন্য নয়, কারণ এ-দেহে আমার আত্মার নিবাস; আমি এর ওপর নির্ভরশীল এই জন্য।

আপনি কি আমাদের সবাইকে ঘেন্না করেন? চোখ ডাগব করে বৃলাং জিজ্ঞেস করল। শ্রীমতী ওয়ায়ুর এই প্রথম মনে হল ওর চোখ দুটি ভারি সুন্দর।

তোমাদের সবাইকে আমি আগের চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসি।

বাবাকেও? বৃলাং আবার জিজ্ঞেস করল।

তাঁকেও। না হলে, তাঁর সুখবিধান করার জন্য কেন এত ব্যাকুল হয়ে পড়ব?

আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না, বৃলাং বলল।

আহ্ কত ছোট তুমি আমার চেয়ে! আমি কী চাই তা জানার জন্য একটু ধৈর্য ধরে দেখোই না লক্ষ্মী মেয়ে।

যা করতে চান তা-ই করতে যাচ্ছেন কি? সন্দিগ্ধভাবে বৃলাং প্রশ্ন করল।

ঠিক তাই করতেই যাচ্ছি মা। স্নেহেব সুরে বললেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

ইতস্তত করে বৃলাং বলল, যদি আপনি সুনিশ্চিত হয়েই—

সুনিশ্চিত হয়েই করছি। শ্রীমতী ওয়ায়ু উত্তর দিলেন।

বৃলাং চলে গেলে ঘরে আবার নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দ ফিরে এল। মনটা খুশি লাগছিল তাঁর। নিজের জন্য কিছু করলেন তিনি আজ। ইং আসতে এখনও দেরী আছে। দু-ঘণ্টা আগেই তিনি শুতে যাচ্ছেন আজ। আর অপেক্ষা না করে তিনি নিজেই চান সেরে নিলেন। তারপর রাত্রিবাস পরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

ইং যখন এল তখন তিনি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ইং এদিক-ওদিক দেখে বিছানার কাছে গিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ুর তম্বী-সুবাস অবয়বকে এলিয়ে থাকতে দেখল। হেই মা, বৌদি মরে গেল নাকি!

মাঝরাতে লিয়াংমোর মহলে বড়-মেজ দুই ভাই সস্ত্রীক আলোচনা করছিল। ভাইরা বেশী কথা বলছিল না। বাবার জন্য তারা বিড়ম্বিত ও লজ্জিত

মধ্যবয়েসে পৌঁছে তারাও কি [redacted] বষয়ে তারা নিঃসন্দেহ হতে পারছিল না। সেই সন্দেহ অবশ্য প্রকাশ করছিল না। দুই বৌর মধ্যে মেং খুব ঠাণ্ডা। কথাবার্তা কম বলে। নিজের স্বামী ও জীবন নিয়ে সে সম্পূর্ণ সুখী। কারো সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ নেই। লিয়াংমোর সবটুকুই তার মনের মতন। তারুণ্যমণ্ডিত অবয়ব। সুন্দর স্বভাব! হেসে-ওঠা নিবিড় চুম্বন! ঘন কৃষ্ণভ্রমর চুল। বাহু দৃঢ় অথচ নরম বেষ্টনী। এইসব তাকে পুলকিত করে রাখত। কোন দোষ তার চোখে পড়েনি মেং-এর। সে তার মধ্যে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। নিজের আলাদা কোন সত্তা সে চায় নি। তার অধিকারে নিজেকে সংপে দেওয়া, রাত্রে তার বাহুপাশে শুয়ে থাকা, দিনে তার সেবা করা, নিজে তার খাবার নিয়ে আসা, চা ঢেলে দেওয়া, তার পাইপ ধরিয়ে দেওয়া, তার প্রত্যেকটি কথা শোনা, সামান্য মাথা ধরলেও মাথা টিপে দেওয়া, আগেভাগে রান্নার বা মদের স্বাদ পরখ করে দেখা, এ-সবই ছিল তার অষ্টপ্রহরের কাজ ও গভীরতম আনন্দ। সব আগে তার সন্তানদের জন্ম দেওয়া—তাকে অনেক অনেক সন্তান উপহার দেওয়া ছিল তার একমাত্র বাসনা। সে যে তার স্বামীর অমরত্বের তোরণদ্বার।

মেং-এর সমগ্র সত্তায় মিশে আছে স্বামী। শ্বশুরমশাই উপপত্নী রাখবেন, এতে মেং-এর চোখে লিয়াংমোর চরিত্র ও বিশ্বস্ততা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যখন রূলাং কথা বলছিল, মেং মন দিয়ে শুনছিল কিন্তু যখনই তার মতামত চাইছিল তখনই সে লিয়াংমোর দিকে তাকিয়ে নিজের মতামত কী হওয়া উচিত জানবার চেষ্টা করছিল।

রূলাং এটা জানত এবং নিজের কোন পৃথক সত্তা নেই বলে বড় জার ওপর বিরক্ত হত। সে-ও তার স্বামীকে ভালবাসে। সে-কথা অনেকবার নির্জনে সেমোকে জানিয়েছেও। বড় ছেলে লিয়াংমোর চেয়ে সেমো বেশি শক্তিশালী, বেশী সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন, ক্ষিপ্র এবং স্পষ্টবাদী। অনেক সময় ঝগড়া হত স্বামী-স্ত্রীতে তবু সেমোকে সে ভালবাসত।

প্রত্যেকবার ঝগড়ার পরে তার তীব্র অনুতাপ হত। কারণ সেমোর চেয়ে বয়েসে সে বড় এবং সেই আগে সেমোর প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু এ-সবের জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করেছিল। কারণ নারী-পুরুষের সমানাধিকারে সে বিশ্বাসী। তবু সে জানত যে, সেমো তার চেয়ে ছোট। সে-ই তার জীবনে প্রথম নারী। তার প্রেমের উচ্ছ্বাসের চাপে পড়েই সে তাকে মেনে নিয়েছিল। নিজের সমগ্র গভীর সত্তা থেকে মেনে নেয় নি। একদিন চড়া গলায় সেমোকে বলেছিল, তুমি তোমার পুরোনোপন্থী মাকে ভয় কর।

বেশ ভেবে সে উত্তর দিয়েছিল, তাঁকে ভয় পাই কারণ তিনি সবসময় নির্ভুল।

কেউই সবসময় নির্ভুল হতে পারে না। বূলাং ঘোষণা করল।

আমার মাকে তুমি জান না। তাঁকে খারাপও যদি ভাবি, তবু আমি জানি যে তিনি নির্ভুল। তিনি এই জগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমতী নারী। হেসে উত্তর দিয়েছিল সেমো। সে জানত না তার এই নীরিহ উক্তিটি একটা ছোরার মত বিদ্ধ হয়েছিল বূলাং-এর হৃদয়ে। সেটা বেঁধানো থেকেই গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে আসার পর থেকেই শাশুড়ির ওপর তার হিংসে। প্রত্যুত্তরে রাগ বা হিংসা না দেখে আরও রেগে যেত মনে মনে। সে দেখল শ্রীমতী ওয়ায়ু ক্রোধে বিগতস্পৃহা, ঘৃনাতেও অনীহা। একবার বূলাং বলেছিল, তুমি তোমার মাকে এত ভালবাস কেন ? তিনিতো তোমাকে তত ভালবাসেন না।

বেশী ভালবাসা পেতে আমি চাই না। সেমো উত্তর দিল।

তবে কি আমি তোমাকে খুব বেশী ভালবাসি এ-কথাই বলছ ?

কোন উত্তর দেয় নি সেমো।

মাঝে মাঝে সে জিজ্ঞেস করত, বল না কী ভাবছ তুমি !

কখনও সেমো উত্তর দিত. কখন দিত না। কখনও বলত আমাকে ব্যক্তিগত নিজস্বতা কিছু পেতে দিও।

আমাকে তুমি ভালবাস না ?

ভালবাসি না কি ? সে উত্তর দিত।

বূলাং-এর সব স্বপ্ন এখন মৃত। এ-বাড়ি তার কাছে একটা কয়েদখানা। সে নিজে ছাড়া কেই বা তার প্রহরী হবে ?

এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্য সে গোপন করে রাখত নিজেকে। কিন্তু সব কিছু গোপন করতে পারত না। মেজাজ প্রায়ই বিগড়াত। ঝি-চাকরদের বকত। ফলে তারা আড়ালে রান্নাঘরে গিয়ে ঠাট্টা করত ! এসব আবার ঘুরে তার কানে পৌঁছত। এতে আরও খিটখিটে হয়ে উঠেছিল বূলাং। সে অনুযোগ করত, এই বিরাট বাড়িতে কে তার কথা শুনবে ? তাছাড়া এখনও ছেলেপুলে হয় নি তার।

কাজেই শ্বশুর সম্পর্কে তার অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি শুনে সেমো শান্ত হয়ে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বলল, বেচারী পিতৃদেব ! তোমার কথা অনুযায়ী তাঁকেই করুণা করা উচিৎ। নবাগতাকে আমরা আসতে যেতে শুধু চোখের দেখা দেখব কিন্তু সে হবে তাঁর দিন-রাত্রির ভার। নাও ওঠো তো দেখি এবার। এখন মাঝরাত। শুতে যাও আমাকেও বিশ্রাম দাও।

উঠে নিজের চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বূলাং-এর দিকে তাকিয়ে সে শিস দিয়ে বেরিয়ে গেল। এখন তাকে অনুসরণ করে নিজের মহলে যাওয়া ছাড়া বূলাং-এর কোন গতি রইল না!

সারারাত ঘুমিয়ে ভোরবেলা উঠলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

বরাবরই তাঁর জীবনে একটা আশীর্বাদ। ঘুমের পর অন্ধকার সমুদ্রে জ্যোৎস্না-রেখার মত তাঁর ভবিষ্যতের পথ যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে! যে পথ তাঁর অভিষ্ট পথ। আজও তিনি সে-পথ দেখতে পেলেন।

এখুনি মেয়েমানুষটিকে বেছে নিতে হবে মনে মনে বললেন তিনি।

বাড়ির সবাইর প্রতীক্ষার পালা শেষ না হলে তারা স্বস্তি পাবে না। আজকেই ঘটকীকে ডেকে পাঠাতে হবে। জানতে হবে গ্রামের দিককার কোন্ পাত্রী উপযুক্ত হতে পারে। নিজের, চেনা-জানা কয়েকজনের কথা মনে পড়ল কিন্তু তাদের বাতিল করে দিলেন। তারা কেউই পছন্দসই নয়। হয় তারা উঁচু, নয়ত নীচু। বড়লোকের মেয়ে যারা অহঙ্কারী, তারা, গণ্ডগোল পাকাবে অথবা বিদেশী প্রথায় শিক্ষিতা যে—তাঁকেই উৎখাৎ করে দিতে পারে। নয়ত গরীব ঘরের মেয়ে, তাদের ওই একই ধারা। না, মাঝারি গোছের একটি মেয়েকে বেছে আনতে হবে। যদি একেবারে অচেনা হয় তাই ভাল। সে তার মূলসুদ্ধু এনে এ-বাড়িতে নতুন করে শুরু করবে।

ইং চা নিয়ে ঢুকল। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাকে বললেন, আমার জলখাবার খাওয়া হলেই আমি লিউ মা বলে বুড়ী ঘটকীর সঙ্গে কথা বলব।

ঠিক আছে বৌদি, বিষণ্ণ স্বরে ইং বলল।

নীরবে সে শ্রীমতী ওয়ায়ুকে পোষাক পরতে সাহায্য করল। তারপর সে তাঁর কোমল মসৃন চুল আঁচড়ে দিল। শেষে প্রাতরাশ নিয়ে এল। এ-সময় কেউ কোন কথা বলল না। পোষাক পরে, খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেবেন এমন সময় ইং লিউ মাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কেন তাকে ডাকা হয়েছে লিউ মা জানত। সব বড় বড় পরিবারে তার চর আছে। পয়সা খেয়ে তারা খবর দেয় কখন কোন বাড়িতে কর্তা-গিন্নির মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না। নারী-পুরুষের মিলন ঘটাবার বিষয়ে তার থ্যাবড়া নাকে ছিল আশ্চর্য ঘ্রাণশক্তি। ব্লাডহাউণ্ড যেমন শিকারের গন্ধ পায় সেরকম তীব্র তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়। সে খবর পেয়ে গিয়েছিল যে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর জন্য একটি উপপত্নী রাখা হবে। শ্রীমতী ওয়ায়ুকে সে জানাল না যে সেরকম কোন খবর সে জানে। বরং এমন ভনিতা করল যেন শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর সেজ

ছেলে ফেংমোর জন্য পাত্রীর খোঁজার ব্যাপারে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে শ্রীমতী ওয়ায়ুরও বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি নিশ্চিত জানতেন যে ঝি-চাকর মহল থেকে তাকে ডেকে পাঠানোর কারণটা এই বুড়ী ঠিকই জেনেছে।

লিউ মা মর্যাদায় খাটো বলে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তাকে অভ্যর্থনা করলেন না। তাকে বসতে বললেন এবং ইংকে তার জন্য চা আনতে বললেন।

চা দেওয়া হলে বুড়ী বেশ শব্দ করে চায়ে চুমুক দিল। এ-মহলে কেন শ্রীমতী ওয়ায়ু থাকছেন সে নিয়ে কোন কথা বল্ল না সে। এর পরিবর্তে সে তার ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, আগের চেয়ে ঠাকবুণের রূপলাবণ্য যেন এখন অনেক বেশী। ঠাকবুণের কত্তার অনেক ভাগ্যি। সে মনে করল এ-ভাবে উপস্থাপিত করলেই, উপপত্নী রাখার বিষয়টা এসে পড়বে। ভেবেছিল যে এ-কথা শুনে শ্রীমতী ওয়ায়ু একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করবেন এবং বলবেন এ-রূপ দিয়েও তিনি স্বামীকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। শ্রীমতী ওয়ায়ু কিন্তু শুনে তাকে শুধু ধন্যবাদ জানালেন!

সে আবার শুরু করল আমি ভাবলাম যে ঠাকবুণ তাঁর সেজছেলের জন্য মেয়ে দেখতে চান তাই সঙ্গে করে কয়েকটা ছবি এনেছি।

নীল গেরোয় বাঁধা একটা প্যাকেট তার হাঁটুর ওপর। সে সেটা খুলল। ভেতরে একটা সচিত্র বিদেশী মাসিকপত্র। চলচ্চিত্রাভিনেত্রীদের ছবি ছিল তাতে। পত্রিকাটি খুলে সে কয়েকটা ছবি বের করল।

আমার হাতে এখন তিনটি পাত্রীর ছবি আছে। চমৎকার মেয়ে সব।

মোটে তিনটে? হেসে মৃদুস্বরে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

এই বুড়ী ঘটকীর রকম সকম হাসির উদ্রেক করল। এর পন্য ছিল নর-নারীর মধ্যেকার কামনা-বাসনা এবং এত সাবলীল ভঙ্গীতে সে এটা বিনিময় করত যেন সে চাল বা ডিম বা বাঁধাকপি বেচতে এসেছে।

আমি মোটেই বলছি না যে এই তিনটি পাত্রীই শুধু আছে। হাতে আমার ঢের ঢের মেয়ে আছে। তবে কি ঠাকবুণ এরা একেবারে ছেঁকে-তোলা জিনিস। এই মেয়ে তিনটির বংশ ভাল; দেবে-থোবে ভাল।

দেখি ওই পত্রিকাটা দেখি, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। এখন সেই চরম মুহূর্ত সমাগত। তাঁর জায়গায় যে-মেয়েটি আসবে তাকে বেছে নিতে হবে।

এ-বইর কোন মেয়েই আমার খদ্দের না ঠাকবুণ, এ-সব মার্কিন মুলুকের বিজলীতে তোলা ছায়াছবি।

জানি। আমি শুধু দেখতে চাই বিদেশীরা মেয়েদের মধ্যে কীভাবে সৌন্দর্য দেখে। তিনি পত্রিকাটির পাতা ওলটাতে লাগলেন। পাতা লালচে হয়ে

এসেছে কিন্তু ভাঁজ পড়ে নি। বিদেশী ভাষা পড়তে তাদের কেউই জানতেন না। তাই অভিনেত্রীদের নামগুলি তাদের অজানা থেকে গেল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন এদের সবাইকে একরকম দেখতে। তবে বিদেশীদের সবাইকে একরকম দেখতে লাগে অবশ্য।

আরও দু'চারটি কথার পর পত্রিকাটি বন্ধ করে ছবি তিনটি দেখতে চাইলেন। ছবি তিনটি হাতে নিলেন বুড়ীর ছোঁয়া বাঁচিয়ে। তিন জনকেই দেখতে দেখছি একরকম। তিনি আপত্তি জানালেন।

তা ঠাকরুণ, জোয়ান মেয়েদের তো একরকম দেখতেই হয়। ছলছলে চোখ, চকচকে চুল, ছোট ছোট নাক, লাল টুকটুকে ঠোঁট—আর কাপড় খুলে নিলে একটা মেয়ের সঙ্গে আরেকটা মেয়ের তফাৎ কী থাকে বলুন দেখি? গোলগাল বেঁটে খাটো ঘটকী হেসে উঠল। তার ভারি পেট কাঁপতে লাগল হাসির দমকে। সে আবার বলল, তবে কী জানেন মা ঠাকরুণ, পুরুষ মানুষের কাছে এসব আমরা বলি নাকো। তাইলে ব্যবসা লাটে উঠবে।

ছবিগুলি টেবিলের ওপর রেখে তিনি বললেন, এমন কোন মেয়ে তোমার জানা আছে বুড়ী যারা অনেক দূরে থাকে?

ঠিক কী চান খুলে বলুন দিকি মা ঠাকরুণ।

আমি যাকে খুঁজছি তার একটা ধারণা আমি দিতে পারি। ইতঃস্তত করে তিনি বললেন।

তাইলে মা ঠাকুরুণ ধরেই নিন যে তাকে পাওয়া গেছে।

এই বেশ, অল্পবয়েসী হবে, আবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। আত্মীয় পরিজনদের সামনে এ-বিষয়ে কথা বলতে তাঁর বাঁধে নি কিন্তু এই ধুরন্ধর বুড়ী ঘটকীর ঝানু দৃষ্টির সামনে, তিনি জানতেন যে, তিনি কিছু লুকোতে পারবেন না।

লিউ মা তার কুদে কুদে চোখের নজর তার ওপর রেখে অপেক্ষা করছিল। তিনি প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন, ভাল দেখতে হবে, বেশ ভাল দেখতে হবে, কিন্তু সুন্দরী হবে না। একটি মেয়ে…একটি নারী,…এই বছর বাইশেক বয়স হবে…গোলগাল পুরন্ত গাল…কচি বাচ্চার মত নরম…সবাইকে ভালটাল বাসবে, শুধু একজন পুরুষের ওপরই কেন্দ্রীভূত হবে না তার ভালবাসা…এমন কেউ যে খুব গভীরভাবে কোন পুরুষকে ভালবাসতে পারে না…একটা নতুন কোট বা মিষ্টি খাবার হাতে পেলেই কোন ঝঞ্জাট বেমালুম ভুলে যেতে পারে… অবশ্যই বাচ্চাকাচ্চাদের ভালবাসে…ঠাণ্ডা মেজাজের…যার বাড়ি অনেক দূরে, যাতে ঘনঘন বাড়ি যাবার জন্য কান্নাকাটি না করে…এই, এইরকমের আর কি…। একেবারে ঠিক এরকম একটি মেয়ে আছে আমার

হাতে, উল্লাসিত হয়ে লিউ মা বলল। তবে আহা, মেয়েটি একেবারে অনাথ। মা বাপের নাম জানে না এমন মেয়ের সঙ্গে কি আপনি ছেলের বিয়ে দিতে পারেন! বংশে বাজে রক্ত ঢ্ুকবে তবে। গম্ভীর হয়ে গিয়ে লিউ মা বলল।

বাইরের চত্বর থেকে চোখ তুলে লিউ মার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। আমি ফেংমোর জন্য মেয়ে খুঁজছি না, শান্ত স্বরে তিনি বললেন। তারজন্য আমার অন্যরকম ইচ্ছে আছে। না, এই মেয়েটি চাইছি আমার কর্তার জন্য, তাঁর বিয়ে-না-করা-বৌ হিসেবে থাকবে সে।

লিউ মা চোখেমুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলল। পুরু ঠোঁট চেপে ধরে, হায়—হায়! শেষপর্যন্ত কিনা তিনি, হায়!

মাথা নেড়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, তাঁর ওপর অবিচার কোর না। তাঁর কোনই ইচ্ছে ছিল না। এটা আমারই কথা। আমি চাপ দিয়ে করাচ্ছি।

এক্ষেত্রে, সে খুশি হয়ে বলল, বোধহয় এই অনাথ মেয়েটিই খুব যুগ্যি হবে তাইলে। বেশ শক্তি আছে, কাজের।

নিজের জন্য আমি চাকর চাইছি না। বাড়িতে যথেষ্ট চাকর-চাকরানী আছে। সে ঝি নয়। আমি শুধু বলচি কি যে, সে বেশ বাধ্য, নরম ভদ্দর, ভয় পেয়ে লিউমা তাড়াতাড়ি বলল।

কিন্তু সে যেন বেশ প্রাণবন্ত স্বাস্থ্যবতী হয়।

সে ঠিক তেমনি মাঠাকরুণ। আসলে বেশ ভাল দেখতে। আর যদি বেচারা অনাথ না হত, তবে কবে তার বর জুটিয়ে দিতাম। আপনাকে আর কী বলব, ভাল ভাল পরিবারে এইসব অনাথ মেয়েকে কেউ নিতে চায় না। রক্তের একটা দাম আছে তো। তবু বলতে পারি হীনজাতের মানুষ নয় সে। তা সবই ভগবানের ইচ্ছে। নইলে যখন ও এত ভরন্ত হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই আপনি ওর মত মেয়ে খুঁজবেন কেন?

ওর কোন ছবি আছে? শ্রীমতী ওয়ায়ু জানতে চাইলেন।

হায়, না, না। ওর ছবি তোলার কথা কখনো ভাবি নি। মেয়েটার একটাই দোষ। খুব সরল আর একেবারে সাদামাটা। কিচ্ছুটি জানে না। পড়তে পর্যন্ত জানে না।

পড়তে না জানলে কিছু আটকাবে না।

তাইলে মা ঠাকরুণ, কথা একরকম হয়েই গেল। যক্ষুণি বলবেন, তক্ষুণি এনে হাজির করে দেব ছুঁড়িকে। ওকে যে পেলেছে সেই মার সঙ্গেই গেরামের খামারে থাকে ও

কে ওকে পেলেছে?

সে এমন কিছু না। ভাইর জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পথে দেয়ালের ধারে ন্যাতায় মোড়া এই বাচ্চাটাকে বুড়ী দেখে তুলে নিয়ে বড় করে তোলে। একটা দোকান আছে বুড়ীর। সে যাকগে, সে-সব আবাস্তোর কতা। একটা ছেলে ছিল বুড়ীর। ভাবল মেয়েটাকে নিয়ে যাই। বড় হলে ছেলের সঙ্গে বে দেব। তাইলে খরচাপাতি লাগবে নাকো। তা সবই ভগবানের ইচ্ছে। জোয়ান ছেলে কিনা পেলেগে মরে গেল। এখন মেয়েও সোমত্ত হয়েছে, ওদিকে বরও জুটচে না।

পালিত মেয়েকে সে একেবারে দিয়ে দেবে তো ?

তা দেবে বই কী ! বড্ড গরীব ওরা। আর নিজের পেটের ছাওয়াল তো নয়। ওর জন্য কত দেবেন মা ঠাকরুণ ?

ওকে সাজিয়ে নিতে হবে। চিন্তিত ভাবে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

ওর মা ওসব বোঝে না, সে চায় মোটা চাঁদি।

গাঁয়ের মেয়ের জন্য একশ ডলার নিশ্চয় খুব কম হবে না। তবে আমি তার চেয়ে বেশীই দেব। আমি দু'শ দেব।

আরও পঞ্চাশ বাড়ান মা ঠাকরুণ। তবে ওর মার হাতে পুরো দু'শ ধরে দিয়ে আজই মেয়েটাকে জোগাড় করে আনতে পারি।

বেশ, তাই হবে।

হ্যাঁ মা ঠাকরুণ, আপনি হলেন গিয়ে বিচক্ষণ মানুষ। আচ্ছা আরেকটা কতা বলি ! মা ঠাকরুণ, হ্যাঁ, আপনার সেজছেলের জন্যও একটি ভাল মেয়ে কি লাগবে না ? তাহলে দুটি মেয়ের জন্যই আগাম কিছু দিলে, দেখাশোনা করতে পারতাম আর কি।

না। ফেংমো এখনও অপেক্ষা করতে পারে। এখনও বাচ্চা ও। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। তা মা ঠাকরুণ যথাযথ বলচেন। বড়দেরই তর সয় না। বড়দেরই আগে দিতে হবে। যতাত্তো কাজ মা ঠাকরুণ। মন বোঝেন আপনি ভাল। লাভ করার আনন্দে ঘটকী তাঁর সব কথাই সমর্থন করল।

পত্রিকাসহ ছবিগুলি নীল গেরোয় বাঁধতে বাঁধতে ঘটকী বলল, মেয়েটাকে কি এক্ষুণি নে আসব ?

আজ বিকেলে গোধূলির সময় নিয়ে এস।

বাঃ বেশ ! কনে-দেখার ঐ সময়টাই হল সবচেয়ে ভাল সময়, ঘটকী বলল। ওকে বলে দিও, বাক্স-প্যাঁটরা কিছুই না নিয়ে একেবারে খালি হাতে যেন আসে। শুধু একবস্ত্রে চলে আসবে।

নিশ্চয় বলব মা ঠাকরুণ। বলে লিউ মা, বিশ্রী কদাকার পা দ্রুত চালিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ইং ঢুকল। দু'জনের মধ্যে কোন কথা হল

না। ইং গম্ভীর মুখে টেবিল পরিষ্কার করে চলে যাচ্ছিল, শ্রীমতী ওয়ায়ু তাকে ডেকে বললেন, আজ গোধূলির সময় ফটকে একটি মেয়ে আসবে, ওকে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবি। আর এ-ঘরে ওর জন্য ছোট একটা বাঁশের খাট পেতে দিবি।

হাতে উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ইং শুনল, তারপর প্রায় কান্না-জড়ানো গলায় কোনরকমে ঠিক আছে বলেই বেরিয়ে গেল।

দিন অবসান হয়ে এল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেকের জন্য একটু শুয়ে নেওয়া শ্রীমতী ওয়ায়ুর বরাবরের অভ্যেস। আজ তাঁর ঘুম আসছিল না, বিশ্রাম নিতেও পারছিলেন না। কেমন একটা অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

ইংকে বললেন, আজ আর শোব না রে। দেখি, বই-টই পড়ি। তুই যা।

যা বলবে, বলে ইং চলে গেল।

লাইব্রেরীর দিকে এগিয়ে গেলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

তাঁর মনে পড়ল একদা তাঁর শ্বশুর মশাই নিজেই তাকে বইগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি নীল কাপড়ে বাঁধা নিষিদ্ধ বইগুলি পর্যন্ত তিনি পড়তে শুরু করলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল। তারপর এক সময় বই বন্ধ করে রাখলেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। নাঃ বইগুলিতে তেমন কিছু নেই।

ইং ঘরে ঢুকল। শ্রীমতী ওয়ায়ুর সামনে গিয়ে বলল, লিউ বুড়ী একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে তিনি ইংকে বললেন, মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দে আর ওকে একা নিয়ে আয় এখানে। বুড়ীর সঙ্গে দেখা করব না।

একটু পরেই মেয়েটিকে নিয়ে ইং ঘরে ঢুকল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু মেয়েটির দিকে তাকালেন।

মোমবাতির নরম আলো তার সর্বাঙ্গে। স্বাস্থ্যবতী। লাল কপোল। মেয়েটি কুচকুচে কালো ডাগর চোখ তুলে তাঁকে দেখল। তার কালো চুল ঘাড়ের কাছে খোঁপা-বাঁধা, কয়েকগুচ্ছ চুল কপালের ওপর পড়েছে।

তোমার হাতে কী? আমি তো ওদের বলে দিয়েছিলাম, খালিহাতে যেন তোমাকে পাঠানো হয়। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

আমি আপনার জন্য কিছু ডিম নিয়ে এলাম। আমার মনে হল, আপনি এগুলি পছন্দ করবেন। আমার আর কিছু ছিল না। খুব টাটকা ডিম।

চমৎকার গলা মেয়েটির! বেশ প্রাণবন্ত! তবে সামান্য কুণ্ঠিত।

দেখি এদিকে এস। ডিমগুলি দেখি।

পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে, কিছুটা ভয় ভয় ভাবে এগিয়ে এল মেয়েটি। শ্রীমতী ওয়ায়ু তার পায়ের দিকে তাকালেন। তোমার পা দেখছি বাঁধা হয় নি।

মেয়েটি লজ্জা পেল। বেঁধে দেওয়ার মত কেউ ছিল না। তাছাড়া আমি সবসময় ক্ষেত-খামারে কাজ করি।

মস্ত বড় পা ওর বৌদি। গাঁয়ের বাচ্চাদের মত ও খালি পায়েই চলাফেরা করেছে আর ওর পাও কেটে গেছে।

মেয়েটি উদ্বিগ্ন মুখে ইং-এর মুখ থেকে শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখে চোখ সরিয়ে এনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কী ডিম এনেছ দেখি, শ্রীমতী ওয়ায়ু তাকে আবার প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি এগিয়ে এসে যত্ন করে রুমাল দিয়ে বাঁধা পুটুলিটা টেবিলের ওপর রেখে, খুলে প্রতিটি ডিম পরীক্ষা করে বলল, একটা ডিমও ভাঙে নি। পথে আমার ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে ডিমগুলি ভেঙে ফেলব! এখানে সবসুদ্ধু পনেরটা ডিম আছে—

সে আচমকা থামল। শ্রীমতী ওয়ায়ু বুঝলেন, তাঁকে কী বলে ডাকবে তা ঠাহর করতে পারছে না মেয়েটি।

তুমি আমাকে দিদি বলে ডেকো।

দেখা গেল মেয়েটি সেরকম সম্বোধন করতেও সঙ্কুচিত হচ্ছে। সে আবার বলল, পনেরটা ডিম আছে, একটাও সাত দিনের বেশী বাসী নয়। আপনি এগুলি খাবেন।

ধন্যবাদ! বেশ তাজা দেখতে লাগছে কিন্তু।

মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি তার সম্বন্ধে কতগুলি জিনিষ লক্ষ্য করলেন। তার শ্বাস-প্রশ্বাস মিষ্টি ও পরিচ্ছন্ন। তার গা থেকে স্বাস্থ্যের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছিল। দাঁতগুলি পরিপাটি সাদা। যে-হাত দিয়ে সে পুঁটুলিটা খুলল, সে হাত দুটি বাদামী এবং মোলায়েম না হলেও গড়ন ভাল। জলকাচা করা নীল সূতির কোটের মধ্যে তার দেহটি নিটোল ও নির্মেদ। ঘাড় মসৃন এবং তার মুখ সরল-সুন্দর।

তার কথা শুনে শ্রীমতী ওয়ায়ু না হেসে পারলেন না। তিনি বললেন, তুমি কি এখানে থাকতে চাও? এই নিরীহ প্রাণীটি, যাকে তিনি কোন চাষীর কাছ থেকে কিনেছেন, তার জন্য তাঁর মায়া হল। ওর রোদে-পোড়া গাল আর মামুলী পোষাকের মধ্যেও তিনি কিন্তু সূক্ষ্ম সৎ উপাদান আবিষ্কার করলেন।

মেয়েটি বোধহয় তাঁর এই মমতা উপলব্ধি করেছিল। তার পরিষ্কার চোখে ভক্তি ফুটে উঠল। সে বলল, লিউ মা আমাকে বলে দিয়েছে যে, আপনি খুব ভাল। অন্য সব গিন্নীদের মত নন। সে আমাকে বলেছে সবচেয়ে আগে আপনাকে খুসি রাখতে। আমি তা-ই করব। তাব সতেজ গলায় আন্তরিক ব্যাকুলতার সুর বেজে উঠল।

তবে তোমার জীবন সম্পর্কে যা-যা মনে আছে সব আমাকে বলো। কিছু গোপন করবে না। যদি সৎভাবে অকপটে সব খুলে বলো তবে তোমাকে আমি খুব পছন্দ করব। তিনি মেয়েটির ভক্তির ভাব অনুভব করলেন। সেইসঙ্গে অবাক হয়ে দেখলেন, অপরাধবোধের যন্ত্রণার মত কিছু একটা অনির্দিষ্ট যন্ত্রণা তঁাকে যেন অধিকার করল।

আমি আপনাকে সব বলব কিন্তু তার আগে ডিমগুলি রান্নাঘরে রেখে আসি গিযে।

না। ইং ওগুলি নিযে যাবে। তুমি এখন আমার মুখোমুখি এই চেয়ারটাতে বসো, আমরা কথা বলব।

ডিমগুলি আবার বেঁধে সে অস্বস্তি নিয়ে চেয়ায়ের এক কোণে সন্তর্পণে বসল। তাকে দেখে মনে হল তার কোন কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন, ক্ষিদে পেয়েছে তোমার ?

না, ধন্যবাদ !! সাবধানে উত্তর দিল মেয়েটি।

আচ্ছা, তোমাকে সৎভাবে কথা বলতে বলেচি, তোমার কি সত্যিই ক্ষিদে পায় নি ? শ্রীমতী ওয়ায়ু আবার প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি কমলে বলল, আমি বড্ড বোকা, ভদ্রতা করেও মিছে কথা বলতে পারি না। যাতে প্রথম কথাবার্তার সময়ই আমাকে হ্যাংলা বলে না ভাবেন সেজন্য লিউ মা আমাকে বলে দিয়েছিল। ক্ষিদে পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে যেন আমি আপনাকে 'না ধন্যবাদ' বলি।

এখানে আসার আগে রাত্রির খাওয়া খেয়ে আস নি ?

মেয়েটি লজ্জায় রক্তিম হয়ে বলল, ঘরে বেশী খাবার-দাবার থাকে না আমাদের। আমার ধাই-মা বলল—আমার ধাই-মা ভেবেছিল—

তাকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু ডাকলেন, ইং—ওর জন্য খাবার নিয়ে আয়। মেয়েটি ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বসে রইল। তার শরীর শিথিল হল। সে এভাবে মুখ ঘুরিয়ে রইল যে শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখোমুখি হতে পারে। শ্রীমতী ওয়ায়ু ওকে দেখছিলেন।

যদি ওর কোন ত্রুটি থেকে থাকে তবে বলতে হবে যে ওর শরীরের খাঁচাটা

লম্বায় বেশ একটু বড়। এর অর্থ, তার দেহে উত্তর অঞ্চলের লোকের রক্ত আছে। এমন হতে পারে যে তাদের পরিবার কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হয়ত পীত নদীর বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষের জন্য উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল দেশ ছেড়ে এবং তাদের শিশুকন্যাটিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

লিউ মা আমাকে বলেছিল, তুমি নাকি অনাথ; তোমার নিজের পরিবার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারো?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। যখন আমাকে তারা ফেলে যান, তখন আমি সবে হয়েছি। যেখানটায় তারা আমাকে ফেলে যান সে জায়গাটা আমি চিনি কারণ ধাই-মা আমাকে অনেকবার জায়গাটা দেখিয়েছে! তবে ধাই-মা বলেছে যে আমার সঙ্গে আর কোন চিহ্ন ছিল না কিন্তু কাপড়ের ন্যাকড়ার বদলে আমাকে নাকি রেশমী কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

সেই রেশমী কাপড়টা এনেছ?

কী করে বুঝলেন? সরল বিস্ময়ের সঙ্গে সে প্রশ্ন করল।

আমার মনে হচ্ছে যা তোমার একমাত্র নিজস্ব জিনিস, তা তুমি কাছ ছাড়া করতে চাও না, হেসে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

যাকে আপনি একদম চেনেন না, তার মনের কথা কী করে বুঝলেন?

রেশমী কাপড়টা দেখাও না? নিজের সূক্ষ্ম অনুমানশক্তি সম্পর্কে কোন কথা না তুলে তিনি বললেন।

বুকের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ-করা কাপড়টা বের করে দিল মেয়েটি। পরিষ্কার করে কাচা কোন মহিলার গায়ের কোট। লাল রং থেকে ফিকে হয়ে গোলাপী হয়ে এসেছে। ছোট কোট, চওড়ায় বেশী না কিন্তু হাতাটা লম্বা।

যদি ওর মার গায়ের হয় তবে সে-ও বেশ লম্বা ছিল, তিনি মন্তব্য করলেন।

আপনি সে-কথাও জানেন! মেয়েটি বিস্মিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

খুব সূক্ষ্মকাজ তোলা হয়েছে জামাটায়। ছোট ছোট গুটি পাকিয়ে পিকিং ফোঁড় দিয়ে করেছে কাজটা।

এ-পর্যন্ত যা শুনেছি, তার চেয়ে ঢের বেশী বলে দিলেন আপনি, একদমে বলল মেয়েটি।

এ-ছাড়া আর কিছুই বলতে পারব না, বলে জামাটা ভাঁজ করে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

জামা নিতে হাত বাড়াল না সে, আপনার কাছেই রেখে দিন ওটা। ওটা দিয়ে এখানে কী করব?

এভাবেই এটা রেখে দেব আমার কাছে। যদি পরে ভাব যে তুমি এটা কাছে

রাখবে, তখন তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

অনুনয়ের সুরে মেয়েটি বলল, যদি আমাকে এখানে থাকতে দেন, তবে আর কখনোই এটা চাইব না।

কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ওয়ায়ু বললেন, তোমার নামতো এখনও বললে না? মনঃক্ষুণ্ণ শিশুর গলায় সে বলল, আমার নিজের কোন নাম নেই। ধাই-মাও আমার কোন নাম দেয় নি। তারা লেখা-পড়া জানে না, আমিও জানি না। তারা আমাকে ক্ষুদে অনাথা বলত ছেলেবেলায়। বড় হলে ডাকত বড় অনাথা। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

দু-হাতে খাবারের থালা-বাটি নিয়ে ইং এল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু একবার বাটিদু'টো দেখে নিলেন। ঝি-চাকরদের খাবার নিয়ে এসেছে কিনা ইং! না! ওর বিবেচনা আছে। মাঝারী স্তরের আহার্য এনেছিল সে। একটা বাটিতে মুরগীর ঝোল, থালায় শূয়োরের মাংসে বাঁধাকপি মিশিয়ে রান্না তরকারী, একটা ছোট কাঠের গামলায় ভাত, সঙ্গে এক পট চা ও খাবার কাঠি। কাঠিটা পরিবারের জন্য যা ব্যবহৃত হয় সেরকম রূপোয় মোড়া হাতীর দাঁতের তৈরীও নয় আবার চাকরদের ব্যবহৃত বাঁশের কাঠিও নয়। সেগুলি লাল রং-করা কাঠের তৈরী—বাচ্চারা যা দিয়ে খায়।

ওকে দে, শ্রীমতী ওয়ায়ু ইংকে বললেন।

হ্যাঁ, ওটা কোন নাম নয় আদতে। যাই হক তোমার সঙ্গে আরও পরিচয় হলে আমি তোমার একটা নাম রাখব, মেয়েটিকে তিনি বললেন। একটু ইতস্তত করে ইং ওকে খাবার বেড়ে দিল।

ওকে নিশ্চিন্তে খেতে দেবার জন্য শ্রীমতী ওয়ায়ু একটা অছিলা করে বেরিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে নিজের বসার ঘরে এলেন। বাঁশের খাটে ইং বিছানা পেতে রেখেছিল মেয়েটির জন্য। চিন্তিত দৃষ্টিতে বিছানাটা দেখছিলেন তিনি। কয়েকটা রাত এখানে শোবে মেয়েটি। যতদিন না মেয়েটি এই পরিবারে তার ভূমিকা কী তা বুঝতে পারে! তাঁর ও মেয়েটির মধ্যে একটা গভীর মতৈক্য স্থাপিত হওয়া দরকার।

মেয়েটি খুব সরল। ওর হৃদয় ও স্বভাব সবার কাছেই মেলে ধরতে পারে। বোকা নয়। ওর চোখে বুদ্ধির দীপ্তি রয়েছে। ওর মা কোন ধনী পরিবারের পরিচারিকা ছিল, এমন হওয়াটাও বিচিত্র নয়। সে-বাড়িরই কোন ছেলের কীর্তি এটি। পোষাকটা হয়ত তার মনিবানীর বাতিল-করা পরিচ্ছদের একটি। অথবা চায়ের দোকানে কাজ করে, এমন কোন মেয়ে বাচ্চাটির গায়ে অযাচিত ভাবে জামাটা জড়িয়ে দিয়েছিল।

এই মেয়েটি যে কে তা বলা অসম্ভব, শ্রীমতী ওয়ায়্‌ আপন মনে বললেন। এ-রকম অজ্ঞাত কুলশীল মেয়েকে বাড়িতে রাখতে কি তিনি চাইবেন। একটু পরে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দেখলেন যে মেয়েটি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ভীরু ভীরু চোখে বসে আছে হাঁটুর ওপর হাত রেখে। শ্রীমতী ওয়ায়্‌কে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল আমি এখন কী করব দিদি ?

সুন্দরভাবে 'দিদি' শব্দটি সে উচ্চারণ করল। ওর ডাকে তার সর্বশরীরে উষ্ণতায় ভরে উঠল।

এ-রকম সময়ে তুমি সাধারণত কী কর ?

খাওয়ার পরেই আমি শুয়ে পড়ি। জেগে থাকলে মোমবাতি বাজে খরচা হয়।

শুনে শ্রীমতী ওয়ায়্‌ হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি বরং শুয়েই পড়ো। ও-ঘরে তোমার বিছানা পাতা আছে আর ওই দরজার ওপাশের জায়গাটাতে তুমি জামা-কাপড় পালটে নিতে পারো।

আমার সব ঠিক আছে। এখানে আসার আগে আমি চান করে এসেছি। ওপরের জামা-কাপড় খুলে নিয়ে শুয়ে পড়লেই হবে !

বেশ, কাল সকালবেলা আবার দেখা হবে। শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বললেন।

কাল দেখা হবে। তবে দিদি, রাত্তিরে যদি আপনার কিছু দরকার হয় তবে যেন আমাকে অবশ্যই ডাকবেন।

ডাকব বইকী, শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বেরিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়েও তাঁর চোখে ঘুম এল না।

খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে, মাঝরাত নাগাদ উঠে মোমবাতি নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। মেয়েটি ঘুমিয়ে ছিল। ওষ্ঠাধর বন্ধ, মুখ গোলাপী, সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে অনেক ভাল দেখাচ্ছে। তিনি লক্ষ্য করলেন যে মেয়েটি ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করা বা নাক ডাকে না। কোমর অবধি ছিমছাম ভাবে কম্বল টানা রয়েছে। সে তার সুতীর অন্তর্বাস পরে শুয়ে ছিল। তবে গলার কলারের গেরো ঢিলে করে দিয়েছিল, তাতে তার সগোল ঘাড় ও স্তনের একাংশ দেখা যাচ্ছিল। একটি স্তন শ্রীমতী ওয়ায়্‌ পরিষ্কার দেখতে পেলেন—আটসাঁট তারুণ্যমণ্ডিত ও বর্তুল গঠন।

কোন নড়াচড়া না করে সে গাঢ় ঘুমে নিদ্রিত ছিল। ভালই হবে। বরাবর তাঁর নিজের ঘুম বড় হালকা। শ্রীযুক্ত ওয়ায়্‌ ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরলেও তাঁর ঘুম ভেঙে যেত এবং পরে আর দু-চোখের পাতা এক করতে পারতেন না। সে-জায়গায় এই মেয়েটি অঘোরে ঘুমোতে পারবে। যখন ঘুম থেকে উঠবে, একেবারে তরতাজা হয়ে উঠবে। হাত দিয়ে মোমবাতির আলো আড়াল করে তিনি ওর ঘুমন্ত মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন—নিঃশ্বাসে সুগন্ধ ! আবার সোজা

হয়ে দাঁড়ালেন। এবার নিজের ঘরে ফিরে বাতিটা নিভিয়ে রাখলেন ।

পাশের ঘরের মৃদু শব্দে প্রত্যূষের আগেই তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাঁশের খাটটার শব্দ হল। আরও সব কীসের আওয়াজ পেলেন। তিনি পুরোপুরি জেগে উঠলেন। শুয়ে শুয়ে শব্দটা শুনছিলেন। মেয়েটা কি সাতসকালে উঠে পালিয়ে যাচ্ছে! তিনি উঠে গায়ে একটা জোব্বা চাপিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে এ-ঘরে এলেন। মেয়েটি একটা টুলে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো। তার জামা-কাপড় এমন কি সাদা জুতো মোজা পরা পর্যন্ত শেষ।

কোথায় যাচ্ছ তুমি? শ্রীমতী ওয়ায়্ন জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর গলার শব্দে চমকে উঠল মেয়েটি। হাত থেকে চিরুনীটা পড়ে গেল। কালো চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়ল।

কোথাও যাচ্ছি না। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল।

তাহলে—এখন উঠেছ কেন?

এখনইতো ওঠার সময়। একটা মোরগ ডাকল শুনলাম। বিস্মিত হয়ে মেয়েটি বলল। শীমতী ওয়ায়্ন হঠাৎ জোরে হেসে উঠলেন। আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, তুমি এ-জন্য উঠেছ। তুমি গাঁযের মেয়ে, এখানে কিন্তু তোমার অত তাড়াতাড়ি না উঠলেও চলবে। চাকর-বাকরদেরই উঠতে এখনও একঘণ্টা, তারও একঘণ্টা পরে আমরা উঠি।

আমি কি আবার বিছানায গিয়ে শুয়ে পড়ব? মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

তাছাড়া আর কী করবে!

ঘরগুলি ঝাঁট দিয়ে দেব, কোন শব্দ হবে না। আপনি আবার ঘুমিয়ে পড়ুন গিয়ে, দিদি।

শ্রীমতী ওযায়্ন ঘবে ফিরে এলেন। মেয়েটির ঝাঁট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন শুয়ে শুযে। সে ঘরের মেঝে এবং চত্বরটা পরিষ্কার করতে লাগল। লঘু পদসঞ্চারে সে চলাফেবা কবছিল। তাবপর নিজের অজ্ঞাতেই একসময় শ্রীমত ওয়ায়্ন ঘুমিযে পড়লেন। যখন তাব ঘুম ভাঙল তখন বেলা হযে গেছে। মেঝেব ওপর এক ফালি রৌদ্রের আল্পনা পড়েছে। ইং বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি চটপট পোষাক পত্র পরিধানপর্ব শেষ করলেন। ইং মেয়েটিব কথা তুলল না, তিনিও কিছু বললেন না। এই মহলে নীরবতা বিরাজ করছিল। তিনি কিছু শুনতে পেলেন না। নীরবতা ক্রমশ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল; শ্রীমতী ওয়ায়্ন সেই নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটা কোথায়? সে ওই উঠোনে বইসে সেলাই করতিছে। সে কিছু কাজ কইরতে চাইল, তা আমি তাঁকে বাচ্চাদের কাপড়ের জুতোর সোল সেলাই করতে দিনু। ইংয়ের গলার

প্রচ্ছন্ন বিরূপতা থেকে তিনি অনুমান করলেন যে ভৃত্যদের মত কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে চাওয়ার জন্য মেয়েটি সম্পর্কে ইংয়ের কোন উঁচু ধারনা নেই। শ্রীমতী ওয়ায়ু কিছু বললেন না। ইংযের পছন্দ-অপছন্দ দিয়ে তিনি পরিচালিত হবেন না।

প্রাতরাশ খাওযা হয়ে গেলে তিনি উঠোনে চলে এলেন। মেয়েটি একটা তেপায়া জলচৌকির ওপর বসে ছিল বাঁশগাছের ছায়ায়। জুতোর সোলের পুরু কাপড়ে সূঁচ বসিয়ে সেলাই করে চলছিল সে।

মধ্যম আঙুলে অঙ্গুলিত্রাণ হিসেবে একটা তামার আংটি পরে নিয়েছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ুকে দেখে সে নীরবে উঠে দাঁড়াল।

আরে বোস বোস, বলে শ্রীমতী ওয়ায়ু বাগানের চীনেমাটির বেঞ্চিতে বসলেন। কিন্তু মেয়েটিকে কিছু বলতে যাবার পূর্বে হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর সেজছেলে ফেংমো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তোরণের পাল্লার একটা দিকে হাত রেখে সে মেয়েটির দিকে তাকিযে দেখছিল।

এখানে কী চাস ফেংমো? শ্রীমতী ওযায়ু জিজ্ঞেস করলেন। এরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়াব জন্য তিনি খুব রুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর এই ছেলেটিকে তিনি সবচেয়ে কম ভালবাসতেন। একগুঁয়ে চরিত্রের ছেলে এবং লিযাংমো বা সেমোর মত অমায়িক নয় সে। আবার কনিষ্ঠ ইয়েন্‌মোর মত হাসিখুশিতে আমুদেও নয়।

ফেংমো, এখানে কেন এসেছ? তিনি আবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সে কোন উত্তর দিল না। এক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই চাহনি যেন মেয়েটি অনুভব করতে পারছিল। সে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল, আবার চোখ নাবিয়ে নিল।

আমি দেখতে—দেখতে—এসেছিলাম, তুমি কেমন আছ মা? তোৎলাতে তোৎলাতে ফেংমো বলল।

বেশ ভাল আছি। শান্ত গলায শ্রীমতী ওযায়ু বললেন।

আরেকটা ব্যাপার আছে, ফেংমো বলল।

তবে লাইব্রেরী ঘরে এস।

তাঁর পেছনে পেছনে ফেংমো লাইব্রেরী ঘরে গেল। দু'জনেই দাঁড়িয়ে।

ফেংমো জিজ্ঞেস করল, মা ওই কি সে?

ফেংমো তুমি আমাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করতে এখানে এসেছ? এটা তোমার কোন ব্যাপার নয়, কঠোর ভাবে তিনি বললেন।

না মা, এটা আমার ব্যাপার। মা, তুমি কীকরে এরকম ভাবতে পারলে? বন্ধুদের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না—

সে-কথা বলতেই কি এসেছ ?

হ্যাঁ। কথাটা এমনিতেই খারাপ লেগেছিল, এখনতো ওকে স্বচক্ষে দেখলামই ! এত অল্প বয়েস, আর বাবা—তিনি অত বড় ।

এক্ষুণি তুমি চলে যাও। তোমার সঙ্গে দেখা করা এখন আমার পক্ষে সুবিধাজনক কিনা, চাকর পাঠিয়ে সে-খোঁজ না নিয়েই, বলা কওয়া নেই এভাবে তোমার এখানে চলে আসাটা অনধিকার প্রবেশ। আর বাবার সম্বন্ধে যা বলেছ, সে-বিষয়ে জেনে রাখো যে বড়দের ব্যাপারে ছোটদের নাক গলাবার কোন দরকার নেই।

ফেংমোর জেদ তিনি জানতেন কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, আজ কোন কথা না বলে ফেংমো সোজা চলে গেল। একবার ও পেছনে তাকাল না পর্যন্ত। এরা দু'জনে পরস্পরকে দেখেছে। এতে শ্রীমতী ওয়ায়ু বেশ বিরক্ত হলেন। সাত বছর বয়েস থেকেই এ-বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা বারন ; এই পুরোনো প্রথাটার কোন পরিবর্তন তিনি করেন নি। অন্যান্য প্রথার অনেক বর্জন ও অদল-বদল অবশ্য হয়েছে।

লাইব্রেরী ঘরে তিনি পায়চারী করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মন প্রস্তুত হয়ে গেল। তিনি ঠিক করে ফেললেন যে মেয়েটিকে তিনি রাখবেন। তবে মেয়েটির জানতে হবে, এ-বাড়িতে তার কর্তব্য কী। বাগানে গিয়ে তিনি মেয়েটিকে বললেন, তোমার বিষয়ে ঠিক করলাম যে, তুমি এ-বাড়িতে থাকবে।

দু'হাতে সূঁচ নিয়ে মেয়েটি শ্রদ্ধাসহকারে নীরবে উঠে দাঁড়াল ! তারপর মৃদু গলায় বলে উঠল, আমার কাজে তবে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন ?

হ্যাঁ। তুমি তোমার যা কাজ, করে যাও। বুঝলে—এখানে তোমাকে আনা হয়েছে আমার স্বামীর সেবা করার জন্য—মানে, কতগুলি সম্পর্কগত ব্যাপারে আমার জায়গা নিতে হবে তোমাকে।

বুঝতে পেরেছি। আগের মত অর্দ্ধস্ফুট গলায় শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখের দিকে চোখ রেখে, মেয়েটি বলল।

এ-কথাটা তোমাকে জানতে হবে যে, কতগুলি বিষয়ে আমাদের পরিবার এখনও পুরোনো চালে চলে।

আচ্ছা। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উত্তর দিল। তার হাত দু'টি কোলের ওপর ন্যস্ত হল, কিন্তু চোখ পড়ল না।

সেক্ষেত্রে কথাটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। কিছুটা অস্বাভাবিক গলায় তাড়াতাড়ি বললেন তিনি।

আমার কি একটা নাম থাকা উচিৎ নয় ? এ-বাড়িতে আমার একটা নাম থাকবে না ? করুণ মর্মস্পর্শী গলায় প্রশ্ন করল মেয়েটি।

নিশ্চয়ই থাকবে। আমি তোমাকে একটা নাম দেব। তোমার নাম হবে চিউমিং—যার অর্থ উজ্জ্বল শরৎ। এ-নামের মধ্যেই তোমার কাজ নির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার বোঝা যাবে। তিনি হলেন শরৎ, আর তুমি সেই ঋতুর উজ্জ্বলতা, কেমন!

চিউমিং! আমি চিউমিং! মেয়েটি দু'বার উচ্চারণ করল। জিভে নিজের নামের সু-স্বাদ নিয়ে সে বলল আমি চিউমিং!

এরমধ্যে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু আর এ-মহলে আসেন নি।

মানুষটাকে অনেক বছর ধরে দেখছেন; তাঁর মনের অন্ধিসন্ধি শ্রীমতী ওয়ায়ুর নখদর্পণে। যদি তিনি উপপত্নী রাখার বিরোধীই হবেন, তবে নিশ্চয় এর মধ্যে এসে তাঁকে বারন করতেন। হয়তো রেগে গিয়ে বা দম-ফাটা হাসির ফোয়ারা তুলে বলতেন সে-কথা। আর এই যে তিনি দূরে সরে আছেন, এর অর্থ মেয়েটিকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পেতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। আপত্তি নেই বলেই শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখোমুখি হতে লজ্জা। স্বামীকে তিনি এত ভাল চেনেন যে তাঁর মনে হল, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু নিজেই নিজের এই গোপন পিপাসার জন্য ক্ষীণ আত্মগ্লানি অনুভব করছেন। মহাপুরুষের গুণাবলী জানা ও শ্রদ্ধাভরে সেইসব গুণাবলীর আকাঙ্ক্ষা করা, অথচ দেহের দুর্মর কামনা বাসনার জন্য সেসব কাজে পরিণত করতে না পারা তাঁর স্বামীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। কাজেই, এক থালা পরম সুখাদ্যের প্রলোভন যেমন তিনি জয় করতে পারেন না, তেমনি উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের যতই আকাঙ্ক্ষা থাকুক না কেন, এই নবযুবতীর সঙ্গসুখের বাসনাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। দীর্ঘকাল ধরে শ্রীমতী ওয়ায়ুর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করলেও তাঁকে সংযমী আখ্যা দেওয়া মুশকিল। শ্রীমতী ওয়ায়ুও জানতেন যে তিনি যেমন আছেন তার চেয়ে যদি কম সুন্দরী বা কম বিবেচক হতেন তবে তাঁর পতিদেবতা অন্য রমণীর কাছে যাতায়াত শুরু করতেন। তাই তিনি তাঁকে সর্ববিষয়েই তৃপ্ত রাখবার সযত্ন চেষ্টা করে এসেছেন এতদিন যাবৎ। অনেক ছেলেপুলে মরে মরে, তাঁর স্বামীই ছিলেন শাশুড়ির একমাত্র সন্তান। এই সন্তান ছিল তাঁর নয়নমণি। ছেলেও ছিল মার একেবারে আঁচল-ধরা। সাত বছর বয়েস হলে ছেলেকে আলাদা মহলে স্থানান্তরিত করার কথা বললেই শ্বশুরের সঙ্গে শাশুড়ির নানান কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া, অশ্রুজল ইত্যাদি শুরু হত। অতএব ছেলে মার অঞ্চলছায়াতেই বাল্যকাল কাটাতে লাগল। তারপর ন'বছর বয়সে আবার কথাটা উঠল। তখন শাশুড়ি পালটা যুক্তি দেখালেন যে তাঁর ছেলের গলায় একটা দোষ আছে। সেজন্য রাত্তিরটা দেখাশোনা করতে পারেন এমন কোন জায়গায় ছেলেকে রাখা উচিৎ। শ্বশুর ভদ্রলোক

নিজস্ব যুক্তিতে ছিলেন অচল অটল। তাই মোটামুটি এরকম আপোষ হল যে বাবার শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটায় ছেলে থাকবে। হায়! সেই ঘরের পাশে যে একটা দরজা ছিল ভদ্রলোক তা জানতেন না। সেই দরজা দিয়ে প্রতিরাত্রেই এই একগুঁয়ে ছেলেটি মার কাছে চলে আসত। ধৈর্য ধরে স্নেহের সঙ্গে তিনি ছেলেকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নি তাতে। বাবার আত্মসংযমের শিক্ষা মার স্নেহের তীব্র বন্যায় কোথায় ভেসে যেত। স্নেহভারে দিশাহারা জননী ছেলের সামনে ধরে দিতেন রকমারী সব খাবার, যা গুরুপাক। খেতে খেতে অতিভোজনের জন্য যখন ছেলের পেটের যন্ত্রণা শুরু হত, তখন মা তাঁকে শেখালেন আফিমের ধূম্রসেবন করতে। ছেলের স্বাস্থ্য ভাল ছিল। তাই আফিমের ধোঁয়ার কুফল ফলে নি। পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে সন্তানের ওপর মার প্রভাবই বেশী। তাই ছেলে সাবালক হলে তিনি বলেছিলেন, খোকা তুমি পুরুষমানুষের চেয়ে মেয়ে-মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছ বেশী। বাবার চেয়ে মাকেই তুমি বেশী চেয়েছ। গুণবান হবার চেয়ে আরাম স্বাচ্ছন্দ্যকেই বেশী পছন্দ করে এসেছ। তবে তাই হক। এখন এই পরিবারের স্বার্থে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া উচিৎ, যে তোমার এই দুর্বলতায় শক্তিসঞ্চার করতে পারবে। বিয়ের পর শ্বশুর মশাই নববধূকে বলেছিলেন, দ্যাখো বৌমা, আমার ছেলেকে তুমি যে-ভাবে গড়ে নেবে ও সে-রকম হবে। অনেক পুরুষ নিজেরাই নিজেদের জীবন গঠন করে কিন্তু ওর জীবন সর্বদা মহিলার হাতেই গড়া। ওকে এ-কথা জানিও না। এই দুর্বলতার জন্য ওকে কোন গঞ্জনা দিও না। খুঁজে দেখো, দু'একটা শক্ত সূতো ওর চরিত্রের মধ্যে আছে কিনা, যদি থাকে—তবে তা দিয়েই বুনে দিও ওর জীবন। যদি না পাও, নিজের জীবন থেকে গোপনে দিও সেই সূতো।

ওকে আমি ভালবাসি। উত্তরে এই সরল উক্তিটি সেদিন করেছিলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চমকে উঠেছিলেন. এমন নির্ভীকভাবে কথা বলা মেয়েদের পক্ষে সহজ নয়। কোন তিরস্কার না করে তিনি বললেন, তাহলে নারীর সবচেয়ে শানিত অস্ত্রটি তোমার হাতে রয়েছে।

স্বামীকে ভালবাসলেন সংসারের কাজ করলেন আর ভেতরে ভেতরে স্বামীর মনের চৌহদ্দী চিনে নিতে লাগলেন। খুব অল্প আয়তন সেখানে। সেখানে নেই কোনো স্থায়ী সুর। এ-রকম সময়ে তিনি আস্তে আস্তে সেই আয়তন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মনের জগতে পদার্পণ করলেন। স্বামীকে সে-কথা জানান নি। জানালেও তিনি বুঝতেন না। তাঁর মনের যে অংশটা স্বামীর জন্য সেটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তারপর থেকে চল্লিশতম জন্মদিন পালনের

এই পরিকল্পনা করে আসছেন।

ফেংমোর সঙ্গে চিউমিং-এর চোখাচোখি হওয়ার দরুণ, সম্প্রদানের কাজটা আগেভাগেই চুকিয়ে দিতে হবে তাঁকে। এই চোখাচোখি হওয়াটা হয়ত কিছুই না কিন্তু আবার অনেক কিছু হতেও পারে। উঠতি বয়েসে এরকম আকস্মিক দেখা, কখনো কখনো প্রথম দর্শনও হয়ে যেতে পারে। স্বামীব মেজাজ ঠিক থাকলে যত শীগগির সম্ভব মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিতে হবে তাঁর কাছে।

নিজের জামা-কাপড় তৈরী করছিল চিউমিং। ইং কাপড়গুলি এ বাড়ির পছন্দমত ডিজাইনে কেটে দিয়েছে। শ্রীমতী ওয়ায়ু ওর কাজ দেখে ইংকে বলসেন, ওর অন্তর্বাসের ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে ফেলিস। তারপর নিজের মহল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এখানে আসার পর এই প্রথম বেরুলেন তিনি।

প্রথ' গেলেন শাশুড়ির কাছে। গতরাত্রে প্রচুর কাঁকড়া ও মদ খেয়ে প্রৌঢ়ার পা ফুলেছে। ঝি তেল মালিশ করছিল পাসে। গতরাত্রির খাদ্যের পবিতৃপ্তিতে প্রৌঢ়া ভুলেই গেছেন যে পুত্রবধূব ওপর তিনি রেগে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ু ঝিকে নিচ থেকে ওপবে মালিশ করতে বললেন, যাতে রক্ত ওপরের দিকে ওঠে।

এরপর স্বামীর মহলে গেলেন। দু-চার কথার পর বললেন ফেংমোর জন্য লিনউয়িকে পুত্রবধূ হিসেবে নিলে কেমন হয়? শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু হেসে বললেন, সে ভার তো বরাবর তুমিই নিয়ে এসেছ। ইয়েনমোর খোঁজ করলেন। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন, বাড়িব হাওয়া অন্যরকম হওয়াতে ইয়েনমোকে তিনি গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু খুশি প্রকাশ করলেন। এক সময় সন্তর্পণে মেয়েটিকে পাঠাবার কথা পাড়লেন। তাঁরা স্বামী আপত্তি করলেন। বললেন, বরাবরই তুমি বড় জেদী মেয়ে।

আমার জেদের জন্য কি তুমি কখনো অসুখী হয়েছ?

আমি আর এ-বিষয়ে কোন আলোচনা করতে চাই না। ওর কথা আর আমার কাছে তুল না। আগে দান-করা একটা জমি ফের কিনতে হবে একজনের কাছ থেকে। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। আর শোনো, আমি কোন দোষের ভাগী হতে পারব না।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, বেশ ভাল তো। দামটাম ঠিক করে ধরো যেন। ভাল কথা, মেয়েটির নাম তোমাকে বলা হয় নি কিন্তু। ওর নাম চিউমিং। সে তোমার জীবনের শরৎকে ঝলমল করে তুলবে। আর জেনে রেখ,

কেউ তোমাকে দোষ দেবে না। শুনে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর ঠোঁট একবার নড়ে উঠল, কিন্তু কিছু না বলে চলে গেলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ু রং ফিকে-হয়ে-যাওয়া আঁকিডগুলির দিকে একবার তাকিয়ে ভাবলেন, আমাকে শাপান্ত করতে গিয়েছিল কিন্তু ও জানে না কীভাবে তা করতে হয়।

ভেতরে ভেতরে একটা ভয় যেন জমে উঠছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ুর নিজের মহলে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল কিন্তু না, ছেলেদের প্রতিও কর্তব্য আছে। তিনি প্রথমে লিয়াংমো ও পরে সেমোর ঘরে গেলেন।

লিয়াংমো খামার দেখতে যাচ্ছিল। ফসল ওঠার সময় তদারক করাটা দরকার। লিয়াংমোকে তিনি টি-হাউসে যেতে বললেন যেখানে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু জমি কেনার জন্য গেছেন। তিনি বড় ছেলেকে বলে দিলেন, সে যেন দাম-টাম বেশী না দিতে হয় তা দেখে। লিয়াংমো চলে যাচ্ছিল, তার কাছে তিনি মেং-এর খোঁজ করলেন। ঘুম ভাঙার পরেও এক কি দু-ঘণ্টা পার না হলে তন্দ্রালসভাবটা দূর হয় না মেং-এর। শাশুড়ির গলা শুনে সে চটপট তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল। তার কানে মুক্তোর দুলটা দুলছিল। এবার লিয়াংমোকে যেতে বললেন।

মেং-এর আপদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে তিনি স্নেহের স্বরে বললেন, সকালের দিকে কি তোমার এখন বমি হচ্ছে বৌমা ?

এইমাত্র কয়েকদিন হল আরম্ভ হয়েছে, তবে কিছু উঠছে না, শুধু ওয়াক হচ্ছে, মেং উত্তর দিল।

আরও দিন দশেক গেলে ঠিকঠাক আরম্ভ হবে। সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল হলে বা ব্যাটাছেলে হলে প্রত্যেক মাকেই তিন মাস এই বমির জ্বালা পোয়াতে হয়, তিনি বললেন।

ওই ক্ষুদেটার সময় হয়েছিল, ঝির পিঠে সওয়ার-হতে-ব্যস্ত তার ছেলের দিকে তাকিয়ে মেং বলল।

এরপর নিজের কথায় এলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। তিনি বললেন, আচ্ছা বৌমা, একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। মানে বলছিলাম কী—যদি তোমার বোন লিনউয়ির সঙ্গে ফেংমোর বিয়ে হয়, তবে কেমন হয় ? এক-বয়েসীই হবে দু'জন। লিনউয়ি বোধহয় কয়েকমাসের ছোট হবে ওর চেয়ে। দু'জনেরই স্বাস্থ্য ভাল। এখনও অবশ্য কোষ্ঠী দেখাই নি। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, যে-যে মাসে ওদের জন্ম, তাতে ভাল মিল হবে, তাছাড়া ওদের রাশির মিলও আছে।

আমার বোন ? আমার বোন এ-বাড়িতে আসবে ? মা আমি আপনাকে বলতে পারি, লিনউয়ি কিন্তু ফেংমোকে অনাধুনিক বলে মনে করেনা।

কেন বল তো বৌমা ?
কারণ ফেংমো কখনও স্কুলে যায় নি। এ-বাড়ির চার দেয়ালের ভেতরে সে মানুষ।
সে-বছর লিনউয়িকে সাংহাই স্কুলে পড়তে না পাঠালেই পারতেন বেয়ান।
তবে ফেংমোতো এখনও স্কুলে যেতে পারে।
না এখনও ওর মন গড়ে ওঠে নি। ওকে বাইরের কোন স্কুলে পাঠাব না।
লিনউয়িকে কি তবে জিজ্ঞেস করব মা ?
না থাক। বেয়ানের সঙ্গে আমি নিজেই বরং কথা বলব।
উঃ মাগো ! বলে মেং পেটের ওপর দুই হাত রাখল, এত আগে থেকেই কি বোঝা যায় নাকি ?
তবে ছেলে হবে বৌমা—দেখে নিও। ব্যাটাছেলের তেজ বেশী। তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। তুমি একটু সুপ-টুপ খেও, বলকারী হবে। উঠে পড়লেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।
খাব মা। বড় তাড়াতাড়ি ক্ষিধে পায় আজকাল। এই খেলাম, এই ক্ষিদে পাচ্ছে।
পেট ভরে খাও, তোমার আর বাচ্চার ক্ষিধে মেটাও।
তিনি বেরিয়ে গেলেন।
সেমো ওর মহলে বড় ঘরটায় ছিল। বিলিতি কালির বোতল থেকে খানিকটা কালি পড়ে গিয়েছিল। তিরিক্ষি মেজাজে কালিটা মুছছিল সেমো। কী রে সেমো, তুই একা নাকি ? শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।
বৃলাংয়ের শরীরটা খারাপ, কালি-মোছা ন্যাকড়াটা পাকিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে সেমো বলল।
তাই নাকি ! যাই দেখে আসি মেয়েটাকে।
লাল রেশমী পর্দটা সরিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু ঘরে ঢুকলেন। এই প্রথম এ-ঘরে এলেন তিনি।
বিয়ের ব্যাপারে অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেমোকে খারাপ একটা মহল দেওয়া হয়েছে। দুটো ঘরই উত্তরমুখো। শীতকালে রোদের নামগন্ধও নেই। গ্রীষ্মে স্যাঁৎসেঁতে। শ্রীমতী ওয়ায়ুর মনে অনুতাপ হল ঘরটা দেখে। বৃলাংয়ের খাটে মশারি নেই। তার বদলে প্রত্যেকটা জানলায় পর্দা টানানো। দেয়ালে কিছু বিলিতি ছবি ঝুলছে। দেয়াল জুড়ে তাকে বিলিতি বই।
তোমার কানদুটিতো বেশ ! তোমার বাহু দুল পরা উচিত। আমি তোমাকে একজোড়া সোনার দুল পাঠিয়ে দেব'অখন, শ্রীমতী ওয়ায়ু বৃলাংকে বললেন।
বৃলাং তার উজ্জ্বল কালো চোখজোড়া তুলে বলল, ধন্যবাদ মা। সচরাচর

গলার নম্রতা দেখে শঙ্কিত হলেন তিনি। মনে হচ্ছে তুমি বেশ অসুস্থ ?
একটু ক্লান্ত লাগছে।
তবে জিরোও। এ-বাড়িতে কাজ করবার লোক ঢের আছে। তুমি পূর্ণ বিশ্রাম নাও, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
ঘর থেকে বেরিয়ে সেমোকে জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখছিস রে ?
ইংরিজিটা রপ্ত করবার চেষ্টা করছি।
কার কাছে শিখছিস ?
লজ্জার অস্বস্তি চেপে সেমো বলল, বূলাংয়ের কাছে।
ও খুব ক্লান্ত। বিশ্রাম নিক একটু।
তাই বলব ওকে। নগর পরিষদ ভবনে গতকাল ন্যাশানাল রিকন্স্ট্রাক্শন কমিটির মিটিং-এ ওকে সভানেত্রী হিসেবে মনোনীত করা হল। তারপরই খুব ক্লান্তি নিয়ে ফেরে।
আবার জাতীয় পুনর্গঠন সমিতি, খাটুনিতো হবেই।
আমিও তা-ই বলেছি, সেমো বলল।
এরপর দ্রুতপায়ে নিজের মহলে ফিরে এলেন। চিউমিং তার নতুন জামা সেলাই করছিল। চিউমিংকে তিনি বললেন, আগামী কাল তোমাকে নিয়ে যাব, তৈরী থেকো।
শ্রীমতী ওয়ায়ু লক্ষ করলেন নীরব নতমুখী সীবনরত মেয়েটির কাঁধের বাহু থেকে পাকা পীচফলের মত একটা লাল আভা ক্রমশ তার ঘাড়ে ও চুলের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

পরের দিন বিকেল নাগাদ শ্রীমতী ওয়ায়ু ঠিক করে ফেললেন কোন সময় চিউমিংকে পাঠানো হবে। যদি চুপিসাড়ে রাত্রিবেলা কাজটা সমাধা করা যায় তবে গণ্ডগোল কম হবে।
পরদিন তাই তিনি ইংকে বললেন, সে যেন প্রসাধনের ব্যাপারে মেয়েটিকে একটু বলে কয়ে দেয়। এ-বিষয়ে মেয়েটি অজ্ঞ থাকবারই সম্ভাবনা। সারাটা দিন তিনি লাইব্রেরীতে কাটালেন। পৃথিবীর ইতিহাসের একটা বই পড়লেন— যখন স্বর্গ-মর্ত আলাদা ছিল না, তুমুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে উভয় জগৎ মিলেমিশে ছিল, তার ইতিহাস। দিনটা এমনভাবে কেটে গেল যেন তিনি দেহের খাঁচাটা ছেড়ে হালকা অশরীরী অস্তিত্ব নিয়ে মহাশূন্যে সাঁতার কাটছেন।
সারাদিন কেউ তাঁর ধারে কাছে এল না। তিনি বুঝলেনও যে যতক্ষণ না চিউমিং-এর কোন একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে ততক্ষণ কেউ এদিক মাড়াবে না।

একমাত্র নায়েবমশাই একবার এসেছিলেন। যে জমিটা কেনা হল, তার দলিল নিয়ে। আধ একর জমির জন্য তাঁর স্বামী আশি ডলার দাম দিয়েছেন। সত্তর ডলার হলেই ভাল হত। কোলের ওপর রাখা বইটা বন্ধ করলেন।

ইং রাতের খাবার নিয়ে এল। সঙ্গে চিউমিং-এর খাবারও। শ্রীমতী ওয়ায়্ন্ চিউমিং-এর খাবার ঝুঁকে পড়ে শুঁকলেন। পেঁয়াজ রসুন বা চড়া গন্ধওয়ালা কোন মশলা দেওয়া হয় নি তো ইং?

কী করতে হবে, না হবে, তা আমি জানি। ইং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

লঙ্কা নেই তো বেশী? লঙ্কা খেলে বুকজ্বালা করবে।

বাচ্চারা খেতি পারে না এমন কিছুই দেওয়া হয় নি। বেশ ঝাঁজ দিয়ে কথা বলছিল ইং। সে দেখাচ্ছিল যে, তার মনের ক্ষোভ এখনও দূর হয় নি।

দ্যাখ ইং, তুই বিশ্বাসী। খুব বিশ্বাসী কিন্তু যদি আমার কাজ করতেই হয়, তবে জেনে রাখিস যে, আমি যা চাই, তাই করবি।

তোমার খাবার জুড়িয়ে যায়। উত্তরে ইং শুধু একথা বলল।

শ্রীমতী ওয়ায়্ন্ একা-একা তাঁর ঘরে বসে খেয়ে নিলেন, খাওয়ার পরে ধূমপান করে বাগানে গেলেন। সেখানে মালী নতুন অর্কিড বসানোর কাজে ব্যস্ত। কীভাবে বসাতে হবে সে-সম্পর্কে কিছু বললেন মালীকে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। সন্ধ্যার পরেও একঘণ্টা অবধি তিনি বাইরে কাটালেন।

চিউমিং চান করে চুল আঁচড়াচ্ছিল। তার পরনে নববস্ত্র, যা সে নিজেই সেলাই করে নিয়েছিল। তার তরুণ মুখে স্বেদবিন্দু। তিনি তার পাশটিতে বসে বললেন, কোন ভয় নেই তোমার। মানুষটার ভারি দয়া-মায়া। মেয়েটি নতচক্ষু তুলে তাঁর দিকে তাকাল।

তোমাকে শুধু ও'র কথা শুনে চলতে হবে। শ্রীমতী ওয়ায়্ন্ নিজেকে কঠিন করে বাঁধলেন।

তাহলে ওকে এখন দিয়ে আয় ইং।

চল—চল, যে জন্য এয়েচ, চল সেখানে। ইং বলল।

চিউমিং উঠে দাঁড়াল এবং ইং-এর অনুগমন করল। যাবার সময় সে ইং-এর মুখ থেকে শ্রীমতী ওয়ায়্ন্-র মুখের দিকে তাকাল। তারপর দুজনের কারুর মুখেই পরিত্রাণের কোন ইঙ্গিত দেখতে না পেয়ে ধীরে ধীরে মাথা নিচু করল আবার আস্তে আস্তে হেঁটে চলল ইং-এর পিছু পিছু, ঘর ছাড়িয়ে, ফটক ছাড়িয়ে, চাতাল ছাড়িয়ে এক নতুন তিমিরাভিসারে।

অন্ধকারের মধ্যে চিউমিং এগিয়ে যাচ্ছিল। শুধু তার জামার হাতা ধরে আছে ইং। সেই আকর্ষণে সে এগিয়ে যাচ্ছিল অচেনা পথে অজানা জীবনে।
এ-বাড়িতে আসা অবধি সে কখনো বাইরে কোথায়ও পা দেয় নি।
এখন শ্রীমতী ওয়ায়ুর মহল ছেড়ে বেরিয়ে এসে, নিজেকে নিরাশ্রয় বলে মনে হল, জন্মের পর যেমন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে ছিল শহরের প্রাকারের পাশে। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় মুখ বুঁজে সইতে শিখেছিল সবকিছু। কারণ, চেঁচিয়ে উঠলেও তার আর্তনাদ শুনে এগিয়ে আসার মত কেউ ছিল না। প্রৌঢ়া সন্ধ্যেবেলাই ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর মহল নিস্তব্ধ। পশ্চিম দিক থেকে কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। লিয়াংমোর বাচ্চাটা কাঁদছে।
উত্তর দিক থেকে নারীকণ্ঠের চাপা কান্না কানে এল ইং-এর। সে একবার থামল, কান পেতে শুনল, কে কাঁদে এখন বলতো দেকি, ইং বলল।
চিউমিং মাথা তুলল।
না ঃ আর শোনা যাচ্ছে না ; ও কোনো রাতপাখির কান্না হবে, ইং বলল।
আবার তাদের যাত্রা শুরু হল।
চিউমিং বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কে ওই চাতালে বসে কাঁদছে ! আর জানলেই বা সে কী করে ! নিজের অসহায়তা মূর্তি ধরে যেন তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। তারও কেঁদে-কেঁদে হালকা হতে ইচ্ছে করল। এই হিম-নীরবতা ভেঙে তার হঠাৎ কথা বলে উঠতে ইচ্ছে করল। জীবন্ত কোন প্রাণীর কণ্ঠস্বর শুনতে ইচ্ছে করল, এমন কি তা এই ঝির হলেও চলবে।
আমাকে যে এ'রা আনলেন এটা ভারি অদ্ভুত। আমার মনে হয়···ওইসব মেয়েমানুষদের কাউকে···মানে তুমিতো জানোই যে যারা এ-সব ব্যাপারে সব কিছু জানে শোনে···এমন কাউকে আনলে···আমি তো গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়েই মানুষ বরাবর···
ওসব মেয়েছেলেকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না বৌদি, ইং ঠাণ্ডা গলায় বলল।
দ্বিতীয়বার কোন কথা বলার আগেই চিউমিং গন্তব্যে পৌঁছে গেল। ইং তাকে পথ দেখিয়ে বড় একটা ঘরে নিয়ে গেল। এত বড় ঘর চিউমিং তার জীবনে কখনো দেখেনি। বিরাট বিরাট আসবাবপত্রে সাজানো। দেয়ালে বড় বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবি ঝুলছে ! রাত্রির মৃদুমন্দ বাতাসে দরজার ভারি সাটিনের পর্দাগুলি আন্দোলিত হচ্ছিল। এখানেই সে থাকবে যদি সে তাঁকে খুশি করতে পারে।
কিন্তু তিনি কোথায় ?

চিউমিং সে-কথা জিজ্ঞেস করল না। ইং-ও কিছু বলল না। আগের মতই নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে ইং তাকে বিছানা ঠিক করতে সাহায্য করল। বিছানার কিনারায় পাণ্ডুর মুখে সে বসেছিল। তাকে সেইভাবে বসে থাকতে দেখে ইং-এর মায়া হল।

মনে রেখ, খুব মানী লোক এনারা। যদি তোমার কাজ ঠিকমত করে যাও, তবে কোনও ভয় নেই গো। উনি মানুষ খুব ভাল আর বৌদির যেমন দয়ামায়া তেমনি বুদ্ধি। তোমার ভাগ্যি ভাল, তাই এখানে এয়েচ। মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার না আছে ঘরবাড়ি, না আছে মা-বাপ—যাবার মত কোন ঠাঁই-ই তো নেই তোমার বাছা, ইং সদয়কণ্ঠে বলল।

চিউমিং মাথা ঝাঁকাল। সে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল। ইং মশারির পর্দা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পর্দার এ-পাশে চিউমিং ভয়ে জড়সড় হয়ে একা শুয়ে ছিল। আগামী এক কি দু-ঘণ্টার মধ্যে তার জীবনে কী ঘটবে? এই বাড়িটা তাকে চারদিকে দুর্গের মত ঘিরে রেখেছে। কিসের যেন শব্দ হল! এ-বাড়ির চাকরেরা বা ছেলেরা জুয়া খেলছে বোধহয়। হয়ত তিনিই খেলছেন বন্ধুদের সঙ্গে। ঘটনা এভাবে ঘটছে, যেন সে রক্ষিতা না হয়ে বৌ হিসেবেই এ-বাড়িতে এসেছে। দিদিই তো এঁ'র বৌ। ওঁর মত সর্বাঙ্গসুন্দরীর পরে এঁকে আর কী দিতে সে পারবে?

আমি কী রুক্ষ! আমার হাতদুটোও খরখরে, অন্ধকারে দু-হাত তুলে ধরে সে ভাবল।

কে যেন তখন কাঁদছিল!! এ-বাড়িতে আর কারা থাকে। ছেলেরা, ছেলের বৌরা। ওদের সবাইর সঙ্গে শান্তিতে চলতে হবে। ওরা যেন ঘেন্না না করে। এ-বাড়িতে এত ঝি-চাকর—তারা কি ভাল ব্যবহার করবে? চাকরদের কী বলে ডাকতে হয়? ইং-এর মত ওদেরও কি দয়ামায়া আছে। ওদের তো সে মাইনে দিতে পারবে না, তবে কোন কাজ করবার দরকার হলে সে কি নিজেই নিজের কাজ করে নিতে পারবে?

আঃ! যদি নিজের আগের বিছানায় গিয়ে শুতে পারতাম, চিউমিং ভাবল। দুটো বেঞ্চির ওপর তক্তা পেতে তার বিছানা; যেখানে শুয়ে রাত্রিবেলা ষাঁড়ের নিশ্বাস-প্রশ্বাস, মোরগের ডানা ঝাপটানো শুনতে পেত। তক্তার ওপর মাদুর, একটা জীর্ণ লেপ মুড়ি দিয়ে সে শুত।

কড়ি-বরগা থেকে পাখির বিষ্ঠা মুখের ওপর পড়ায় অনেকদিন সকালবেলা সে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, এমনও হয়েছে! তারপর ধাই-মার সেই ছেলেটির কথা তার মনে পড়ল। বোঝার মত বয়েস হতে সে জেনে

আসছে যে তাকে ওই ছেলেটির বৌ হতে হবে। এত বেশী পরিচিত ছেলেটি যে তাকে সে কখনোই ভালবাসতে পারে নি। অন্যান্যদের মত সে-ও ছিল একটি চাষী-ছেলে। এখনও চোখ বুঁজলে, শৈশবে ফিরে গিয়ে সে তার গোলগাল মুখ ও মাংসল গালের ছবি দেখতে পায়। তারপর ছেলেটা ঢ্যাঙা হয়ে গেল আর সে-ও তাকে লজ্জা পেতে আরম্ভ করল। স্বামী হিসেবে তাকে ভাবতে শুরু করার আগেই ছেলেটা মরে গেল। ছেলে মরে গেলে ধাই-মা তাকে দুষেছিল, অপয়া রাক্কুসী, অভিশাপ নিয়ে এসেছিস তুই আমার কাছে। তোকে ফেলে রেখে এলেই হত ভাল! আমার ছেলের জন্য তুই নোস। চিউমিং-এর মনে পড়ল, কথাগুলি তাকে কী দাগ দিয়েছিল। তার বাড়ি বলতে যা, তা ওই খামার বাড়ি। মা বলতে ওই ধাই-মা। দয়া-মায়া ছিল না তার, এমন নয়। তবে কথাগুলি শোনার পর তার মনে হয়েছিল, সে কুড়িয়ে-পাওয়া একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়। ও-বাড়ির সে কেউ না। কাজেই লিউ-মা এসে যখন দরদস্তুর করছিল, চিউমিং কিছুই বলে নি।

এখানে না এসে কী করতাম, নিজের মনকে জিজ্ঞেস করল সে। এ-রকম সময়ে সে একটা পদধ্বনি শুনতে পেল।

তার শিরা-উপশিরায় সমস্ত রক্তস্রোত যেন থেমে গেল মুহূর্তে।

লেপটা থুৎনি অবধি টেনে নিয়ে সে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল। মশারিটা মাঝখান দিয়ে দু-ভাগ হয়ে সরে গেল। সুদর্শন একটি মুখ উঁকি দিল পর্দার মাঝখানে। বেশী বয়স হয়নি, আবার কম বয়েসীও না। মদ্যপানের ফলে মুখটা আরক্তিম। মশারির মধ্যে মদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট তার দিকে তাকিয়ে থেকে মশারিটা ছেড়ে দিলেন তিনি।

এরপর অনেকক্ষণ যাবৎ কোন সাড়াশব্দ পেল না সে। তিনি কি চলে গেলেন? সে নড়তে চড়তে সাহস করল না। নিবিড় অন্ধকারে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যদি তাকে তাঁর মনে না ধরে, তবে আগামীকালই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন সে কোথায় যাবে? তাড়িয়ে দেবার সময় কি এঁরা তাকে কিছু টাকা-কড়ি হাতে দেবেন? যেসব রক্ষিতারা বাবুদের খুশি করতে পারে না তাদের কপালে কী ঘটে! এই আশংকা তাকে এমন ভাবে পেয়ে বসল যে তার মনে হল, সেই পরিণতির চেয়ে অন্য যে-কোন কিছুই ঢের ভাল হবে। সে অধীর হয়ে উঠে বসল। তারপর মশারিটা এক হাতে ফাঁক করে বাইরে তাকাল। বড় একটা চেয়ারে তিনি স্থির হয়ে বসে ছিলেন। ওপরের পোষাক ছাড়া হয়ে গিয়েছিল; তখন তাঁর পরনে শুধু সাদা রেশমী অন্তর্বাস। এত নিঃশব্দে কীকরে যে তিনি নড়াচড়া করলেন!

সে একটুও শব্দ পায় নি।
সে তাঁর দিকে তাকাল, তিনিও ওর দিকে তাকালেন।
তাড়াতাড়ি সে মশারিটা ফেলে দিল এবং দু'হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল।
তিনি আসছেন!
তাঁর ভারি কোমল পা মেঝের টালির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে! শোনা যাচ্ছে তাঁর পায়ের শব্দ!
মশারির পর্দাটা যেন চিড়ে ফেলা হল, এ-ভাবে পর্দাটা সরে গেল। তারপর সে অনুভব করল তার মুখ থেকে তিনি তার হাত দু'খানা টেনে সরিয়ে দিলেন।

গভীরতম ঘুম থেকে শ্রীমতী ওয়াং জেগে উঠলেন। স্মরণকালের মধ্যে এত গভীর ভাবে তিনি কখনো ঘুমোন নি।
এখন সকালবেলা।
সারারাত অঘোরে ঘুমিয়েছেন; একবারও জাগেন নি।
যে-নতুন মোমবাতিটা কাল রাতে ইং জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এখনও সেটা শুভ্র শিখায় জ্বলে যাচ্ছে নীরবে।
এক মধুর বিশ্রামের মনোমুগ্ধকর অনুভূতি তাঁকে ঘিরে ছিল, দেহমনের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল। এই স্বস্তির মধ্যে চেনা কিছু জিনিসও ছিল। এই প্রাচুর্যে-ভরা জীবনের নেপথ্যে স্মৃতির রাজ্যে তাঁর মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রতিটি সন্তান প্রসব করার পরই এ-রকম অনুভূতি হত তাঁর। দশটি চান্দ্রমাস পুরে গেলে, পূর্ণ গর্ভের ভার বইতে বইতে কেবল নিজের অসামান্য আত্মনিয়ন্ত্রণের জোরেই তিনি নিজের শান্তশ্রী বজায় রাখতে পারতেন। তারপর আসত প্রসবের পালা। তাঁর কাছে ঘটনাটা যতটা না, জন্মদান-করা তার চেয়ে বেশী, ওই যাকে বলা খালাস-হওয়া-তাই। সুতীব্র জননী-যন্ত্রণা আচমকা থেমে গিয়ে, নবজাতকের ক্রন্দনধ্বনি শোনা যেত, তখন তার প্রথম চিন্তাই হত নিজের স্বাধীনতাকে ফিরে পাবার চিন্তা। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে ধুইয়ে মুছিয়ে তাঁর কাছে আনা হলে, তিনি কখনোই তাকে নিজের একটা অংশ বলে ভালবাসতেন না, বরং তাঁর ভালবাসা শুরু হত সেই নতুন শিশুটির নিজস্ব সত্তাকে ঘিরেই। নিজেকে ভেঙে টুকরো করার কোন চিন্তা তাঁর আসত না। তিনি আবার তাঁর নিজের সমগ্র সত্তায় বিকশিত হতে চাইতেন।
আজ সকালেও তিনি সেই সমগ্রতার আস্বাদ পেলেন—এ যেন আরও গভীর, আরও পরিপূর্ণ। তাঁর সব কাজ এখনো সাঙ্গ হয়েছে। এই পরিবারে এমন কেউই নেই যার প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া হয় নি।
...কিন্তু...তাঁর সেজ ছেলে ফেংমোর কথা মনে হল। হায়! ওর বিয়ে

না হওয়া পর্যন্ত তিনি সত্যি সত্যি মুক্তি পেতে পারেন না !

কথাটা মনে হতেই তিনি উঠে কালো সাটিনের ওপর কাজ-করা চটিজোড়া পরে নিলেন।

কী গো বৌদি, তোমার অত ফর্তি কীসের এখন, ইং ভৎ'সনার সুরে বলল।

আমাকে আর বুঝতে হবে না তোর। তাতে তোর ঝকমারি বাড়বে বই কমবে না। তার চেয়ে যা করছিস কর। হ্যারে ইং, ফেংমোর পাশে লিনউয়িকে কেমন মানাবে রে ?

এক দড়িতে দুটো গিঠ। তা বৌদি নতুন খারাপ জিনিসের চেয়ে ভাল জিনিস দুবারাও ভাল। বড় খোকাবাবু কেমন লিনউয়ি দিদিকে নিয়ে সুকে আছে। অথচ মেজ খোকাবাবু কাল রাতে বৌকে পিটিযেছে।

সেমো বূলানকে মেরেছে ? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

কাল রেতের বেলায় তার কান্না শুনিচি, নইলে আর বলচি কী ? বৌমাকে না মারলে কাইনবে কেন সে, তুমিই বলো বৌদি, ইং বলল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। এ-বাড়িতে কি কখনো আমি শান্তি পাব না ?

জাগাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে সেমোর মহলে গিয়ে শুনলেন, সেমো খুব সকালে উঠে বেরিয়ে গেছে। বূলাং তখনো ঘুমে। চাকর-বাকরদের কাছে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। শুধু বললেন, সেমোকে বলিস, আজ রাত্রে ও যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

তারপর দৈনন্দিন কাজে লেগে গেলেন। রান্নাঘর তদারক করে, সারা বাড়িটা ঘুরে দেখলেন, নির্দেশ দিলেন, সংশোধন করে দিলেন।

ঘণ্টা কয়েক বাদে ওয়ায়ু-ভবনের ফটকের বাইরে তিনি পা দিলেন। এবং একসময়ে ক্যাং-সদনে এসে পৌঁছলেন। পাল্কী-চেয়ার থেকে নেবে পড়লেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। প্রসাধন-পেটিকা হাতে নিয়ে ইং-ও নাবল রিকশা থেকে।

শ্রীমতী ক্যাং খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করলেন বান্ধবীকে।

অনেক কথা আছে রে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। তবে খুব সকাল-সকাল চলে এলাম, তোর কাজের বোধহয় অসুবিধা হবে।

কী কথার ছিরি, কী করে বলতে পারলি রে ও-কথা ! বলে শ্রীমতী ক্যাং ব্যগ্র নয়নে সখীর মুখের দিকে তাকালেন। তোকে দেখতে সব সময় খুব সুন্দর লাগে ! নে চল, ভেতরে যাই। তুই চুল আঁচড়ে নে তারপর কথা বলব অখন, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

আমি বিকেলে চুল বাঁধি, বলে পেছন দিকে তাকালেন শ্রীমতী ক্যাং। তাঁর পেছনে ডজনখানেক-বাচ্চাকাচ্চার ছোটখাট একটা জনতা সৃষ্টি হয়েছিল। ছেলেপুলে ও নাতি-নাৎনী মিলেমিশে এই জনতা সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীমতী

ক্যাং সবচেয়ে ক্ষুদে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন। বাচ্চাটাকে চান করানো হয়নি, অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু তার গায়ে সাটিনের কোট পরানো।
দুজনে বাড়ির ভেতরে গেলেন। বড় চাতালটা পেরিয়ে শ্রীমতী ক্যাং-এর নিজস্ব মহলের চাতাল। পৌঁছে বাচ্চাটাকে নাবিয়ে দিলেন কোল থেকে। যে-ক্রীতদাসী সঙ্গে সঙ্গে আসছিল তাকে বললেন বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে যেন কিছু চীনেবাদাম কিনে দেয়। খোসাসুদ্ধু বাদাম কিনতে বলে দিলেন।
বাচ্চাদের কলরব শুনে হেসে উঠে তিনি শ্রীমতী ওয়ায়ুর হাত ধরে নিজের ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেলেন।
শ্রীমতী ক্যাং বললেন, ডিম-ওয়ালী মুরগীর মত আমার পেটে অনেক প্রশ্ন গজগজ করছে বুঝলি ?
ভারি অবাককাণ্ডতো ! বলার মত কিছু আছে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
ও কেমন হল রে, শ্রীমতী ক্যাং প্রশ্ন করলেন. কর্তার কেমন লাগল ?
আমার তো বেশ ভালই লাগল ! আমি ওর নাম রেখেছি চিউমিং। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। কর্তার কেমন লাগল ? প্রশ্নের এই অংশটার কোন উত্তর দিলেন না তিনি। কথাটা তাঁব বুকেব মধ্যে সাপের মত ফণা তুলে ধরেছিল।
উঃ ভগবান ! এমন ভাবে বলছিস যেন নাতির জন্য নতুন একটা আয়া রেখেছিস। জানিস আমার বাবা যখন একটা রক্ষিতা রাখলেন, মা তখন কান্নাকাটি করে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিল। তারপর থেকে আমরা দিনরাত চোখে চোখে বাখতাম মাকে। তারপর যখন বাবা দু'নম্বর রক্ষিতা রাখলেন, তখন এক নম্বর বক্ষিতা তার কানের দুল গিলে ফেলল। এভাবে রক্ষিতার সংখ্যা পাঁচে গিযে না-ঠেকা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে এরকম সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। তাবপর কী হল জানিস. শ্রীমতী ক্যাং উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।
তা—রপর সেই পঞ্চকন্যা আমার পিতৃদেবের জুতো চুরি করতে লাগলেন। কেননা, যার ঘরে তিনি রাত্রিযাপন করবেন বলে ঠিক করতেন, তার ঘরে তিনি জুতো ছেড়ে আসতেন। তখন অন্য একজন সেই জুতো চুরি করে নিত। শে—ষপর্যন্ত শান্তিস্থাপনের জন্য পিতৃদেব রুটিন করে সমান সময় ভাগ করে দিলেন প্রত্যেককে এবং প্রত্যেককেই সমান সময়ও সঙ্গ দিতে লাগলেন।
মেয়েগুলো, মানে ওই রক্ষিতারা ভারি বোকা ছিল, যাই বল। মাসীমার কথা এর মধ্যে আনছি না। অবশ্যই তিনি পুরুষের হৃদয়কে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু ওই রক্ষিতারা কী বলে অমন করত ! শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

তোর মত মেয়ে কখনো দেখা যায় নি আইলীয়েন। আচ্ছা বল্ দেখি, কাল রাত্রে তুই ঘুমোতে পেরেছিলি ?
গতকাল ? গতকাল আমি ছাতের ওপর বিষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে তোফা ঘুমিয়েছি। এই শোন্ তোর সঙ্গে অন্য কথা ছিল রে মিচেন। মানে বলছিলাম কী, ফেংমোকে তো তুই চিনিস. ওকে তোর কেমন লাগে ? ওকে কি স্কুলে পাঠানো দরকার ? কৌশলে কথাটা পাড়লেন তিনি। যদি শ্রীমতী ক্যাং বলতেন কোন দরকার নেই, তাহলে তিনি তক্ষুনি লিনউয়িকে চাইতেন। সেটা নির্ভর করে ছেলেটা কী হতে চায় তার ওপর, শ্রীমতী ক্যাং-এর গোলগাল বড় মুখটাতে অনেক রেখা ফুটে উঠল।
ও যে কী হতে চায়, তা কখনো বোঝা গেল না। এখন পর্যন্ত কেবল বেড়েই উঠছে ও। সতেরো পার হলে প্রত্যেক মার-ই ছেলেকে নজরে রাখা উচিৎ।
তাতো বটেই, শ্রীমতী ক্যাং একমত হলেন। ফেংমোর ছিপছিপে শরীর ও গার্বোন্নত মস্তক মনে পড়ল, তাঁর।
আসল কথাটা তবে বলি। আমি আমার পরিবারে আবার তোর একটা মেয়ে নিতে চাই। তাই ভাবছিলাম যে ফেংমো আর লিনউয়ি—কেমন হবে বলে মনে হয় তোর ? শ্রীমতী ওয়াংু এভাবে কথাটা পাড়লেন।
দু'হাত কোলের ওপর একত্র করে একটু ভেবে শ্রীমতী ক্যাং বললেন, বেশ কিন্তু ওই লিনউয়ি মেয়েটা যা ! আমি বলতে পারি বেশ হবে, তবে তিনি যে কী বলবেন ঈশ্বর জানেন !
ওকে বিদেশীদের স্কুলে পড়তে পাঠানো উচিৎ হয় নি তোর। তখনই তোকে বলেছিলুম, শ্রীমতী ওয়াংু বললেন।
বলেছিলি তো. ঠিকই বলেছিলি। এখনতো বাড়ির কিছুই পছন্দ হয় না মহারাণীর। বাবা মোঝেতে থুথু ফেললে ঝগড়া করবে বাবার সঙ্গে, বাড়িতে চীনেমাটির পিকদানী চাই। কিন্তু বল, বাচ্চাকাচ্চার বাড়ি, ভাঙতে কতক্ষণ। তারপর গোটা তের নাতি-নাৎনী নিয়ে আমার সংসার। ওই বাচ্চার দলের সবাইকে ন্যাঙট পরিয়ে দিতে হবে। যেন যেখানে সেখানে হিসি করে নোংরা না করে। আমাদের ঠাকুরমা-দিদিমারা দু-পায়ের মাঝে আটকানো পোষাক পরাত না ? তাঁদের কথা কি ফ্যালনা নাকি ? তিন তিনটে ঝি কাপড় কেচে হিমসিম হচ্ছে এ-বাড়িতে।
আমাদের বাড়িতে তা নিয়ে কোন মুশকিল হবে না ওর। বাচ্চাকাচ্চা যা আছে সব আমাদেরই। আবার, নিজেরটা যখন হয় তখন মেয়েদের জ্ঞানগম্যি হয়। তিনি শ্রীমতী ক্যাংকে মমতাবশত বলতে পারলেন না যে লিনউয়ির

সঙ্গেই তিনি একমত।
শ্রীমতী ক্যাং তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে যদি তুই নিস তবে খুশিই হব। বিয়ে দেওয়া দরকার ওর, তাতে মনের গতি পালটাবে। তবে কী জানিস, তোকে আমি খুব ভালবাসি, তাই ওর দোষের দিকটা খুলেই বললুম তোকে। আমার মনে হয় ও চাইবে যেন ফেংমো কটর-মটর করে ইংরিজি বলতে পারে, যদি অবশ্য এ বিয়েতে তার মত থাকে। ওর কাছে ইংরিজি না বলতে পারটা লজ্জাকর।
ইংরিজি শিখে কার সঙ্গে কথা বলবে ফেংমো? শেষে ওরা দুটিতে মুখোমুখি বসে ইংরিজিতে কথাবর্তা বলবে নাকি সেটাতো ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।
তাইতো হবে। আজকালকার ছুঁড়িগুলোর কাছে ইংরিজিতে কথা বলাটা একটা গর্বের বস্তু, শ্রীমতী ক্যাং বললেন।
দুই সখী চিন্তিত মুখে পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, ফেংমো এখন যেমন তা দেখে যদি লিনউঁযি খুশি না হয়, তা হলে এই প্রস্তাব বাতিল করে দেব। এখন আকাশে বাতাসে যুদ্ধের হাওয়া, সমুদ্রের ধারের শহরগুলির কোনটাতেই আমার ছেলেদের পাঠাতে পারি না এখন। সমুদ্রতীর থেকে দূরে আছি তাই নিরাপদ আছি আমরা
দাঁড়া, এক কাজ করা যেতে পারে। তুই বরং একটা সাহেব রেখে ওকে ইংরিজি শেখা। একজন পাদ্রীসাহেব আছেন এই শহরে, তাকে রাখতে পারিস; তাহলেই লিনউঁয়িকে বলার সময় বলতে পারব যে ফেংমো বাড়িতে ইংরিজি শিখছে।
সাহেব বাড়িতে ঢোকাব? সবাই যে বলে সাহেবরা খুব সাংঘাতিক হয় আর মেয়েদের ওপর খুব লোভ ওদের।
উনিতো পাদ্রী। তিনি ওসব ধারনার উর্দ্ধে।
বেশ, লিনউঁয়ি যদি তেমন চায় তবে ফেংমোকে না হয় দূরে কোন স্কুলে পড়তেই পাঠাব।
সেই বেশ।
তাহলে তুই লিনউঁয়ির সঙ্গে কথা বল, আমিও ফেংমোর সঙ্গে কথা বলি।
বাইরের চাতালে চা ও কেক অপেক্ষা করছিল, দুই সখী বাইরে এলেন চায়ের টেবিলে। ক্ষমা চেয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বাড়ি যেতে চাইলেন। কারণ ফেংমোর সঙ্গে কথা বলার এটাই প্রশস্ত সময়।

বাড়ি ফিরে যাকে প্রথম দেখতে পেলেন তিনি হলেন লিটল সিস্টার সিয়া। হয়ত তিনিও সব কথা শুনেই এসেছেন। কাজেই বিষয়টি কৌশলে চাপা

দিলেন। তারপর তিনি পাদ্রীকে ফেংমোর ভাষা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করবার কথা বললেন। আরও বললেন যে যদি লিটল সিস্টার পাদ্রীকে এখানে আসতে অনুরোধ জানান তবে ভাল হয়।

চকিতে মুখ রাঙা হয়ে উঠল সিস্টার সিয়ার। তিনি বললেন, উনি তো অবিবাহিত। আমি যদি এখানে আসার কথা বলতে যাই তবে উনি কী ভাববেন।

আপনার সাধুতায় সবাই মুগ্ধ। কেউ কোন সন্দেহ করবে না।

ইং জলখাবার নিয়ে এসেছিল। জলখাবারের পরে অতিথিকে বিদায় দিলেন তিনি। যাবার সময়ে সিয়া কথা দিয়ে গেলেন যে তিনি যথাসাধ্য করবেন।

ইং যে রাত্রিবেলা বুলাংয়ের কান্না শুনেছিল, সে-কথাটা শ্রীমতী ওয়ায়ু সারাদিনের কাজের মধ্যেও ভোলেন নি। তবে এত বড় একান্নবর্তী পরিবারে একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না। সুশৃঙ্খল ভাবে একটার পর একটা বিষয় বা সমস্যার নিষ্পত্তি করতে হয়।

তিনি এরপর রান্নার ঠাকুরের খরচের হিসেব দেখতে চাইলেন। দুদিন দেরী হয়ে গেছে এসব ঝামেলায়। হিসেব দেখে জ্বালানী ঘাসের বেশী দাম সম্পর্কে মন্তব্য লিখে দিলেন। কথাটা মনে করে রেখেছিলেন তিনি। এরপরে দর্জি ও বাড়ি মেরামতের হিসেব দেখলেন। কাজ শেষ হলে ফেংমোকে ডেকে পাঠালেন। তারপর ইংকে বললেন, তোদের নতুন বৌদিকে আজ রাত্রে সবাইর সঙ্গে খেতে আসতে বলিস।

একটু পরেই স্কুলের ইউনিফর্ম পরে ফেংমো এল। সে ন্যাশানাল রিকন্-স্ট্রাকশন মিড্ল স্কুলের ছাত্র। মাকে ভালবাসে আবার ভয়ও করে। মনস্তত্ত্বে সূক্ষ্মজ্ঞানসম্পন্না শ্রীমতী ওয়ায়ু তাকে পাদ্রী সাহেবের কাছে ইংরিজি শিখতে বললেন সুকৌশলে। প্রথমটায় সে রাজী হল না। মা বললেন, আজকাল মেয়েরাও ইংরিজি-পড়া ছেলে না হলে পছন্দ করে না! তোমার বিয়ের কথা বলতে গিয়ে শুনলাম।

কোন মেয়ে সে? রেগে জিজ্ঞেস করল ফেংমো।

ওই যে তোর বড়বৌদির সেজ বোন, লিনউয়ি।

ওই মেয়েটা! ও যা অহঙ্কারী! ওর চাউনি পর্যন্ত দেখতে পারি না আমি। তবে মেয়েটা দেখতে বেশ।

আমাকে তবে বিলিতি স্কুলে পাঠিয়ে দাও।

না, তা না করে একজন পাদ্রীর কাছে বরং ইংরিজিতে বলা-কওয়াটা শিখে নে তুই। কিছু দিনের মধ্যেই মহাযুদ্ধ শুরু হবে। এরকম সময়ে দূরে পড়তে

যাওয়াটা ভাল হবে না।
তুমি কী করে এসব কথা বলতে পারো মা। বেশ আমি তবে পাদ্রীসাহেবের কাছেই পড়ব। কিন্তু একমাস পড়ে যদি ভাল না লাগে, তবে ছেড়ে দেব।
বেশ, এক মাসই দ্যাখ। আর শোন্, আজ রাত্রে আমরা সবাই একসঙ্গে খাব। চল খাবার-ঘরে যাই।
ফেংমোকে নিয়ে খাবার-ঘরে ঢুকে মেয়েদের টেবিলগুলির দিকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতম আসনটিতে বসে পড়লেন। ফেংমো পুরুষদের টেবিলগুলির একটায় গিয়ে বসল।
চিউমিং অন্যদের থেকে একটু সরে একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসেছিল। মাঝেমাঝে বাচ্চাটাকে মুখের সামনে তুলে নিজের মুখ আড়াল করে রাখছিল সে। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাকে এক পলক দেখে নিলেন। মেয়েটা গম্ভীর হয়ে আছে। নতুন পরিবেশে তা-ই হওয়া স্বাভাবিক। ও যে এখানে এসেছে এই যথেষ্ট। তাঁকে ঢুকতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাল। তিনি অনির্দিষ্টভাবে বললেন, বসে পড়ুন সবাই। মেং সবাইকে হাসিমুখে পরিবেশন করা তদারক করছিল। তিনি মেংকে বললেন, আমার হয়ে দিয়ে যাও বৌমা। সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। আমি বড় ক্লান্ত।
মেং স্বভাবসুন্দরী, সে হেসে হেসে দু-চার কথা বলছিল তার জা ও অন্যান্যদের সঙ্গে। চিউমিংকে লক্ষ করে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, ও ছোট বৌ, যা সবচেয়ে ভাল লাগে তাই নিও। মাছটা সাধারণত ভাল হয়।
একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল চিউমিং। উঠে দাঁড়িয়ে সে অভিবাদনের ভঙ্গীতে স্বল্প নোয়াল নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গ। বাচ্চাটা তার কোলেই ছিল। সে মৃদু স্বরে বলল, ঠিক আছে দিদি, ধন্যবাদ। ভৃত্য যখন তার সামনে এক বাটি ভাত দিয়ে গেল, সে প্রথমে বাচ্চাটাকে খাওয়াতে লাগল।
চিউমিংকে এভাবে সম্বোধন করে শ্রীমতী ওয়ায়ু পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে এ-বাড়িতে চিউমিং-এর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং বাড়ির সবাই এই আগন্তুককে যেন তাদেরই একজন বলে মেনে নেয়। তাঁর কথাগুলি সবাই শুনল। মুহূর্তের জন্য নিঝুম হয়ে গেল সমস্ত ভোজনাগার। তারপর হঠাৎ ভৃত্যরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে এবং আয়ারা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে সেই নীরবতা ভাঙল।
শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর নিজস্ব মার্জিত ও মন্থর ভঙ্গীতে খেতে আরম্ভ করলেন। লিয়াংমোর বাচ্চাটা তাঁর কোলে আসবার জন্য হাঁপাচ্ছিল, না পেরে শেষে কান্না জুড়ে দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে বাচ্চাটা তাঁর কাছেই আসতে চায় কিনা। মেং বলল, ও ভীষণ নোংরা হয়ে আছে, ওকে নেবেন না কোলে।

আহা, দাও মা, বলে মোটাসোটা বাচ্চাটাকে কোলে বসিয়ে তার মুখে ছোট এক টুকরো মাংস দিলেন, সে পরম পরিতোষের সঙ্গে মাংসের টুকরোটা চুষতে লাগল। নাতির কাণ্ড দেখে তিনি মৃদুমৃদু হাসছিলেন।

বাচ্চাটাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে বাবুজী।

তাঁর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্যরা তখনও খাচ্ছিলেন। তিনি অনুমতি নিয়ে উঠে পড়লেন। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু ও তাঁর ছেলেদের পাশ দিয়ে যাবার সময় আসনে অর্দ্ধোত্থিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাল, তিনিও তাঁদের প্রত্যাভিনন্দন জানালেন হেসে।

সেদিন রাত্রিতেও তাঁর প্রগাঢ় ঘুম হল। একবারও জাগলেন না সারা রাত্রিতে। চিউমিং-এর কাছে শ্রীমতী ওয়ায়ুর ওই আধঘণ্টার উপস্থিতি ছিল প্রায় বিবাহ অনুষ্ঠানের মত। রাত্রিটা তার দিশাহারা অবস্থায় কেটেছে। তাকে ওঁর মনে ধরল না, ধরে নি।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তার সঙ্গে একটিও কথা বলেন নি।

ভোরের আগেই তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেছেন।

সেই থেকে দুপুর অবধি একটানা ঘুমিয়েছে সে। সন্ধ্যের দিকে ইং এসে তাকে খাবার-ঘরে খেতে যাবার কথা বলে। তারপরই সে চটপট তৈরী হতে আরম্ভ করেন। একটু দেরীতেই খাবার ঘরে ঢোকে, ঢুকেই একটা বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়; একের পর এক মহিলারা তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যায়।

শ্রীমতী ওয়ায়ু ঘর ছেড়ে যাবার পর হঠাৎ সে দারুণ খিদে অনুভব করল এবং কোন রকমে অন্যদের থেকে মুখটা ঘুরিয়ে দুবাটি ভাত আর মাংস খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

খাওয়া হয়ে গেলে মেং এসে বলল, কাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব নতুন মা।

আমি তার যোগ্য নই। মৃদুস্বরে মেং-এর চোখের দিকে না তাকিয়ে সে বলল। মেং-এর কথা তাকে স্বস্তি ও শান্তি দিল। ভীরু ও নিঃসঙ্গ চোখ দুটি তুলে মেং-এর দিকে তাকাল।

খোকাকে নিয়ে আমি যাব কাল, মেং সেই চাউনী দেখে আবার বলল।

সেদিন রাত্রে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বেশ একটু তাড়াতাড়িই এলেন পিওনী-কুঞ্জে। চিউমিং তখনও শুতে যায় নি। বসে বসে নিজের জামার বাকী সেলাইগুলি শেষ করছিল। পায়ের শব্দ শুনতে পেল সেলাই করতে করতে। তিনি ঘরে ঢুকে বসলেন। সে দাঁড়িয়ে ছিল।

তুমি, তুমি যেন আমাকে মোটেই ভয় পেয়ো না, নাম ধরে তাকে না ডেকে তিনি এ-ভাবে বললেন।

সে কোন উত্তর দিল না। প্রস্তরপ্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে সেলাই-করা পোষাকটা হাতে ধরেই দাঁড়িয়ে রইল।

এ-বাড়ির, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু আবার শুরু করলেন, সবকিছু তোমাকে সুখী করার জন্যই। খোকার মার মনে খুব দয়ামায়া। এ-ছাড়া মেয়েরা আছে, আমার বৌমারা আছেন, অন্যান্য বৌমারাও আছেন। তোমাকে দেখে বেশ শান্ত স্বভাবের মেয়ে বলে মনে হয়, আর বেশ নম্র-ও তুমি। এ-বাড়িতে তুমি খুব সুখী হবে।

তখনও সে কোন উত্তর দিল না। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু কেশে গলাটা সাফ করে, কোমরের বেলটটা একটু আলগা করে নিলেন।

আমার জন্য তোমাকে গোটাকয়েক কথা মনে রাখতে হবে। যেমন ধরো আমি দেরীতে ঘুমোই। যদি এখানে ঘুমিয়ে পড়ি, তবে যেন আমাকে জাগিও না। হ্যাঁ, রাত্রিতে যদি ঘুম না আসে তবে চা দরকার হয় আমার, কিন্তু লাল চা নয়। আমার রক্তের তাপ বেশী, তাই শীতকালেও জোড়া লেপের নিচে শুতে পারি না। এইসব আর কী, আর বাকী যা-যা রইল তা নিজেই ক্রমে ক্রমে শিখে নেবে, কেমন তাই না? তার হাত থেকে পোষাকটা খসে পড়ল। লজ্জা ভুলে সে তাঁর দিকে তাকাল।

তাহলে—আমাকে রাখা হবে? সে প্রশ্ন করল। আকাশের নিচে এই পৃথিবীব কোনোখানে সে একটুখানি আশ্রয়ের ভিখারিনী—এই দীন ভাবটাই ফুটে উঠল তার গলার স্বরে।

নিশ্চয়ই, তোমাকে সে-কথাইতো বলেছিলাম, তিনি হাসলেন। কোন গহন গোপন উৎসের তাপ এসে যেন তাঁর মুখমণ্ডলে আলো ছড়িয়ে দিল। সে তা লক্ষ করল এবং বুঝতে পারল।

তবে আজ রাত্রিতে সে আর ভয় পাবে না।

স্থায়ী একটা আশ্রয়ের জন্য একজন দয়ালু মানুষকে যে-দাম এর বিনিময়ে দিতে হবে তা কত অকিঞ্চিৎকর!

কত কম, কত অল্প সেই দাম!

লিটল সিস্টার সিয়া কর্তব্যকর্মে বরাবরই নিষ্ঠাবতী, তবু তাঁর এতটা ক্ষিপ্রতা তিনি আশা করেন নি।

সাত আটদিন পরে একদিন ইং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে, আশ্চার্য চোখমুখ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে উপস্থিত হল, বৌদি ও বৌদি, চেঁচিয়ে

ডাকল সে।

আঁকিড়ের বাগানে শ্রীমতী ওয়ায়, বেড়াচ্ছিলেন, বিরক্ত হয়ে তিনি থামলেন।

ইং, বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মত তোর ওই হাঁ-মুখটা বন্ধ কর দেখি আগে, তারপর ধীরেসুস্থে বল কী হয়েছে, তিনি বললেন।

তালগাছের মত লাম্বা লোকটা—উঃ! কী লাম্বার লাম্বা—সায়েব একটা! সায়েবটা বলচে তুমি নাকি তাকে আসতি বলেচ।

আমি? অবাক হয়ে বললেন। তারপর কী মনে করে বললেন, হয়ত বলেছিলাম।

তুমি বৌদি আমাকে কোন খপর দাও নি। এদিকে আমি দারোয়ানকে বলে দিলাম সায়েবটাকে কিছুতেই যেন ভেতরে ঢুকতি না দেয়। এ-বাড়িতে সায়েব-সুবোদের কক্ষনো ঢুকতে দেখা হয় না বাপু।

তোকে আমি সবকিছু বলি না। যা এক্ষুনি তাকে নিয়ে আয় এখানে।

কিছুক্ষণ পরে গভীর মেঘমন্দ্র স্বরে উচ্চারিত হল 'মাদাম।'

এরকম একটি কণ্ঠস্বর তিনি আশা করতে পেরেছিলেন কিন্তু এই স্বরতরঙ্গ শুনতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আঁকিড়ের বাগান থেকে তিনি দীর্ঘকায় চওড়া কাঁধবিশিষ্ট মানুষটিকে দেখতে পেলেন। লম্বা বাদামী রংয়ের আলখাল্লাটা তাঁর কোমরের কাছে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেই পাদ্রীসাহেব। বুকের ওপর ঝোলানো একটা ক্রসকে ডানহাত দিয়ে মুঠো করে ধরে আছেন।

তিনি জানতেন যে ক্রসটা খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক। তাতে তাঁর আকর্ষণ নেই। বরং পাদ্রীসাহেবের সুবিশাল দেহ এবং যে শক্তিশালী হাত দিয়ে তিনি ক্রসটা ধরে আছেন, তা-ই তাঁকে আকর্ষণ করল বেশী।

আপনাকে কী বলে সম্বোধন করতে হবে তা আমার জানা নেই, কাজেই আপনাকে প্রত্যাভিনন্দন জানাতে পারছি না। ভেতরে চলুন।

পাদ্রীসাহেব তাঁর উন্নত মস্তক নোয়ালেন এবং চাতালের দিকে এগোলেন। পেছনে পেছনে আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে পাণ্ডুর মুখে ইং তাঁর অনুগমন করল।

লাইব্রেরী ঘরে বসবেন চলুন, বলে দরজার একপাশে তিনি সরে দাঁড়ালেন আগন্তুককে ঢুকতে দেবার জন্য।

পাদ্রী সাহেব থেমে গিয়ে বললেন, আমাদের দেশাচার অনুযায়ী মহিলাদেরই প্রথম প্রবেশ করার অধিকার।

তাই কী, তবে এটা ঠিক যে, আমার পরিচিত পথে আমারই পথ দেখানো উচিত।

তিনি ভেতরে ঢুকে সামনের চেয়ারে আগন্তুককে বসতে ইঙ্গিত করলেন।
ইং দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখছিল।
বেরিয়ে আয় ইং, বলে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, এই বোকা মেয়েটা কখনো আপনার মত বিরাট চেহারার মানুষ দেখে নি; তাই ও আপনার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। দয়া করে ওর দোষ নেবেন না।
পাদ্রীসাহেব বললেন, এদের আমোদের জন্যই হয়ত ঈশ্বর আমাকে এই বিরাট শরীরটা দিয়েছেন। তাঁর ভরাট গলা সারা ঘরে গমগম করতে লাগল।
উঃ মাগো! ই যেন একেবারে বাজ পড়ার শব্দ বটে! কড়ি-বরগার দিকে তাকিয়ে ইং বলল।
ইং যাতো, গরম চা নিয়ে আয়, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। ইং বিড়ালীর মত দ্রুত চলে গেল।
পাদ্রীসাহেব স্থির হয়ে বসেছিলেন। তাঁর বিশাল দেহে চেয়ারের গহ্বর পুরোপুরি ভরে গিয়েছিল। গায়ের রং তামাটে, চক্ষু কোটরের মধ্যে। বড় বড় কালো চোখ খুব পরিষ্কার ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। মাথার চুল লম্বাও না, আবার ছোটও না। অল্প ঢেউ খেলানো। গালে মসৃণ কালো রংয়ের দাড়ি। কালো দাড়ির মধ্যে ঠোঁট অস্বাভাবিক রকম টুকটুকে।
কী বলে ডাকব আপনাকে? লিটল সিসটার সিমার কাছ থেকে আপনার নামটা জেনে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
আমার নিজের কোন নাম নেই। পাদ্রীসাহেব উত্তর দিলেন। আমাকে যে নামটা দেওয়া হয়েছে, তা হল আঁদ্রে। যে-কোন নামেরই সামিল এটা। কেউ আমাকে ফাদার আঁদ্রে বলে ডাকেন। আপনার ক্ষেত্রে আমাকে ব্রাদার আঁদ্রে, মানে আঁদ্রে ভাইসাহেব বলে ডাকবেন।
কোন মতামত না দিয়ে বা পদবী উল্লেখ না করে তিনি আরেকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন ধর্মাবলম্বী?
ধর্মের কথা আজ থাক। ভাইসাহেব উত্তর দিলেন।
তাঁর কথায় মৃদু হেসে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, আমি ভেবেছিলাম পাদ্রীমাত্রেই তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে চান।
ভাইসাহেব পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর চাউনিতে শক্তি ছিল কিন্তু সাহস ছিল না। তাই শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর চাউনিতে চমকে উঠলেন না। অচেনা পথে কাউকে পথ দেখাবার জন্য যেমন আলো উঁচু করে ধরা হয়, সেই আলোর মতই নৈর্ব্যক্তিক ওই চোখের চাউনি।
আমি শুনেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

হ্যাঁ. তাই বলছি কিন্তু বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। দরজার বাইরে শিশুরা ভীড় করেছে। ইং-এর মুখ থেকে সারা বাড়িতে বিশালকায় লোকটির খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে। তিনি ওদের ডাকলেন, ভেতরে আয় সব তোরা। দরজার কাছে উঁকি দিল বাচ্চারা। ভাইসাহেব হাসিমুখে ওদের দিকে তাকালেন। ভাইসাহেবকে হাসতে দেখে ওরা গুটিগুটি এগিয়ে এল কাছে। ওরা আপনাকে দেখতে এসেছে। শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বললেন। বাচ্চাদের দিকে ফিরে বললেন. ভয় নেই, উনি বাচ্চাদের গিলে খান না; উনি বৌদ্ধদের মত ফল আর শাকসব্জী খান।

ঠিক কথা, ভাইসাহেব সমর্থন করলেন।

তুমি এত বিরাট কেন, একটি শিশু দম চেপে প্রশ্ন করল।

ভগবান আমাকে এ-ভাবে গড়েছেন, ভাইসাহেব বললেন।

আমার মনে হয় আপনার বাবা-মাও বেশ বিশালকায় ছিলেন, শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বললেন।

বাবা মাকে আমার মনে পড়ে না। ধীর ভাবে ভাইসাহেব বললেন।

আপনার দেশ কোথায়? স্কুলে পড়ে, এমন একটি বালক জিজ্ঞেস করল।

আমার নিজের কোন দেশ নেই। আমি যখন যেখানে থাকি সেখানেই আমার দেশ, ঘর-বাড়ি।

এ-দেশে আপনি অনেকদিন আছেন? আমাদের ভাষায় বেশ দখল এসেছে আপনার, শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বললেন।

আমি অনেক ভাষায় কথা বলি! যাতে সব ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি

আমাদের এ-শহরে আপনি অনেকদিন আছেন, তাই না? লোকটিকে জানাবার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল শ্রীমতী ওয়ায়্‌র।

মাত্র এক বছর যাবৎ, তিনি উত্তর দিলেন।

ইং এসে বাচ্চাদের বলল, তোমাদের মায়েরা তোমাদের সক্কলকে ডাকছে বাছারা, যাও যাও।

শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বললেন, হ্যাঁ এবারে যাও তোমরা।

বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

আপনার কথা ওরা বেশ শোনে তো, ভাইসাহেব বললেন।

ওরা খুব ভাল।

আপনিও ভাল···তবে আমি নিশ্চিত নই যে আপনি সুখী কিনা! শান্তভাবে উচ্চারিত ভাইসাহেবের কথাগুলি গুপ্তছুরির মত তাঁকে বিদ্ধ করল কিন্তু কোথায় তা বিদ্ধ হল তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তিনি অস্বীকার

করতে শুরু করলেন।

কী বলছেন আপনি··আমি বরং পরিপূর্ণ ভাবে সুখী। নিজের ইচ্ছেমত আমি আমার জীবনকে রূপায়িত করেছি। আমার সন্তান আছে—

ভাইসাহেব তাঁর গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন শুধু। কোন কথা বললেন না। এই নীরব ও পূর্ণ মনোযোগের জন্য তাঁর কথা জড়িয়ে গেল, তিনি থেমে থেমে বললেন, তাইতো, আমি পরিপূর্ণ সুখী। আমি কেবল অনেক জ্ঞান চাই তবে কোন ধরনের জ্ঞান তা আমি জানি না।

হয়ত বেশী জ্ঞান নয়, বরং যে জ্ঞান আপনার আছে তার সম্যক উপলব্ধিই আপনার বেশী দরকার, ভাইসাহেব বললেন—

নিজের জন্য আপনাকে ডাকি নি, ডেকেছি সেজ ছেলের জন্য। ওকে আমরা একটা বিদেশী ভাষা শেখাতে চাই।

কোন ভাষা?

কোনটা সবচেয়ে ভাল?

ফরাসী ভাষা খুব সুন্দর, ইতালীয়ান ভাষা খুব কাব্যময়, রুশ ভাষা খুব শক্তিশালী, জর্মনভাষা খুব মজবুত। তবে অন্য কোন ভাষার চেয়ে ইংরিজি ভাষার মাধ্যমেই বেশীর ভাগ কাজকর্ম হয় আজকাল।

তাহলে ওর ইংরিজি ভাষা শেখাই ভাল। আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে?

আমি কোন পারিশ্রমিক নেই না। আমার অর্থের প্রয়োজন নেই।

অর্থের প্রয়োজন নেই এমন এক পাদ্রী, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক একটি মৃদুহাসি তাঁর মুখে দেখা দিল।

ভাইসাহেব আবার বললেন, আমার অর্থের প্রয়োজন নেই।

এতে আপনি আমাকে অধমর্ণ করে রাখছেন, কিছু না নিয়েই আপনি কিছু দিচ্ছেন। বেশ আপনাদের ধর্মের কাজে আমি তবে কিছু দেব। ভাইসাহেব বললেন না। ধর্মের সঙ্গে দানকে না জড়ানোই ভাল। তবে ভবিষ্যতে আমার এ-শহরে একটা অনাথ আশ্রম খোলার ইচ্ছে আছে, তখন দরকার হলে আপনার সাহায্য নেব। তাই হবে আমার পুরস্কার।

এ শহরের জিনিষ আপনার কী করে হবে? আপনার জন্য কি আমি কিছুই করতে পারি না?

সেটাও আমারই জন্য করা হবে, ভাইসাহেব বললেন।

এরপর শ্রীমতী ওয়াযু ফেংমোকে ডাকতে পাঠালেন।

ফেংমো এলে আলাপ করিয়ে দিলেন ভাইসাহেবের সঙ্গে।

ফেংমো, তোমার মা চান যে আমি তোমাকে ইংরিজি শেখাই, ভাইসাহেব

বললেন।
হ্যাঁ, কেবল ভাষাটা, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
হ্যাঁ, কেবল ভাষাটা। আপনার ভয় নেই মাদাম। আমি ভদ্রলোক ; আপনার ছেলের মন আমার কাছে পবিত্র !
বেশ তাহলে পড়ান।

ভাইসাহেব চলে গেলে তিনি ফেংমোকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কী শিখল ? ফেংমো কতগুলি ধ্বনিমণ্ডিত শব্দ উচ্চারণ করল। শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন, কথাগুলির অর্থ কী।
ফেংমো মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না, উনি আমাকে বলেন নি। কাল যেন উনি অবশ্য বলে যান। আমরা কেউ যে-সব কথা বুঝতে পারি না, সেসব কথা এ-বাড়িতে উচ্চারিত হক, তা আমি বরদাস্ত করব না, শ্রীমতী ওয়ায়ু কিছুটা কঠোর ভাবে বললেন।
একজন পাদ্রীসাহেব এসে ফেংমোকে ইংরিজি শেখাচ্ছেন—এই কথাটা সারা বাড়িতে রটে গিয়েছিল। কথাটা শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর কানেও উঠল। পরদিন অপরাহ্নে শ্রীমতী ওয়ায়ু যখন মেয়ে-দর্জিকে রেশমী কাপড়ের রং মিলিয়ে দিচ্ছিলেন বাচ্চাদের জুতো তৈরী করার জন্য, তখন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে তিনি আসতে দেখলেন। তাঁকে বিরক্ত দেখাচ্ছিল। কাপড়টা সরিয়ে রেখে তিনি মেয়ে-দর্জিকে দু-এক ঘণ্টা বাদে আবার আসতে বললেন।
দর্জি চলে গেলে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বসে পাইপ ধরালেন। তারপর বললেন, শুনলাম আমাকে না জানিয়ে তুমি ফেংমোর জন্য একজন সাহেব মাস্টার রেখেছ ? সত্যি তোমাকে বলা উচিত ছিল। এটা আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। তবে আমার মনে হয়েছিল যে, এ নিয়ে তোমাকে বিব্রত করাটা ঠিক হবে না এখন। তাছাড়া আমি চেয়েছিলাম যেন লিনউয়ির দিকেই ওর মন ঘুরে যায়।
কেন ? শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু জানতে চাইলেন।
শ্রীমতী ওয়ায়ু দীর্ঘ দিন আগেই বুঝেছিলেন যে নারী-পুরুষের মধ্যে সত্যের মত প্রয়োজনীয় আর কিছুই নেই। স্বামীকে তিনি কখনও প্রতারিত করেন নি। এখনও করলেন না। তিনি বললেন, চিউমিং যখন এই মহলে ছিল, তখন ঘটনাচক্রে ফেংমো ওকে দেখে ফেলে। আমার মনে হয় না, ওদের মধ্যে কোন আগুন জ্বলে উঠেছে এর ফলে তবে ফেংমো এখন যৌবনে পা দিয়েছে, এ-বয়েসে কোন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে এ-রকম হঠাৎ দেখার ফলে ছেলেদের রক্তে আগুন ধরে যেতেও পারে। কাজেই সেই আগুনকে হাওয়া দিয়ে আমি অন্যদিকে বইয়ে দিচ্ছি। বাড়ীতে কোন ঝঞ্ঝাট এলে ভারি

বিড়ম্বনা হবে।

সত্য-ভাষণ শোনার পর শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর যথারীতি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মাথার চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘামের ফোঁটা জমে উঠেছিল। তিনি বললেন, এত সহজে এসব কথা ভেবে নেওয়া উচিত না তোমার! তুমি সব সময়েই মেয়ে-পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় মিলিয়ে দিতে চাও। সব পুরুষমানুষ সম্পর্কেই তুমি খুব নিচু ধারনা পোষণ কর, সেটা আমি অনুভব করতে পারি। এমন কি আমার মনে হয় যে আমাকেও তুমি একটা বুড়ো ছাগল বানিয়ে ছেড়েছ।

যদি আমার জন্য তোমার ও-রকম মনে হয়ে থাকে তবে আমি নিশ্চয়ই একটা বিচ্ছিরি মেয়েমানুষ; আর সেজন্য তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত, তিনি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট স্বরে বললেন।

এমন মহিমান্বিত ভঙ্গীতে তিনি বসেছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর থেকে অনেক দূরে কোথায়ও আছেন, যেন তিনি এই ঘরে নেই। অনেক দিন আগে তিনি শিখেছিলেন যে প্রতিরোধ করার চেয়ে নতিস্বীকার করেই বিজয়িনী হওয়া যায় এবং তাড়াতাড়ি কোন দোষ স্বীকার করে নিলে পরেই এক অপরাজিত ন্যায়পরায়ণ চরিত্র হিসেবে নিজেকে দেখানো যায়।

তবুও স্বামীকে মর্মাহত দেখে মনে মনে তিনি নিজেকে ধিক্কার দিলেন—কেন যে তাঁর স্বামীকে আহত করার মত বোকামির কাজ তিনি করতে গিয়েছিলেন! মনোহর হাসি হেসে তিনি বললেন, আজ তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা যদি তুমি দেখতে পেতে। মনে হচ্ছে, তোমাকে কখনো এত সুন্দর দেখি নি। কয়েকদিন আগেও তোমাকে যেমন দেখেছি, তার চেয়ে আজ যেন দশ বছর বয়েস কমে গেছে তোমার।

তাঁর স্বামীর মুখ আরক্ত হল, তিনি হেসে বললেন, সত্যি বলছ, সেরকম দেখাচ্ছে?

শ্রীমতী ওয়ায়ুর চোখের কোমল দৃষ্টি লক্ষ করলেন তিনি; টেবিলের ওধার থেকে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লেন, আইলীয়েন আজও তোমার মত কেউ নেই। তোমার তুলনা তুমিই, আবেগভরে বললেন তিনি।

আবার বললেন, তোমার পরে সব মেয়েমানুষকেই স্বাদহীন লাগে। যা আমি করেছি, তা শুধু তুমি জোর দিয়েছিলে বলেই হয়েছে।

আমি তা জানি। ওগো তোমাকে সেজন্য ধন্যবাদ। আমাদের জীবনে আমি যা চেয়েছি, তুমি তাই করেছ।

আবেগে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তিনি বললেন, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি। পকেটে হাত দিয়ে টিসু কাগজের একটা মোড়ক বের করে, কাগজগুলি সরিয়ে দিয়ে একটা জড়োয়া চুলের ক্লিপ বের করলেন—জেড

পাথর আর মুক্তো বসানো একটা সোনার প্রজাপতি। গতকাল এই চুলের ক্লিপটা দেখে তোমার কথা মনে পড়ল। তোমাকেই তো মনে পড়ে সব সময়। এমন কি রাত্রেও। বলে তিনি তাঁর কপালে জমে-ওঠা ঘামের ফোঁটাগুলি মুছে নিলেন।

এতে তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রাত্রিবেলা কেন আমার কথা ভাবো। চিউমিং-এর জন্য নিষ্ঠা থাকা উচিত তোমার। এখন থেকে তোমার ওপরইতো সে নির্ভরশীল।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে আগের মতই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

চিউমিংকে তোমার ভাল লাগে না? মধুর স্বরে শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন। না, না, ওতো ভালই। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন কিন্তু তুমি, তুমি কেন আমার কাছ থেকে এত দূরে সরে যাচ্ছ আজকাল। বাকী জীবনটা কি আমরা আলাদা থেকেই কাটাব? যে তুমি—সবসময় আমার জীবনের মধ্যে ফুটে ছিলে। তাঁর তলার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু এত বিচলিত হয়েছিলেন যে, নিজের অজ্ঞাতেই কখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর স্বামী তাঁর বাহু ধরে কাছে টেনে নিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ুর সত্তার গভীরে কী যেন কেঁপে উঠল। তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। স্বামীকে নয়, নিজেকেই তিনি ভয় পেলেন। এই মুহূর্তের দুর্বলতা কি তাঁর এতসব উদ্যমকে পরাভূত করে দেবে?

তুমি···আঃ, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম। আমার জেডপাথর, আমার চন্দনের বন, ধূপের সুরভি, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর কণ্ঠ গুঞ্জিত হচ্ছিল।

তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে স্বামীর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিলেন, শুধু তাঁদের হাত ধরাধরি হয়ে রইল। স্বামীকে বললেন, তুমি আগের চেয়ে অনেক বেশী সুখী হবে!

তুমি কি তবে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে?

নতুন রূপে আসব, তিনি কথা দিলেন। মুহূর্তটা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর মুখ দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর ঠোঁটের উদগ্রীব আকুলতা শিথিল হয়ে এসেছে দেখে তাঁর নিজের শরীর ঠাণ্ডা পাথরের মত হয়ে এল। হাত ছাড়িয়ে নিলেন তিনি।

ফেংমোর ব্যাপারে অযথা উদ্বিগ্ন হয়ো না! লিনউয়ি চায় ও যেন ইংরিজি বলতে পারে, তাই মাস্টার রাখা। মেয়েটার মতে আমাদের ছেলে সেকেলে। দেখো, একমাসের মধ্যেই ও লিনউয়িকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে। হয় কিনা দেখো!

তুমি তো ষড়যন্ত্রী, পুরুষমানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করো, তাদের নিয়ে ষড়যন্ত্র করো, হেসে বললেন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু। তিনি আবার তাঁর উৎফুল্ল ভাবটা ফিরে পেয়েছেন। হাসতে হাসতে চলে গেলেন তিনি।

ইং শোন; চিউমিংকে এক্ষুনি আমার সুগন্ধি সাবান কয়েকটা দিয়ে বলে আয়, যেন এ-ছাড়া অন্য সাবান ও ব্যবহার না করে।

ইং বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

নে, ওভাবে আর তাকিয়ে থাকতে হবে না, এখনও অনেক কিছু করতে হবে তোকে। আমার চন্দনকাঠের একটা চিরুণীও দিয়ে আসবি চুল আঁচড়াবার জন্য আর আমার চন্দনের গুঁড়োও খানিকটা দিয়ে বলবি ভেতরের জামার মধ্যে যেন ছড়িয়ে নেয়।

যা বলবে। বিরক্ত হয়ে ইং বলল।

এই সময়ে টেবিলের ওপর শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর পাইপটা নজরে পড়ল তাঁর। যাবার সময় পাইপটা ছোট টেবিলটার ওপর ফেলে গেছেন তিনি। শ্রীমতী ওয়ায়ু এই পাইপ ফেলে যাওয়ার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন। নারী-পুরুষের মধ্যে খুব পুরোনো ও প্রচলিত সঙ্কেত। এই সঙ্কেতের অর্থ পুনরাগমন।

তিনি ইংকে পাইপটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বললেন।

কোন কথা না বলে ইং পাইপটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাচ্চাদের জুতোর জন্য রেশমী কাপড়ের রং বাছাই করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে এল। একটা মোমবাতি জ্বালবেন এমন সময় ফেংমো ঘরে ঢুকল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাল যে ইংরিজি শব্দগুলি শিখেছিস সেগুলি মনে আছে তোমার? ফেংমোর হাতে দাদাদের মত জ্বলন্ত বিলিতি সিগারেট।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন কথাগুলির মানে বুঝতে পেরেছ?

সে মাথা নাড়ল।

আঁদ্রে ভাইসাহেবের চামড়ার জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। ভাইসাহেব ঘরে ঢুকলে শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার খাওয়া হয়েছে?

আমি শুধু দুপুরবেলা খাই। লাজুক হাসি হেসে ভাইসাহেব বললেন।

কাল আপনি যে বিদেশী শব্দগুলি বলে গেছেন ফেংমো সেগুলি আবৃত্তি করছিল। আমরা কিন্তু মোটেই বুঝতে পারি নি ওর অর্থ।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বসে বললেন। ভাইসাহেবও বসলেন। তারপর বললেন, ইংল্যাণ্ডের একজন মানুষ কথাগুলি রচনা করেছেন। মানে, মানুষটির জন্ম জীবন ও মৃত্যু সবই ইংল্যাণ্ডে, তবু তাঁর মন ছিল সর্বত্রগামী।

একটু সময় চুপ করে থেকে তিনি ছন্দোবদ্ধ কথাগুলি তর্জমা করে দিলেন।

বী ভাবো ? তোমার ওই পূবখোলা জানালাতে শুধু
আলো এসে করাঘাত করে ভোরবেলা ?
সম্মুখে ওঠেন সূর্য ধীর রথে, মন্থর উদ্ভাসে !
অথচ পশ্চিমে দ্যাখো, সেখানেও ঝলসায় কী উজ্জ্বল আলো !

যেন পরিশ্রুত জল পান করছেন, এ-ভাবে শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর পুত্রের সঙ্গে প্রতিটি শব্দ পান করলেন।

এ কি ধর্মসংক্রান্ত কথা নয় ? সন্দিগ্ধভাবে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

আমি যে শব্দগুলি দিয়ে প্রথম ইংরিজি শেখা শুরু করেছি, সেই কথাগুলিই ওকে শিখিয়েছি। ইতালী দেশে আমার ছোটবেলায় যখন শব্দগুলি আমাকে শেখানো হয়েছিল, তখন আমিও প্রথম ওর অর্থ বুঝতে পারি নি, ভাইসাহেব বললেন।

তাহলে এই এক সূর্যই সারাজগৎকে আলো দিচ্ছেন, কৌতুকের স্বরে বলে শ্রীমতী ওয়ায়ু হাসলেন। আমার সর্বদাই ধারণা ছিল, যে, সূর্য কেবল আমাদের একার।

সূর্য আমাদের সবাইর এবং তারই আলো আমরা প্রতিফলিত করে চলি একে অপরের ওপর। পূবে পশ্চিমে, উদয়-দিগন্তে, অস্তরাগের দিকচক্রবালে এর পূরবীতে ওর বিভাসে। ভাইসাহেব বললেন। ঘরের চার দেয়াল যেন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। চাতাল ঘেরা ওই পাঁচীল, যার এ-পাশে তিনি এতদিনের জীবন কাটিয়েছেন তা যেন পেছনে সরে গেল। স্বর্গের নিচে বিপুলা এ পৃথিবী জুড়ে কত বিচিত্র দেশ, নাম-না-জানা, কত মানুষ আর সাত সাগরের জলে একই জোয়ার-ভাটা নিরবধি কাল ধরে বয়ে চলেছে !

পরের পাঠ শোনার জন্য তাঁর থেকে যেতে ইচ্ছে করছিল। ফেংমোর অশান্তি হবে ভেবে আর থাকলেন না। উঠে পড়ে বললেন, আপনি ওকে পড়ান ভাইসাহেব।

তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

একদিন বিকেলবেলা শ্রীমতী ক্যাং বেড়াতে এলেন এ-বাড়ি।

কীরে, ফেংমো এখন ইংরিজি শিখছে শুনে লিনউয়ি কী বলে রে, শ্রীমতী ক্যাংকে জিজ্ঞেস করলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

যদিও বছরে মাত্র কয়েকদিন শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর বাড়িতে যেতেন, আর তিনি সপ্তাহে দু'তিনবার তাঁর কাছে আসতেন, তবু এনিয়ে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। এমনই ছিল তাঁদের বন্ধুত্বের গভীরতা। যাওয়া-আসার এই অসমতা ছিল নিতান্ত বাইরের ব্যাপার এবং তুচ্ছ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা দু'জনে

এটা গ্রহণ করেছিলেন।

জানিস রে, আমি তো মেয়ের কথা শুনে হাঁ! ও বলে কি জানিস, ফেংমো ভাল করে ইংরিজি শেখার পর, কয়েকবার ওর সঙ্গে কথা বলে যদি ওকে পছন্দ হয়, তবেই নাকি মহারানী ওর গলায় মালা দেবেন! বিয়ের আগেই দেখতে চাওয়া! কীরে লজ্জাশরম কিছুই নেই! আমার বিয়ের আগে একবার নববর্ষের দিন ওর বাবা শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আর একটা ঝি দুষ্টুমি করে, দেখতে বলেছিল ওঁকে। জাফরি-কাটা একটা জানালা দিয়ে আমিও ওঁকে দেখেছিলাম। আমাদের বিয়ে হল, প্রথম সন্তান হল তারও পর ওঁকে একথা বলার সাহস হয়েছিল আমার। ততদিন ধরে একটা অপরাধের বোঝার মত ঘটনাটা আমার ওপর চেপে ছিল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু খিল খিল করে হেসে উঠলেন খুশিতে। আর সেই এক দেখাতেই যা সর্বনাশ হবার, নিঃসন্দেহে, তা হয়ে গিয়েছিল।

ওই মুহূর্তের দেখাতেই মানুষটাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম আমি। এখন একটুও লজ্জা না পেয়ে শ্রীমতী ক্যাং বললেন।

আহা, কী দুর্লভ ওই মুহূর্তগুলি। দ্যাখ, ওই মুহূর্তগুলির জন্য তৈরী হওয়াটা কত দরকার। তরুণদের মন আগুন ধরার খুব অনুকূল। পুরুষ জ্বলে, মেয়েরা জ্বালায়। তবে আমাদের এ দুটির মধ্যে একবার বা কয়েকবার দেখা করানো যায় কীভাবে?

বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুই সখী বসে বসে আলোচনা করছিলেন। কাছের ছোট একটা টেবিলে ইং তরমুজ কেটে দিয়ে গিয়েছিল। হলদে তরমুজ, ভেতরে চকচকে কালো কালো বীচি, ভেজা-ভেজা ও মিষ্টি। সেদিকে দেখিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, একটু তরমুজ খেয়ে নে ভাই। তোকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এটা খেলে ভাল লাগবে।

সখীর দরদী কথা শুনে শ্রীমতী ক্যাংয়ের গোলগাল মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটল। তিনি লেসতোলা একটা রেশমী রুমাল বের করে মুখ ঢাকলেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ধারেকাছে কেউ ছিল না। অঝোরে কেঁদে চললেন তিনি। কীরে মিচেন, কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন? হাত দিয়ে রুমালটা সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

এত লজ্জা করছে আমার যে তোকে কী বলব আইলীসেন। তুই নিজে নিজে বুঝে নে। না, তবে তা না. তোর—শ্রীমতী ওয়ায়ু কঠোরভাবে জোর দিয়ে বললেন।

হ্যাঁ রে, তাই, শ্রীমতী ক্যাংয়ের উজ্জ্বল চোখদুটি করুণ দেখাচ্ছিল।

তোর এই বয়েস! অনেক ছেলেপুলের মা হয়ে এখন···শ্রীমতী ওয়ায়ু

বললেন।

আমি সেইজাতের মেয়েমানুষ, যার বিছানার কাছে স্বামী যদি জুতো ছেড়েও যান তাতেও আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ি, শ্রীমতী ক্যাং আক্ষেপ করলেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখে কোন উত্তর জোগাল না ; তিনি তাঁকে মুখফুটে বলতে পারলেন না যে তাঁর নিজের উদাহরণ গ্রহণ না করার জন্যই এই বিপত্তি ঘটেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা কী জানিস, অন্য কাউকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। যত অসুবিধা ওই লিনউয়িকে নিয়ে। লিনউয়ির এত কথা। সবসময়ে তো বলেই চলেছে, মা তুমি এত মোটা কেন, সিঁথি পালটে চুল আঁচড়াও, আমি যে বই পড়তে পারি না সেটা নাকি ভারি লজ্জাকর, আমাদের বাড়িটা নোংরা, গাণ্ডেপিণ্ডে গুচ্ছের বাচ্চাকাচ্চা। যদি লিনউয়ি আমার কাছে থাকে আর ওকে আমায় বলতে হয় এ-কথা—

লিনউয়িকে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসতে হবে। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। তুই ওকে শেখাতে পারিস। আমার মনে হয় তোকে ও ভয় করে। বাবা মা কাউকেই ও ভয় পায় না। স্বামীর কথা উঠতেই হেসে চোখের জল মুছে শ্রীমতী ক্যাং বললেন, বেচারা ভদ্রলোক! আজ সকালবেলা কথাটা তাঁকে বলতেই তিনি দু-হাত দিয়ে চেয়ার টেনে তুলে বললেন—তবে অন্য কোন শহরে গিয়ে আমি একাই ব্যবসা করি গিয়ে।

বন্ধুকে নীরব দেখে তিনি বললেন, এক হিসেবে তুই ভাগ্যবতী আইলীয়েন, কারণ তুইতো আর তোর স্বামীকে ভালবাসিস না।

কথাগুলি তাঁর মর্মে বিদ্ধ হল। তাঁর এই পুরোনো বন্ধুটির কাছ থেকে তিনি কখনো বুদ্ধির প্রখরতা আশা করতেন না। তিনি বললেন, আসলে তফাৎটা হচ্ছে আত্মসংযমের, ভালবাসার নয়। এক টুকরো সোনালী তরবুজ হাতে তুলে নিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, অথবা হয়ত এ-রকম হবে যে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করা হক, তা আমি কখনো সহ্য করতে চাই নি। মোটের ওপর আমার চেয়ে তোর সহ্য করার শক্তিটা বেশী।

আমার সঙ্গে তুই ঝগড়া করিস না। শ্রীমতী ক্যাং তাঁর হৃষ্টপুষ্ট হাত দিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ুর ঠাণ্ডা ও ক্ষীণ করতল ধরলেন। তারপর বললেন, জানিস আইলীয়েন, তোর আর আমার একই সমস্যা। আমার মনে হয় সব মেয়ে-মানুষেরই এই সমস্যা আছে। একভাবে তুই এর সমাধান করেছিস, আমি আরেক ভাবে।

কিন্তু তোরটা কি কোন সমাধান? বলতে বলতে বন্ধুর জন্য দরদে তাঁর মন ভরে উঠল ; তিনি তাঁর ক্ষীণ করাঙ্গুলি দিয়ে বন্ধুর স্থূল আঙুলগুলি

বেষ্টন করলেন।
তুই যা করেছিস—তা আমি সইতে পারতাম না। হয়ত তুই বুদ্ধিমতী কিন্তু তাঁর ও আমার, আমাদের দু'জনের মাঝখানে তৃতীয়া কাউকে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারটা শুধু বুদ্ধি দিয়ে করতে পারি না আমি।
হঠাৎ ভাইসাহেবকে আসতে দেখলেন। শ্রীমতী ক্যাংয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভাইসাহেবকে। ভাইসাহেব নমস্কার করে লাইব্রেরী ঘরে চলে গেলেন। তারপর শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, তাহলে ফেংমোর সঙ্গে কথা বলে একদিন ওকে তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। কেমন?
শ্রীমতী ক্যাং মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

সেদিন ভাইসাহেব চলে গেলে তিনি ফেংমোকে থাকতে বললেন। সুকৌশলে আধুনিকতার প্রতি কটাক্ষ করে বললেন, লিনউয়ি যে তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তখন তিনি না হয় সেখানে উপস্থিত থাকবেন। যেরকম আশা করা গিয়েছিল, সেভাবেই ফেংমো এতে আপত্তি করল। সে বড় হয়েছে, একাই যাবে ফেংমোর সঙ্গে দেখা করতে।
এরপর শ্রীমতী ক্যাং একদিন এলেন। ফেংমো আর লিনউয়ির প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। দুই সখীতে মিলে হেসে কুটপাট হলেন।
শ্রীমতী ক্যাং বলছিলেন, কী আর বলব তোকে! আমি একাই ওদের কাণ্ড দেখে হাসছিলাম আর কাঁদছিলাম, উঃ কী কাণ্ড! ওরা তো বলল যে আমি সেখানে যেন না থাকি। আমিও ভালমানুষের মত বলে এলাম। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে দেখি দুটিতে যেমন চুপচাপ বসে ছিল, সেভাবেই বসে আছে। দুজনের দিকে দুজনে তাকিয়ে। কোন নড়াচড়াও করে নি দুজনে। শেষমেষ উঠে পড়ে শ্রীমান শ্রীমতীকে বললেন, আবার দেখা হবে। শ্রীমতীও তাই বললেন। বাস। আর কিছু না।
ওই মামুলী কথাগুলি শুধু, শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন। আচ্ছা বেশ, তিনি আবার বললেন, এখন এর ফলে কী সর্বনাশটা হতে পারে?
আর হাসাস না বোন। ওদের দেখে এত ভাল লাগল—সামনে যে ঝঞ্ঝাট রয়েছে তা আর বলতে ইচ্ছে করল না। ছোটদের কাছে সত্যি কথা বলতে সাহস হয় না।
তবে বিয়েটা শিগগীরই হয়ে যাক, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
শুভস্য শ্রীঘ্রম্। পাত্রের মধ্যে কিছু না দিয়ে খালি পাত্র উনুনে বসানোটা খারাপ। ওতে পাত্রটাই পুড়ে খাক্ হয়ে যায়, তাই না বল?

ফেংমো সেদিন সন্ধোবেলা তার মার সঙ্গে দেখা করল না। ভাইসাহেব এলে সে তাঁকে কতগুলি শব্দের ইংরিজি প্রতিশব্দ জিজ্ঞেস করছিল। সে একটা চিঠি লিখবে। লিনউয়ি সেগুলি বুঝতে পারবে।
অন্ধকারে একাএকা হেসে উঠলেন শ্রীমতী ওয়াংু।
এত সহজে বিজয়িনী হবার জন্য ভাইসাহেবের সামনে দাঁড়াতে তাঁর লজ্জা করছিল। তবু সেরাত্রে তিনি আবার ভাইসাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং গভীর অনন্দে সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বছরের নবম মাসের শেষদিকে এক মনোরম দিনে, লিনউয়ি বধূবেশে ওয়ায়ু বাড়িতে এল। এই সময়টা বিয়ের পক্ষে ভাল। ফসল কাটার মরশুম। গ্রীষ্মের তাপ অপগত হয়েছে, অথচ শরৎ এখনও আসে নি।
একটি আনন্দকে ঘিরে দুটি পরিবার একত্র হয়েছে। বিশেষ করে লিয়াংমো ও মেং খুবই খুশি। মেং-এর ছোট্ট শরীরটা মাতৃত্বের গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন বর-বধূ সেকেলে যুগের তিনদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া হৈ-হুল্লোড়ের বিরোধী। অধৈর্য দম্পতি এত দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠান মেনে নিতে পারে নি। আধুনিক যুগের সংক্ষিপ্ত বিবাহ। গুরুজনদের সামনে বর-কনের পারস্পরিক শপথ ও অঙ্গীকারই যথেষ্ট। তবে শহরের লোকদের ভোজ যাতে মাটি না হয়, সেজন শ্রীমতী ওয়ায়ু একটা রেস্তোরাঁতে তিনদিনব্যাপী খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন।
বাড়ির সব চত্বরে লাল কাগজের ঘেরাটোপ লাগানো চীনেলণ্ঠন। এই লণ্ঠনগুলি দেখে নানান জাতের পতঙ্গ উড়ে আসছিল। মাঝে মাঝে বড় বড় দু-একটা মথ ফিকে সবুজ রংয়ের অথবা সোনালী বুটি-দেওয়া কালো পাখা নেড়ে নেড়ে উড়ছিল। মথ দেখলেই মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠছিল! যেপর্যন্ত না মথটাকে ধরে দরজার ওপরে একটা পিন দিয়ে গেঁথে রাখা হচ্ছিল। ওইভাবে গেঁথে-রাখা মথগুলির সৌন্দর্যের তারিফ করছিল সবাই আরামে বসে। প্রৌঢ়া শাশুড়ি এই খেলার সবচেয়ে উৎসাহী দর্শক। একটি মথকে ধরে পিনে গাঁথা হলেই তিনি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠছিলেন।
চিউমিং এসে পড়ল। ও আসার সময় একটা মথ ধরা হল। পিনে গাঁথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল মথটা। চিউমিং হঠাৎ বলে উঠল, ওরা কী তাড়াতাড়ি মরে যায়!
ওর মুখে কোন কথা শোনা যায় না। সবাই ওর কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।
চিউমিংকে বেশ একটু পাণ্ডুর দেখাচ্ছে, একটু শীর্ণ, কিন্তু তাতে ভালই লাগছে

দেখতে। শ্রীমতী ওয়ায়ু ভাবলেন বিয়েটা হয়ে গেলে মেয়েটার খবর নিতে হবে। ওকে ডেকে পাঠাব।

চিউমিং নীরবে অবিশ্রাম কাজ করছিল। চা ঢালছিল, বাচ্চাদের দেখছিল, খাবার-দাবার গুছিয়ে দিচ্ছিল। কেউ বাধা দিলেই বলছিল, শুধু এই কাজটা শেষ করে নি।

চিউমিং শ্রীমতী ওয়ায়ুর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর চায়ের পাত্রটায় হাত ছুঁয়ে বলল, আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, দিন না দিদি, গরম করে দেই।

শ্রীমতী ওয়ায়ু আপত্তি না করে বললেন, ধন্যবাদ!

আমার কিছু কথা ছিল, আজ রাত্রে আপনার সময় হবে দিদি? চিউমিং তার মৃদু গলায় বলল।

নিশ্চয়ই হবে, তুমি এস। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

সবাই চলে গেলে শ্রীমতী ওয়ায়ু, ইং আর চিউমিং ছাড়া কেউ রইল না সেখানে। হঠাৎ শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, তোমার যে বাচ্চা হবে।

চিউমিং মুখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে। তারপর স্বীকার করে বলল, আমি সুখস্পর্শ বহন করছি। চিউমিং সেই ভাষায় উত্তর দিল, যে-ভাষায় বড় বড় পরিবারের বৌরা নতুন বংশধরকে গর্ভে ধারণ করলে বলে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু নিজের বা চিউমিং-এর ভাষা শুধরে দিলেন না। তিনি কেবল পরিষ্কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, তুমি তো দেখছি একটুও দেরী করলে না।

চিউমিং কিছু উত্তর দিল না। তার মাথা নিচু করে কোলের ওপর চিৎ করে হাত রাখল।

তা মনে হয়, উনি নিশ্চয় খুশি হয়েছেন। আগের মত তীক্ষ্ণ গলায় তিনি আবার বললেন।

তিনি জানে না। তাঁকে আমি বলি নি। সহজ সরল চোখের দৃষ্টি তাঁর মুখে স্থাপন করে চিউমিং বলল।

অদ্ভুত! শ্রীমতী ওয়ায়ু সঙ্গে সঙ্গে বললেন। চিউমিং-এর ওপর তাঁর রাগ ধরে গিয়েছিল। নিজের রাগ দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্য হলেন। যেজন্য মেয়েটিকে এ-বাড়িতে এনেছেন, সেই উদ্দেশ্য তো পূর্ণ করেছে মেয়েটা তবে কেন তার ওপর রাগ হল? একটা সরু সবুজ সাঁপিনীর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিল তাঁর ক্রোধ। সেই সাঁপিনী ফনা তুলে জিভে বিষ ঢেলে দিচ্ছিল। তিনি বললেন, উপপত্নীদের তো শুনেছি, তাদের বাবুদের এসব বলতে তর সয় না। তুমি তাদের থেকে অন্যরকম কেন?

চিউমিং-এর চোখদুটি জলে ভরে উঠল। চীনেলণ্ঠনের আলোয় সেই জল চিকচিক করছে।

আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম, মৃদু ভগ্নস্বরে চিউমিং বলে চলল, আমি ভেবেছিলাম যে আপনি খুশি হবেন কিন্তু আপনি তো শুধু রাগই করলেন। এখন আর আমি বেঁচে থেকে কী করব! এ-জীবন আমি শেষ করে ফেলব।

মরীয়া হয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করল চিউমিং। কথাগুলি কানে যেতেই যেন জ্ঞান ফিরে পেলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। এ-রকম বড় বড় পরিবারের রক্ষিতাদের গলায় দড়ি দিয়ে বা আংটি অথবা আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করার কথা নতুন কিছু না কিন্তু তাতে পরিবারের ইজ্জতহানি হয়। তিনি বললেন, তুমি যখন তোমার কর্তব্য করেছ, তখন মরতে যাবে কেন?

আমি ভেবেছিলাম, আপনি খুশি হলে আমিও খুশি হব। আপনার উত্তাপ থেকে আমার দু-হাত সেঁকে নেব কিন্তু এখন আমি কোথায় পাব উত্তাপ!

শ্রীমতী ওয়ায়ু শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। তিনি এটা একান্ত স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন যে চিউমিং একটি সাধারণ গ্রামের মেয়ে। যে পশুর মতই তার গর্ভলক্ষণ দেখে পুলকিত হবে। গোরু—বাছুরেব কথাই ভাবে। যে ষাঁড় তাকে গাভিনী করে তার কথা ভাবে না। যদি চিউমিং-এর কথা কখনো তিনি ভেবে থাকেন, তবে এইভাবেই ভেবেছেন। একটা বাচ্চাকাচ্চা হলে মেয়েটার পক্ষে তা হবে পুরস্কার আর তা নিয়ে মেয়েটারও তৃপ্তি হবে।

এখন তবে কী? এখন কি তুমি নিজের জন্য খুশি নও? তোমার একজন আসছে, যাকে নিয়ে তুমি হাসবে খেলবে? যদি ছেলে হয়, তবে তোমাব সম্মানও বেড়ে যাবে এ-বাড়িতে। আর মেয়ে হলে আমি কথা দিচ্ছি, তুমি আমার কাছ থেকে কোন কথা শুনবে না। না, আত্মহত্যা করার কথা মনে ঠাঁইও দিও না। যাও, শুতে যাও। তাকে বোল. সুসংবাদ আছে।

আমাকে দয়া করে আজ রাতটা এখানেই থাকতে দিন। সেই প্রথমদিন যেমন আপনার মহলে শুয়েছিলাম তেমনি শুতে দিন আজ। আর আমার হয়ে তাঁকেই জানাবেন আপনি কথটা—

শ্রীমতী ওয়ায়ু শান্তভাবে বুঝিয়ে চিউমিংকে তার নিজের ঘরেই শুতে যেতে বললেন। তার কথায় মেয়েটা একটু আশ্বস্ত হল। ধন্যবাদ জানিয়ে সে চলে গেল।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। সারারাত ভাল ঘুম হয় নি। বারে বারে ভেঙে যাচ্ছিল ঘুম। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। হৃদযন্ত্র যেমন শরীরের রক্তস্রোতের স্পন্দন অনুভব করে, তেমনি তিনিও গোটা বাড়িটার জীবন-স্পন্দন অনুভব করছিলেন শুয়ে শুয়ে। মনটা ভারী হয়ে আছে।

এসে শ্রীমতী ওয়ায়ুকে খবর দিল যে তাঁর শাশুড়ি বিশেষ অসুস্থ। গিয়ে দেখলেন অবস্থা সঙ্গীন। ভোগী অসংযমী মানুষ। খদ্যাখাদ্য কোন বিবেচনা করেন না। মৃত্যুভয়ে বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মহলের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। শাশুড়ির অসুস্থতার খবরটা দেবার জন্যই যেন তিনি যাচ্ছেন।

খবর পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন তাঁর স্বামী। বেশ সহাস্য ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তাঁকে। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, তোমার মা অসুস্থ। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলে?

তাঁর স্বামী গম্ভীর মুখে বললেন, হায়, না। আজ সকালেই যাব ভেবে ছিলাম কিন্তু একটার পর একটা কাজ এসে—

তিনি খুবই অসুস্থ। শ্রীমতী ওয়ায়ু পুনরাবৃত্তি করলেন।

তেমন কিছু বলছ না তো—

না। এ যাত্রায় নয়। তবে খুব যে দেবী আছে তেমনও নয়। বারেবারে জিজ্ঞেস করছিলেন পরলোকের কথা। আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কিনা? এসব প্রশ্ন করার মানেই শরীর পাত হয়ে আসছে এবং তাই আত্মা নিরাশ্রয় হবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

তুমি কী জবাব দিলে?

আমি বললাম, আমি সেরকমই আশা করি, তবে জানি না।

উঃ! তুমি কী নিষ্ঠুর। একজন বৃদ্ধাকে কীকরে তুমি তোমার সন্দেহের কথা বললে! ক্রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর স্বামী বললেন।

তুমি হলে কী বলতে?

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলতাম, পরপারেব সেই হলুদ প্রস্রবনের ধারে অপরিসীম সুখ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।

হয়ত তোমার গিয়ে এ-কথা বলে আসা ভাল হবে।

নিশ্চয়ই বলব। দাঁতে ঠোঁট চেপে তাঁর স্বামী বললেন। আরেকটা কথা আছে।

বলো।

গতরাতে চিউমিং আমার কাছে এসে বলল, সে গর্ভবতী। তিনি আবার সাধারণ শব্দটা ব্যবহার করলেন মাথা না তুলে।

তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর স্বামীর হাত থেকে হাতপাখা পড়ে গেল। তিনি তাঁর পোষাকে হাত ঘসছেন। চোখাচোখি হতেই বললেন, নাঃ আমাকে বিষ এনে দাও। আমার খাবারে বিষ মিশিয়ে দাও। ওগো, তবু এ-কথা বলব যে আমি তোমার অনুগত, তোমার অনুগত ছাড়া আর কিছু নই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসি বেরিয়ে এল শ্রীমতী ওয়ায়ুর।

কোনরকমে হাসি চেপে বললেন, খুশি না-হওয়ার ভান করো না। নিজের জন্য তুমি বেশ গর্বিতই হয়েছে।

হায়—আমি অতিসমর্থ একটি পুরুষ মানুষ!

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলেন। হাসির সাঁকো বেয়ে যেন দুজনে মিলিত হলেন। সেই হাসির মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন মিচেন ঠিক কথাই বলেছিল, তিনি তাঁকে ভালবাসেন নি। কিন্তু আর দরকার হবে না। স্বামীর ব্যাপারে তিনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

শোন, চিউমিংকে একটু মায়া কোরো।

আমি সবাইকেই মায়া করি।

দোহাই, এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে শোন। এই ওর প্রথমবার। ওর ওপর হামলা কোর না। ওর সম্মতি না পেলে আর এগিও না। শ্রীমতী ওয়ায়ু অল্প হাসলেন। তারপর বললেন, তুমি এখন মার কাছে যাও। আর আত্মার পরলোকের কথা আলোচনা না করে বরং বলে এস যে তোমার একটি ছেলে হবে।

ছেলের কাছ থেকে খবরটা শুনে কিন্তু প্রৌঢ়া প্রফুল্ল হলেন না।

নিজের মহলে গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে ইং এসে বলল, কর্তা-মার অবস্থা আরো খারাপ হতিছে। উনি ভয় পেয়ে আপনাকে ডাকতিছেন বৌদি। দাদাবাবু ওখানে রয়েচেন। দাদাবাবুও আপনাকে যাতি বলচেন।

গিয়ে দেখলেন ছেলে শাশুড়ির একটি হাত ধরে বসে আছেন। প্রৌঢ়া পলকহারা দৃষ্টিতে শ্রীমতী ওয়ায়ুর দিকে তাকালেন। কিছু মদ গরম করে এনে প্রৌঢ়ার মুখে ফোঁটায় ফোঁটায় ঢেলে দেওয়া হল। কিন্তু শেষ ফোঁটাটি পেটে যেতে তিনি বিড়বিড় করে একবার বললেন, আমি বুঝ—তে পার—ছি, তারপরে একটা হেঁচকি উঠতেই সবটুকু মদ বেরিয়ে এল। প্রৌঢ়া তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মা, মাগো—আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু। শ্রীমতী ওয়ায়ু নিজের রুমাল দিয়ে শাশুড়ির ঠোঁটের কষ মুছিয়ে দিয়ে নিষ্প্রাণ মাথাটা দু-হাত দিয়ে তুলে বালিসের ওপর ভাল করে শুইয়ে দিলেন। এখন অনেক কাজ। মৃতার আধিভৌতিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। তাঁর দেহ শুদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে যাতে আত্মা বাড়ির কারো কোন ক্ষতি না করতে পারে। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তখনো বিলাপ করছিলেন। তাঁরা ঘর ছেড়ে এলেন। পরিচারিকা এখন মৃতদেহটি ধুইয়ে, পোষাক পরিয়ে রাখবে পুরুতদের জন্য।

শ্রীমতী ওয়ায়ু লঘুপদে চিউমিংকে ডেকে তুলে খবরটা দিয়ে বললেন যেন আজকের রাতটা সে তার ঘরে ঘুমোয়। চিউমিং শুনে খুব দুঃখিত হল না।

বড় কর্ত্রী চলে গেলেন। এখন থেকে শ্রীমতী ওয়ায়ু এ-বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁর স্বামী বাইরের দিকের সর্বময় কর্তা। পাঁজিপুঁথি দেখিয়ে জানা গেল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রশস্ত সময় শরৎ কালের মাঝামাঝি একটা দিন। পারলৌকিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সাইপ্রাসকাঠের তৈরী কফিনে প্রৌঢ়ার নিষ্প্রাণ দেহটি আবদ্ধ করে, বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে পারিবারিক মন্দিরে সমাহিত করা হল।

শরতের মাঝামাঝি বাড়িতে একটা গোলমালের সূত্রপাত হল। তিনি বুঝলেন অঙ্কুরে বিনাশ না করলে এই সমস্যার পরগাছা মহীরুহের আকার ধারণ করবে।

ফেংমো আর লিনউয়ি ঝগড়া করতে আরম্ভ করেছিল।

সখীর মেয়ে বলে তিনি লিনউয়িকে কিছু বলতে চান নি কিন্তু বড় বৌ মেং-ও মায়ের পেটের বোন। তিনি লিনউয়িকে কিছু না বলে মেং-এর সঙ্গেই প্রথমে কথা বলবেন ঠিক করলেন।

দাসী মেং-এর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। শাশুড়িকে দেখেই মেং লজ্জিত হয়ে বলল, আগে চুল আঁচড়ানো হয় নি মা, ঠিক আছে, আমি চুল গুটিয়ে রাখছি।

না, না, তুমি যা করছ করো। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

বুলাং ও লিনউয়ির চুল ছোট করে ছাঁটা কিন্তু মেং আগের কালের ধরনে লম্বা চুল রাখত।

তোমার আর কত দিন দেরী বৌমা ?

এগারো দিন। আমাকে একটু বলে-টলে দেবেন মা। প্রথমবার সে যা কষ্ট পেয়েছিলাম !

এবার তোমার এত কষ্ট হবে না।

আচ্ছা লিনউয়িরও কি এরকম কষ্ট হবে ?

তা হবে।

লিনউয়ি বলে যে ও বাচ্চাকাচ্চা চায় না, মেং বলল।

তুমি বলছ কী বৌমা, বুঝে কথা বলো।

সত্যি মা, ও চায় না। ও নিজেই আমাকে বলেছে।

লিনউয়ি কী বলেছে বলো তো আমাকে।

ও বলেছে, এত বড় একান্নবর্তী পরিবারে ওর বিয়ে না হলেই ভাল হত। সে আলাদা হয়ে থাকতে চায় মা !

আলাদা হয়ে ? তা যাবে তো খাবে কী ?

ও বলে ফেংমো যদি ভাল ইংরিজি শেখে তবে একটা চাকরী পাবে। তার মাইনেতেই চলে যাবে।

কিন্তু কেউ তো ওদের ব্যাঘাত করে না। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

না—মানে ও বলে বাড়ির হালচাল। এই বিরাট খাওয়া-দাওয়া, শ্রাদ্ধ উৎসব, জন্মদিন, বাড়ির বৌদের উনকোটী চৌষট্টি কাজের হাঙ্গামা—এইসব ব্যাপার আর কি। ও বলে ফেংমো খালি বাড়ির কথা ভাবে।

তাইতো ভাববে। আর ও কি বাজারের মেয়েমানুষ, এ-বাড়ির কেউ নয় ?

মেং চুপ করে রইল। দাসীর সামনেই দুজনে কথা বলছিলেন। দাসীরাও এ-বাড়ির জীবনযাত্রার অংশ।

তোমারও কি তা-ই মনে হয় বৌমা ? হঠাৎ মেংকে জিজ্ঞেস করলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু।

আমি বড্ড কুঁড়ে মা ; লেখাপড়াও ভাল শিখি নি। আপনার ছেলেই আমাকে যা কিছু বলে দেয়। এই যা আছি, বেশ আছি।

লিয়াংমো ভাল ব্যবহার করে তোমার সঙ্গে ?

অত ভাল লোক দেখা যায় না মা। আপনার কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

লিনউয়ির সঙ্গে ফেংমো কেমন ব্যবহার করে ?

কার দোষ কে বলবে, তবে মনে হয় রূলাং-এর জন্য এটা ঘটছে। সেজ আর লিনউয়ি একসঙ্গে বসে ওদের স্বামীদের ত্রুটির লিস্টি করে। ইতস্তত করে মেং বলল। রূলাংও কি অসন্তুষ্ট ?

লিনউয়ি আমার মায়ের পেটের বোন, ওর কথা বলতে পারি।

রূলাংকে তুমি পছন্দ করো না ?

না। গলায় কোন ঘৃণার আভাস না রেখে শান্ত ভাবে মেং বলল। তা বলে ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছি না। ওর খুব হামবড়া ভাব—যেন একমাত্র ও-ই ঠিক, আর বাকী সবাই ভুল করছে।

ইংকে দিয়ে তিনি ফেংমোকে ডেকে পাঠালেন।

ফেংমো একটু পরেই এল। লম্বা ক্ষীণকটি সুন্দর কব্জি ফেংমোর। চৌকো মুখ। কত বড় হয়ে গেছিস। জন্মের পর থেকে মানুষ কেমন বদলে যায়, ভাবলে আশ্চর্য লাগে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

আমাদের জন্ম হয় কেন মা ?

অতীত থেকে অগ্রসর হয়ে এ-যুগের মানুষ আগামী যুগের মানুষকে নিয়ে আসবে এটা কি তাদের কর্তব্য নয় ? প্রশ্নটা নিয়ে তিনিও ভেবেছেন, কিন্তু ছেলের মুখ থেকে শুনে ত্রস্ত হয়ে উত্তর দিলেন।

কিন্তু কেন ? আমরা বেঁচে আছি কেন ?

এখন তো আর এটা থামানো যায় না ?

তবে কি আমার মত আরেকটা মানুষের জন্ম দেবার জন্যই আমি বেঁচে আছি ?

আমার একটা আলাদা সত্তা আছে মা, তার সঙ্গে তোমার বা আমার ভাবা সন্তানের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি এই শরীরের মা, সে হবে এই শরীরের সন্তান।

ভেতরে ভেতরে ভয়ে কেঁপে উঠলেন তিনি। এমন প্রশ্ন, এমন অনুভূতি তাঁর মনেও জেগেছে অনেকবার কিন্তু তাঁর ছেলের মনেও যে এই প্রশ্ন জাগতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

হায়, আমি একটা অপদার্থ মা। তোর বাবা এসব ভাবে না। আমার চিন্তার বিজ তোর রক্তেও মিশে রয়েছে!

বরাবরই তো আমি এসব ভাবি।

আগে তো কখনো বলিস নি!

আগে ভাবতাম এই চিন্তা আমাকে ছেড়ে যাবে একদিন কিন্তু আমার মন থেকে যাচ্ছে না চিন্তাটা।

আশা করি এর মানে এই নয় যে লিনউয়িয়র সঙ্গে তোর বনাবনি হচ্ছে না।

ও কি চায় আমি জানি না। ও খুব অস্থির হয়ে পড়েছে।

তুই বড্ড বেশী ওর কাছেকাছে থাকিস। স্বামী-স্ত্রী এত কাছাকাছি থাকতে নেই। মেং-এর মত ও এসে বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে না! ফলে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তাই এই অস্থিরতা।

হবেও বা। উদাসীন ভাবে উচ্চারণ করল ফেংমো।

ফেংমো, আঁদ্রে ভাইসাহেবকে আবার ডাকলে কেমন হয়? ওঁর কাছে যখন তুই পড়তিস তখন আমার মনে হত তুই বেশ ভাল ছিলি।

এবার তা নাও হতে পারে।

শোন, তাঁকে আমি আসতে বলি।

ফেংমো কেন উত্তর দিল না।

যদি তোরা আলাদা হতে চাস, তবে কোন বাধা দেব না। যাতে তোরা সুখে থাকিস, তাই আমি চাই। সুখে থাক। আমার অন্য ছেলেরা আছে। যদি চাস তো বলিস।

কী যে আমি চাই, তা আমিই জানি না, অস্থির ভাবে সে বলল।

লিনউয়িকে ভাল লাগে না তোর? বাচ্চাকাচ্চা কিছু হল না ওর।

ওসব দিয়ে আমাদের বুঝতে যেও না মা।

তা করছি না। তবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সব চেয়ে বড় ভিত্তি হল দেহ। ভিতি না থাকলে বাড়ি ধ্বসে পড়ে, দাম্পত্য-জীবনও সেরকম দৈহিক সম্পর্ক নিবিড় না হলে নষ্ট হয়ে যায়। যতই সাজাও গোছাও সব অর্থহীন হয়ে পড়ে।

তবে বাবা কেন উপপত্নী রাখলেন ?
প্রশ্নটা করেই অস্বস্তি লাগছিল ফেংমোর। সে চুলে গালে হাত বোলাচ্ছিল অস্বস্তি ঢাকতে।
সব জিনিসেরই একটা সময় আছে। একটা ঢেউর পরে আসে আরেকটা ঢেউ। ফেংমো শেষে বলল, বেশ আঁদ্রে ভাইসাহেবকে আসতে বল। তিনিই আমার একমাত্র মাস্টারমশাই হবেন। আমি ন্যাশনাল স্কুল ছেড়ে দেব।

এইভাবে আঁদ্রে ভাইসাহেব আবার ওয়ায়ু-ভবনে আসতে আরম্ভ করলেন। আগে যখন এ-বাড়িতে আসতেন তখনকার বা তারপরে যা-যা ঘটেছিল, তার কোন উল্লেখই তিনি করলেন না। প্রতি সন্ধ্যেবেলা ফেংমো পড়ত, পড়া হলে চলে যেত। শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রতিদিন তাঁর পুরানো জায়গায় বসে থাকতেন। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্তের ঠাণ্ডা পড়তে শুরু হয়েছিল; তবু তিনি এই অভ্যাসটি ছাড়েন নি। আজ রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল তবু তিনি ভেতরে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইং বারেবারেই গজগজ করত তাঁর এই খোলা আকাশের হিমের মধ্যে বসা নিয়ে। সাবধানতা হিসেবে সে লাইব্রেরী ঘরে একটা পাত্রে কয়লা জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখতে শুরু করেছিল; কারণ সে নিশ্চিতই ছিল যে তার কর্ত্রী শিগগিরই ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পড়বেন।
আঁদ্রে ভাইসাহেব, শ্রীমতী ওয়ায়ু ডাকলেন।
ভাইসাহেবের দীর্ঘ মূর্তি থেমে গেল। মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন। আমাকে ডাকলেন মাদাম ?
হ্যাঁ, বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আপনার হাতে সময় আছে ? একটু আলোচনা করতে কি অসুবিধা হবে; আমার সেজছেলে ফেংমোর বিষয়ে কিছু কথা বলতাম। ওকে নিয়ে মোটে শান্তি পাচ্ছি না।
ভাইসাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।
চা নিয়ে আয় ইং আর কয়লাটা দরকার মত খুঁচিয়ে দেবার জন্য এখানেই থাকিস। তাঁর মনে পড়ল, ভাইসাহেব একজন ধর্মযাজক। কোন নারীর সঙ্গে একত্র থাকার বিব্রত ভাবটা দূর করার জন্য ইংকে এখানে থাকতে বললেন। বিব্রত হয়ে থাকলেও, তাঁকে দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল না। যে-চেয়ারে বসতে বলা হল, সে চেয়ারে বসলেন। কোটরগত চোখের দৃষ্টি শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখে কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর কথা ভাবছেন না; তিনি স্বর্গের জানালা দিয়ে তাঁকে দেখছেন।
আচ্ছা ভাইসাহেব, ফেংমো অসুখী কেন ?

ও খুব আইডল মানে অলস হয়ে পড়ছে।

অলস? কিন্তু ওর নিজের নির্দিষ্ট কাজ আছে। প্রত্যেক বছর নববর্ষের দিন সব ছেলেকেই আমি কাজ ভাগ করে দেই। এ-বছর বড়ছেলে আমার তত্ত্বাবধানে চাষবাস দেখছে। সেজছেলে সেমো বেচাকেনার তদারক করছে। আর শহরে শস্যের বাজারে ফেংমো কাজকর্ম শিখছে। ইসকুল ছাড়ার পর থেকে রোজ কয়েক ঘণ্টা ধরে সে এই কাজে শিক্ষানবিশী তবু সে অলস?

ভাইসাহেব বললেন, ফেংমোর মনটা গতানুগতিকার ওপর খুব অনুসন্ধিৎসু। তাড়াতাড়ি শিখে নেয় সব কিছু। আপনি আমাকে ইংরিজি শেখাতে বলেছেন। ইংরিজি শেখার সঙ্গে সঙ্গে ও আরো কিছু শিখে নেয়। দেখছি ও কিছুই ভোলে না। যতদিন না তার মন ও আত্মাকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাবার মত কিছু বিষয় খুঁজে পাচ্ছে, ততদিন সে অলস থেকেই যাবে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু মন দিয়ে ভাইসাহেবের কথা শুনলেন। তার মানে ওকে আপনার ধর্মে শিক্ষিত করিয়ে তোলার জন্য আপনি উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন?

আমার ধর্ম কী তাতো আমি জানি না।

লিটল সিসটার সিয়া প্রায়ই আপনাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পড়ে শোনাতেন।

আমার ধর্ম তাঁর ধর্ম নয় বা তাঁর ধর্ম আমার নয়।

বুঝিয়ে বলুন।

বুঝিয়ে বলব না, কারণ সে ক্ষমতা আমার নেই। লিটল সিসটার সিয়া আপনাকে বই পড়ে শোনাতে পারেন বা আপনাকে একধরনের প্রার্থনার কথা বলতে পারেন কিন্তু আমার তা পথ নয়। আমি অনেক বই পড়েছি, আমার প্রার্থনার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই।

তাহলে আপনার ধর্ম কোথায়?

পানীয়ে, খাদ্যে, ঘুমের বিশ্রামে ও চঞ্চল ভ্রমণে, আমার ঘর পরিষ্কার করার সময়, উদ্যান রচনায়, যেসব অনাথ শিশুদের আমি পালন করছি তাদের খাইয়ে দেবার সময়, যারা পীড়িত তাদের সেবা করায়, মুমূর্ষুর শুশ্রূষা করে অন্তিমকালে একটু শান্তি এনে দেওয়ায়।

সেবার আমার শাশুড়ি মারা যাবার সময় ভারি অদ্ভুত ভাবে ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাকে ডেকে পাঠানোর জন্যে কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজনদের কথা ভেবে নিরস্ত হলাম।

যারা স্বস্তি এনে দেয়, তাদের আমি কখনো নিরস্ত করি না। সবাই স্বস্তি চায়।

আপনিও চান?

নিশ্চয়ই—আমিও চাই।

আপনি এতো নিঃসঙ্গ! আপনার আপন রক্তের লোক বলতে কেউ নেই?

প্রত্যেকেই আমার আপন রক্তের লোক।
আপনার রক্ত কি আমার মত ?
কোন পার্থক্য নেই। সব মানুষের রক্তই একজাতীয়।
আপনি পাদ্রী হলেন—কী—
প্রশ্নটা করেই তাঁর মনে হল, কোন ধর্মযাজকের জীবন গ্রহণ করার কারণ কাউকে জিজ্ঞেস করতে নেই। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, আমার অশোভন কৌতূহলের জন্য মার্জনা করুন।
ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। সত্যি, কেন যে পাদ্রী হলাম তা আমি নিজেই জানি না। প্রথমে তো জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলাম।
আপনি তারাদের চেনেন ?
তারাদের কেউ চেনে না মাদাম। আমি শুধু তদের উদয় ও বিলয় মহাশূন্যে তাদের সঞ্চরণ দেখে পর্যালোচনা করি।

এখনও তা করেন ?
মাদাম, দিনের কাজ সারা হলে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকে, তবেই নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে পারি। শান্ত অকপট স্বরে ভাইসাহেব কথা বলছিলেন।
আপনি খুব একা, হঠাৎ বললেন শ্রীমতী ওয়ায়ৃ। সারাদিন আপনি গরীবদের জন্য খাটেন আর রাত্রিবেলা নক্ষত্রদের জন্য—

তা সত্যি।
আপনি কি কখনো গৃহ গৃহিনী বা সন্তান চান নি ?
একবার আমি একটি নারীকে ভালবেসেছিলাম। আমরা বিয়ে করব ঠিক ছিল। তারপর এক বিশাল নিঃসঙ্গতা আমাকে ছেয়ে ফেলল; সেই নারীকে আর আমি ভালবাসতে পারলাম না, তাঁকে আর আমার প্রয়োজন হল না।
আমার মনে হয়, তাঁর ওপর ভারি অবিচার করা হল।
হ্যাঁ, তা হল। আমি সে-রকম অনুভব করলাম এবং তাঁকে যা সত্য তা বললাম। তারপর সেই নিঃসঙ্গতাকে অনুসরণ করার জন্য ধর্মযাজক হলাম।
কিন্তু আপনার ধর্মমত ?
ভাইসাহেব তাঁর গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার ধর্মমত মহাবিশ্বে, মহাকালে, মহাশূন্যতায়, আকাশভরা সূর্যতারায়, মেঘমালায়, হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে।
সেখানে কি কোন ঈশ্বর নেই ?
আছেন। তবে তাঁর দর্শন আমি পাই নি।
তবে আপনি কী করে তাঁকে বিশ্বাস করেন ?
যা আমার চারদিকে ঘিরে রয়েছে তিনি তার মধ্যেও রয়েছেন। বহিরন্তশ্চ ভূতনামচরং চরমেব চ···দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ। তিনি জলে অন্তরীক্ষে।

জীবনে মরণে, সমগ্র মানবজাতিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। ভাইসাহেব গম্ভীর গলায় বৃহৎ অথচ সরল কথাগুলি উচ্চারণ করলেন।

ক্রমবর্দ্ধমান কৌতূহল নিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার মত আর কেউ আছেন?

কোন মানুষই ঠিক অন্য কারুর মত হতে পারে না। ভাইসাহেবের রোদে-পোড়া তামাটে মুখ একটি স্মিত উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকাল। যেন তাঁর ভেতর থেকে একটা আলো নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি বললেন, তবে মাদাম আপনার ছেলে ফেংমো আমার মত হতে পারে বলে মনে হয়। হয়ত সে আমার মতই হবে।

আমি তা বারন করে দিয়েছিলাম, শ্রীমতী ওয়ায়ু অধীরভাবে বললেন।

আহ, বলে ভাইসাহেব হাসলেন। তাঁর উজ্জ্বল রহস্যময় চক্ষুদুটি শ্রীমতী ওয়ায়ুর ওপর পলকের জন্য স্থির হল। তারপর তিনি উঠে বললেন, আচ্ছা চলি।

মাথার ওপর মুঠো মুঠো তারার দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বসে রইলেন। ইং দুবার এসে ঠাণ্ডা লাগানোর জন্য বকে গেল।

যা তুই—এখানে বসে আমি ভাবব।

বাইরে হিমের মধ্যে না বসে ঘরে বিছানায় বসে ভাবলি কী ক্ষেতি হবে শুনি, ইং অনুযোগ করল।

কোন উত্তর না পেয়ে সে একটা পশমী জামা এনে তাঁর হাঁটু অবধি ঢেকে দিয়ে গেল। শ্রীমতী ওয়ায়ু নিশ্চল হয়ে বসে থাকলেন, চেয়ারে হেলান দিয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। চত্বরের পাঁচীলের ফ্রেমে-আঁটা চৌকো আকাশ ওপরে, নিচে পাঁচীলের চৌহদ্দীর মধ্যে চৌকোনো বাগান। তাঁর গভীর চিন্তা যেন সব ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল—উঁচুতে আরো উঁচুতে।

বংশপরম্পরায় সাবেকী এই বাড়িতে বাস করে আসা, সময় ও মানুষের এই স্রোতধারা সব স্পর্শ করে তাঁর মন এক ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার মধ্যে চলে যাচ্ছিল। আঁদ্রে ভাইসাহেবের নিঃসঙ্গতার মানে যেন ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন তিনি।

বৌদি, ও বৌদি, বলি শুনতি পাচ্ছ? -ইং আবার এসে ডাকল। কোন সাড়া না পেয়ে, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখের দিকে তাকাল। কী শুদ্ধ দেখতে লাগছিল সেই মুখ, কিন্তু নিঃসাড়, নিবিড় কালো দুই আঁখিতারা অনিমেষ চেয়ে আছে অনাদি অনন্ত দূর আকাশের দিকে। অনতিদূরে লাইব্রেরী ঘর থেকে মোমবাতির আলোর রেশ, অন্ধকারাচ্ছন্ন চত্বরের মধ্য দিয়ে তাঁর মুখে এসে পড়ছিল। প্রায় স্বচ্ছ, ননীর মত কোমল সেই মুখ।

একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠল ইং ! তবে কি তিনি নেই ? সে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, হায়—হায়—এ কী সব্বোনাশ হল !

একটু পরেই ইংয়ের কাছ থেকে খবর পেয়ে বড় তিন ছেলে ও শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু ছুটে এলেন।

কেন এমন হল ? শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু প্রশ্ন করলেন।

সেই পাদ্রীসাহেব এমন করে গেছেন ইং বলল।

মানুষের আত্মা এভাবে শরীর ছেড়ে সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দিলে ক্ষতি হয়, আত্মা তখন আর ফিরে আসতে পারে না ! তাই তারা সবাই ধীরে ধীরে শ্রীমতী ওয়ায়ুকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকল। একজনের পর একজন ডাকছিল। একসময় তাঁর চোখে পলক পড়ল। তিনি সুপ্তোত্থিতার মত উঠে সবাইকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমি খুব ক্লান্ত, আমি ঘুমোতে চাই। আসছে কাল তোমাদের সঙ্গে কথা বলব। ইং তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গতসন্ধ্যার স্মৃতির জন্য কেমন ভয় ভয় লাগল শ্রীমতী ওয়ায়ুর। পরিপূর্ণ মুক্তির ওই কিছুক্ষণ যেন তাঁর জীবনের মধুরতম সময়। তিনি জানতেন, এই স্বাধীনতার স্বাদ তাঁর আত্মার কাছে সুরার মত নেশা ধরিয়ে দেবে। মাতালের কাছে যেমন মদ, আত্মার কাছে তেমনি এই পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ অপরিহার্য। ভাইসাহেবের ওপর রাগ ধরল তার। ভাইসাহেবই তো তাঁকে মুক্তির এই স্বাদ পেতে প্রলুব্ধ করেছেন। তাঁর ভয় ধরল, কারণ তিনিও তো সেই স্বাদ পেতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। একটা অপরাধবোধ তাঁকে অচ্ছন্ন করে ফেলল।

হঠাৎ নিজেকে যেন উপড়ে তুলে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন তারপর হিসেব পত্র দেখতে চাইলেন।

হিসেব দেখে রাগ করলেন। ঠাকুরকে বকলেন। এমন কি তাকে বরখাস্ত করার কথাও তুললেন স্বামীর কাছে। অথচ এইসব তাঁর স্বাভাববিরুদ্ধ।

একটু পরেই ইং এসে খবর দিল যে মেং-এর ব্যথা উঠেছে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু ইংকে বললেন, বৌমার মাকে খবর পাঠাও। তারপর ভালকরে হাত ধুয়ে পরিষ্কার নীল রংয়ের একটা পোষাক পরে লিয়াংমোর মহলের দিকে গেলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই বস্তসমস্ত হয়ে শ্রীমতী ক্যাং এলেন। বান্ধবীকে নিয়ে তিনি মেং-এর ঘরে ঢুকলেন।

একটু পরে দাই ঘোষণা করল যে, ব্যাটাছেলে গো !
শিশুটি হঠাৎ দম নিয়ে কেঁদে উঠল।
শ্রীমতী ওয়ায়ু হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললেন, কী গো নাতি, মার পেট থেকে বেরিয়ে আসতে হল বলে রাগ হয়েছে নাকি! ওমা কী কাণ্ড, দ্যাখো দ্যাখো বৌমা, তোমার ছেলে আমাদের সবাইকে দোষ দিচ্ছে।
মেং যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, বৃষ্টির পর ঝরে-যাওয়া একটি ফুলের মত, চোখ বুজে শুয়ে ছিল।
সেদিন রাত্রিবেলা শ্রীমতী ওয়ায়ু ও শ্রীমতী ক্যাং একসঙ্গে থাকলেন। বাড়ির সব খবর ভাল। বাচ্চাটাও ভাল আছে।
নানান বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন তারা। ভাইসাহেবের কাছে ফেংমো আবার পড়ছে, বিদেশী ভাষা শিক্ষা, এরকম সব আটপৌরে মেয়েলী কথা। কথায় কথায় শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, জানিস লিনউয়িকে বিয়ে করে ফেংমো সুখী হয় নি ; তুই মেয়েটাকে সংসার করতে কোন শিক্ষাই দিস নি। স্বামীকে সুখী করবার শিক্ষা পায় নি তোর মেয়ে।
না, আইলীয়েন, আসলে লিনউয়িই সুখী হয় নি।
মিচেন, তুই তোর আগের কথা মনে করে দ্যাখ একবার।
হ্যাঁ, তুই ভাবিস, ফেংমোকে ভাল শিক্ষা দিয়েছিস ? লিনউয়ি সুখী হল না কেন ? বিয়েতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই দায়িত্ব থাকে। একহাতে কি আর তালি বাজে রে ! স্বামীর ভূমিকা নিতেই শেখে নি ফেংমো।
তুই আমাকে ঘা দিয়ে কথা বলছিস মিচেন।
শ্রীমতী ক্যাং বললেন, বেশ আমি লিনউয়িকে কিছুদিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। তুই আর ফেংমো পুঁথিপত্র পড়, যতদিন না ওর কদর বুঝিস।
মিচেন, আমরা কি কোঁদল করছি ?
দ্যাখ, আমি তোর পুরোনো বন্ধু। যদিও মেয়েমানুষদের ধারার বাইরে তোর ভাবনা, তবু কক্ষনো তোর কোন সমালোচনা করি নি আমি। কিন্তু আমি বরাবরই জানতুম তোর মত অত জ্ঞান, অত চাতুর্য নিয়ে সুখী হওয়া যায় না। তোর বরকে আমি সে-কথা বলেছি—
আমাকে নিয়ে তোরা কথা বলেছিস ? শ্রীমতী ওয়ায়ু খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।
তোর জন্য, বলে শ্রীমতী ক্যাং নিজের পোষাক ঠিক করে উঠে দাঁড়ালেন।
গভীর রাত্রে ইং এসে খবর দিল, লিনউয়ি তার মার সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে গেছে।
এখন তাঁর অসতর্কতার জন্য ছেলে-বৌর সম্পর্কের চিড়-ধরা জায়গাটা আরও

বড় হল মাত্র। এভাবে বৌর বাপের বাড়ি চলে যাওয়টা নিদারুণ ব্যাপার।
নাঃ, ফেংমোকে বলতে হবে, সে যেন গিয়ে লিনউয়িকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।
ফেংমোকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

ফেংমো যখন ঘরে ঢুকল, তাঁকে ফ্যাকাশে কিন্তু শান্ত দেখাচ্ছিল। খোকা, তোর শাশুড়ির সঙ্গে আমি ঝগড়া করেছি। আমরাই দোষ। নির্বোধ মেয়েমানুষের মত, আমরা দুজনেই নিজের নিজের সন্তানের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করেছি। তোকে এজন্য বলছি যে এটা লিনউয়ির দোষে হয় নি। এখন আমাদের উচিত বৌমাকে আবার ডেকে নিয়ে আসা।

তিনি শঙ্কিত হয়ে দেখলেন যে, ফেংমো মাথা নেড়ে বলল, না—মা, ওকে আমি ডেকে আনতে যাব না। যেমন আছে, তেমনি থাক। লিনউয়ির সঙ্গে আমার বনে না।

কী করে এ-কথা বলছিস তুই? যে-কোন বুদ্ধিমান পুরুষের সঙ্গে যে-কোন বুদ্ধিমতী মেয়ের মিল খায়। বিয়েটা হল পারিবারিক ব্যাপার। এটা একটা শৃঙ্খলার বিষয়। নিজেকে দেখলেই শুধু চলে না।

ফেংমো মুখ তুলে তাকাল। তার চোখে জল। বলল, আমি এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে চাই মা।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর বুকে যেন কেটে বসল কথাগুলি।

ভাইসাহেব বলেছেন, যে, তিনি আমাকে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা করে দেবেন। ফেংমো বলল।

যদি ভাইসাহেব এ-বাড়িতে না আসতেন, তাহলেও কি তুই একথা ভাবতি?

ভাবতাম কিন্তু কাজে কী করে করতে হয় তা জানতে পারতাম না। উনিই আমাকে উপায় বলে দিয়েছেন।

তিনি কোন উত্তর দিলেন না। চিন্তিত ভাবে বসে ছিলেন। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন। বেশ—খোকা, যা তুই, মুক্ত হয়ে চলে যা।

যখন সবে হালকা তুষারপাত হতে আরম্ভ করেছে সে সময় ফেংমো চলে গেল। বাড়ির সবাই ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় জানাল। ফটকের বাইরের রাস্তাটা সোজা খালপাড়ে শেষ হয়েছে। হাতে-হাতে মালপত্র নিয়ে কুলীরা তাকে নৌকোয় উঠিয়ে দিল। নৌকো তাকে লঞ্চ ধরিয়ে দেবে। লঞ্চে করে স্টিমারঘাট। স্টিমারে চড়ে সাগর-মোহনায়। সেখান থেকে জাহাজ ধরবে।

ছোট শরীরে পশমী ফারের পোষাক পরে, যতদূর দৃষ্টি যায়, শ্রীমতী ওয়ায়ু তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর পুত্রের বিদেশ-যাত্রার দিকে। কেমন একটা ভয়-ভয় ও

বিষণ্ণ ভাব তাঁকে ঘিরে ছিল কিন্তু নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করে তুললেন, য, ও এখন মুক্ত।

গায়ে ভাল করে পোষাকটা টেনে নিয়ে তিনি আবার বাড়িতে ফিরে এলেন। ফেংমো চলে যাওয়ায় আঁদ্রে সাহেবের আসাও বন্ধ হত কিন্তু শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁকে ফেংমোর বদলে লিনউয়ির শিক্ষার ভার নিতে বললেন।

ভাইসাহেবকে ডেকে তিনি শান্ত সুন্দর ভঙ্গীতে বললেন, যখন ফেংমো ফিরবে তখন যেন দেখে, তার বৌ-ও কিছু কিছু জেনেছে।

ফেংমো ও লিনউয়ির ব্যাপারটা মিটমাট করে নেওয়া হয়েছিল। একদিন শ্রীমতী ওয়ায়ু নিজেই ক্যাং-এর সামনে লিনউয়িকে বললেন, ফেংমো বাইরে যাচ্ছে। যাবার আগে তিনি লিনউয়িকে নিয়ে যেতে চান, যাতে ওর কোলে একটা বাচ্চা আসে। শুধু যে আমার সংসারের মুখ চেয়ে করছি তা না, তোমার মুখ চেয়েও বলছি বৌমা, যেন তুমি অপূর্ণ না থাকো।

তিনি লিনউয়িব মুখের দিকে ভাল করে দেখলেন—স্বার্থপর, সুশ্রী দেখতে একটি মুখ। ভাল মায়েদের মেয়েরা সর্বদা স্বার্থপর হয়। মিচেন খুবই ভাল মানুষ। সে তার সন্তানদের খুব সুখে রেখেছে। তাদের বাড়িটাকে তারা স্বর্গের মত দেখে আর মাকে দেখে পৃথিবীর মত।

স্বামী বিদেশে থাকার সময় স্ত্রীদের কোল খালি থাকা উচিত নয়, শ্রীমতী ক্যাং আন্তরিকভাবে এ-কথা সমর্থন করলেন। বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হবার পরে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন। লিনউয়ির জন্য কতকটা। তাঁর মনে হল, ফেংমোর অনুযোগের কিছু সারবত্তা আছে। তাই তিনি এখন থেকে লিনউয়িকে অল্প অল্প বকতে আরম্ভ করেছিলেন। ফেংমোর বাইরে যাবার কথা শুনে তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়েছিলেন যেন লিনউয়ি আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায়। যেমন ব্যাকুল হয়ে তিনি একদিন লিনউয়িকে নিয়ে এসেছিলেন, সেরকম ব্যাকুল হয়েই তিনি তাঁকে ফেরৎ পাঠাতে চাইলেন। নিঃশব্দে চলে গেল লিনউয়ি। সে নির্বোধ ছিল না, সে-বেশ স্পষ্টভাবে মায়ের মনের পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিল। তার মনের মধ্যে যেন হুল ফুটছিল; সে নীরবে ফেংমোর মহলে ফিরে এল। বিদেশ যাত্রার আয়োজন করার জন্য ফেংমো খুব ব্যস্ত ছিল। শিগগিরই সে মুক্তি পাবে, এই ভাবনাটা তাকে উৎফুল্ল ও নিরুদ্বেগ করে রেখেছিল। লিনউয়ি সম্পর্কে সে তাই উদাসীন ছিল। সে নিজেই যখন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন লিনউয়ি থাকল কি গেল তাতে খুব বেশী কিছু এসে যায় না।

লিনউয়ি তার নতুন নম্রতা নিয়ে ফেংমোর জামা-কাপড় পাট করে রাখত, বইর ধুলো ঝেড়ে দিত। রাত্রিবেলা একসঙ্গে শুত। সে তাকে আলিঙ্গনে

বেঁধে ফেলত। ফেংমোও নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সঁপে দিত—কিছুটা পরিবারের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে আর কিছুটা কচি বয়েসের জন্য, ভোরবেলা উঠে তারা কথাটি না বলে সরে যেত।

বিদায়—যতদিন না দেখা হয়, ফেংমো বলে গেল।
ঈশ্বর তোমার যাত্রা নিরাপদ নির্বিঘ্ন করুন, সে উত্তর দিল। ফটকের দরজার পাল্লার গায়ে হেলান দিয়ে। সে চলে গেলে, বুকের মাঝখান থেকে একটা ক্ষীণ অনিশ্চয়তার ঢেউ হৃদয়কে দুলিয়ে দিল। তবে নিজের কোন ত্রুটি দেখতে সে প্রস্তুত ছিল না। এখন ঘুম-ঘুম লাগছে। তারপর বড় একটা হাই তুলে বিছানায় ফিরে এসে রেশমী লেপটায় আপদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়ল। লিনউয়ির ওপর তাঁর আস্থা ছিল না বলে, বিকেলে যখন আঁদ্রে ভাইসাহেব আসতেন শ্রীমতী ওয়ায়ু সামনে থাকতেন। লিনউয়িকে আলসেমি করতে দেওয়া চলবে না। তাছাড়া বাড়ির আব্রু রাখার জন্য, যতক্ষণ এই ধর্মযাজক তাঁর পুত্রবধূকে পড়াবেন, ততক্ষণ তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে পড়াবেন। বিশেষ করে যখন ফেংমো বাড়ি নেই। তিনি জানতেন যে আঁদ্রে ভাইসাহেব শুধু তাঁর আত্মাকে নিয়ে বেঁচে আছেন কিন্তু তিনি ছাড়া আর কে বিশ্বাস করতে যাবে যে ভাই-সাহেবের ওই বিশাল অবয়বটা কেবল একটা খোলস মাত্র ?
এইভাবে, মৃতা শাশুড়ির ড্র্যাগনের মাথা-ওয়ালা লাঠিটা হাতে নিয়ে, প্রতিদিন তিনি লাইব্রেরী ঘরে বসে থাকতেন। ভাইসাহেব লিনউয়িকে যা-যা পড়াতেন তিনি সেসব শুনতেন। লিনউয়ির মন যখন অনিচ্ছাসহকারে পড়ানো বিষয়ের ওপর দিয়ে ভেসে যেত তখন তাঁর মন আশ্চর্যের শত শত উপপথ বেয়ে চলে যেত দূরে, বহুদূরে।
এভাবে তিনি জানতে পারলেন কীভাবে সমুদ্র ও পৃথিবী এক গোলকের মধ্যে সন্নিহিত থেকে গ্রহ-তারাদের পর্যটন করে চলেছে! সূর্য ও ন্দ্রের অক্ষপথ, মেঘ ও হাওয়ার গতিপথ—সব জানতে পারলেন। মানুষের বিভিন্ন ভাষার কথা যখন তিনি শুনলেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।
তিনি বিভিন্ন ভাষায় একই শব্দের প্রতিশব্দ শুনে গভীর আনন্দ পেতেন—যেমন জীবন অথবা মৃত্যু বা প্রেম, ঘৃণা, খাদ্য, বাতাস, জল, ক্ষুধা, নিদ্রা, বাড়ি, ফুল, গাছ, ঘাস, পাখি—এরকম শব্দের নানান ভাষায় কী প্রতিশব্দ হয়, তা তিনি জানলেন; অবশ্য যেসব ভাষা ভাইসাহেব জানতেন সেইসব ভাষার প্রতিশব্দ। এই ভাষাগুলি মানবজাতির কণ্ঠস্বর। লিনউয়িকে সাহায্য করার অছিলায় তিনি সবকিছু শিখে নিতেন।
এবং শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের সবকিছু যেন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

আগে তিনি প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবতেন যে কেন তিনি জন্ম-মৃত্যু-জন্মের চক্রাকার আবর্তনের মধ্যে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দেবেন।

ওয়াঙ্-ভবনের এই চার দেয়ালের মধ্যে পুরুষেরা প্রজনন করবে আর মেয়েরা গর্ভবতী হবে বারেবারে, যাতে ওয়াঙ্ বংশ লোপ না পায়, এখন তাঁর মনে একটা জিজ্ঞাসা উঁকি মারছিল যে একটা বংশ লোপ পেলে কী আসে যায়? যে বছর বেশী মেয়ে জন্মাত, যে বছর কোন শিশুর অকাল প্রসব হত, তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়তেন।

এইসব রাত্রিতে তাঁর ঘুম আসত না। নীরবে ইংয়ের হাতে জামা-কাপড় চুল বাঁধার কাজ ছেড়ে দিতেন। তারপর উঁচু বিছানায় উঠে মশারির ভারি পর্দার আড়ালে বসে নিজেকে আত্মার হাতে সঁপে দিয়ে যা-যা শিখলেন সেইসব বিষয়গুলি নিয়ে ধ্যান করতেন। তাঁর কাছে ভাইসাহেব যেন এক গভীর প্রশস্ত কূয়া, শিক্ষা ও জ্ঞানের জলধার।

রাত্রিবেলা অসংখ্য প্রশ্ন মনে উদয় হত। যার উত্তর তিনি খুঁজে বেড়াতেন। কখনো কখনো স্মৃতি, প্রশ্নসংখ্যার আধিক্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। বিছানায় উঠে বসে মোমবাতি জ্বালাতেন। উটের লেজের চামড়া থেকে তৈরী তুলি দিয়ে নিজের সুন্দর হস্তাক্ষরে একটা কাগজের ওপর প্রশ্নগুলি লিখে রাখতেন। পরদিন বিকেলে আঁদ্রে ভাইসাহেব এলে তিনি একে একে প্রশ্নগুলি পড়ে যেতেন এবং উত্তরে তিনি যা-যা বলতেন তা মন দিয়ে শুনতেন।

ভাইসাহেবের উত্তর দেবার ধরনটা বেশ সরল। সেটা তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সম্ভব হয়েছিল। সাধারন লোকদের মত তিনি কেবল বিষয়কে নির্ভর করে কথা বলতেন না বরং প্রাচীন তাওবাদী জ্ঞানীদের মত তিনি জানতেন যে কী করে মুষ্টিমেয় শব্দের মধ্যে সত্যের নির্যাস ভরে দিতে হয়। তিনি পাতাগুলি সরিয়ে, ফলটা তুলে খোসা ছাড়িয়ে, বীচি বের করে ভেতরের শাঁসটাকে টুকরো করে এনে দিতেন।

শ্রীমতী ওয়াঙের মনও এই সময় এত তীক্ষ্ণ, এত ধারাল ও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছিল যে, এই শাঁসটুকু থেকেই তিনি সবকিছু বুঝতে পারতেন। দুজনের মাঝখানে তরুণী লিনউয়ি বসে থাকত। সামান্য যা কিছু কথা বলা হত সে চোখ বিস্ফারিত করে শুনত। সেসব কথা তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অনেক উঁচুতে। তার মন তখনও তারুণ্যে নিমজ্জিত।

আঁদ্রে ভাইসাহেব শ্রীমতী ওয়াঙ্কে প্রশংসা করে বলতেন, আপনার মন এই দেয়ালের মধ্যেই সারাজীবন কাটিয়েছে। তবু আপনি যেমন তাড়াতাড়ি বুঝে নেন, তা শুধু আমি কয়েকজন পণ্ডিত বন্ধুর সঙ্গেই আলোচনা করি।

শ্রীমতী ওয়াঙ্ উত্তর দিতেন, আপনি আমাকে সেই যাদু-কাঁচের কথা

বলেছিলেন, যা দিয়ে ছোট ছোট জিনিসকে বড় করে দেখায়। আপনি বলেছিলেন যে, তাতে একটি বালুকণাকেও মরুভূমির মত বিশাল করে দেখায়। যদি বালুকণাকে ধারণা করা যায় তবে মরুভূমির ধারণাও হয়ে যায়। এই বাড়িটাও তেমনি একটি বালুকণা। এ থেকেই আমি সমগ্রের ধারণা করতে পারি। বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ—এই চারদেয়ালের গণ্ডীর মধ্যেই আমি বিশাল জীবনের ধারণা করে নিতে পারি।

লিনউয়ির বিরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন। লিনউয়ি প্রশ্ন করল, মা আপনারা কি বলছেন যে আমরা বালুকণা? না গো মেয়ে, আমি বলছি যে তোমরাই সমগ্র জীবন।

লিনউয়ির মাথার ওপর দিয়ে ভাইসাহেবের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল: খুকিকে পড়ান আপনি, তিনি বললেন।

মা, আমি খুকি না, লিনউয়ি প্রাপ্তবয়স্কার ভঙ্গীতে বলল।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল। সেদিন বিকেলে আঁদ্রে ভাইসাহেব চলে যাবার জন্য যখন বইপত্র গোছাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন, আমাকেও আপনার ছাত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সাহস করে কি অনুরোধ করতে পারি আপনাকে?

আপনার ইচ্ছা শুনে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি, গুরুগম্ভীর ভাবে ভাইসাহেব উত্তর দিলেন।

তাহলে লিনউয়িকে পড়ানো হয়ে গেলে ঘণ্টাখানেকের জন্য—ভাইসাহেব মাথা নোয়ালেন।

তারপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা ধরে তিনি শ্রীমতী ওয়ায়ুর প্রশ্নের জবাব দিতেন।

পরিণতবয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও, ভাইসাহেবের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি বিবেচকের মত ইংকে দোরগোড়ায় বসিয়ে রাখতেন।

তোমাকে একটা কথা শুধোতে চাই বৌদি। আমার কথাতে যদি তুমি রাগ কর তবে আমাকে যেন খেদিয়ে দিও। একদিন সকালবেলা ইং এসে বলল।

এত বছর যা ইচ্ছে তাই বলে আসার পর আজই তোকে তাড়াতে যাব কেন? শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

হাতের বইটার যে-জায়গাটা পড়ছিলেন, সে পাতাটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চিহ্ন করে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ইংয়ের দিকে।

আমি যা বলব, তা শুনে তুমি খুশি হবে না গো। যখন এই বিরাট চেহারার পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে তুমি সারা পিথিমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তোমার ঘর গেরস্তালি

তখন একেবারে নয়-ছয় হয়ে যাচ্চে। চাদ্দিকে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে। ওই যে বড় বৌমার কাঁচ বাচ্চাটাকে বুকেব দুধ দেবার জন্য ধাই-মা রাখা হল, তেনার বুকের দুধ গেছে শুকিয়ে। বাচ্চাটা শুকিয়ে শুকিয়ে কঞ্চির মত রোগা হয়ে গ্যাচে। মেজবৌমার ঝির কাছে শুনতে পেনু যে মেজবৌমার এখনও বাচ্চাকাচ্চা হবার কোন নাম নেই। রাতদিন তাদের কোঁদল লেগেই আছে। 'আর ওই যে কী যেন গো, হ্যাঁ নতুন বৌদি আর দাদাবাবু—বেশ ওসব ছোটমুখে বড় কথা বলব নি। তবে বৌদি, তোমার মত মানুষের পক্ষে এটা ভারি অন্যায় কাজ যে, তাকেও তুমি তোমার মত নেকাপড়া শিকুচ্চো। আমাদের বাপ-ঠাকুদ্দারা যে শিকিয়ে গ্যাচেন মেয়েমানুষেরা নেকাপড়া করবে নি, তা কি মন্দের জন্য? স্মিতমুখে শ্রীমতী ওয়ায়দ সব কথা শুনলেন। হাতের বইব চিহ্ন-কবা জায়গাটা থেকে বুড়ো আঙুলটা বেরিয়ে এল। তিনি বইটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর বললেন, অনেক ধন্যবাদ তোকে।

তিনি উঠে শোবার ঘরে গেলেন। সকালবেলার হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। বেরুবার আগে একটা ফার কোট পরে নিলেন। চত্বরের বাগানে হিম লেগে অর্কিডগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং পাতাগুলি মাটিতে ঝরে পড়ছিল।

মৃতা শাশুড়ির শূন্য মহলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর মনে হল, লিয়াংমো ও তার পরিবার যদি এখানে থাকে তবে বেশ ভাল হয়। তাহলে তিনি ওদের ওপর নজর রাখতে পারবেন। আর সেমো এলাংকে লিয়াংমো এখন যেখানে আছে সেই মহলটা দিতে পারবেন। তাতে বেশী জায়গা পেয়ে ওদের জীবনে শান্তি আসবে।

দিনটা বেশ আলো ঝলমল। স্বচ্ছ রোদ্রালোকে তিনি এমন একটা সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে হাঁটছিলেন যার কারণ নিজেরই অজানা। পৃথিবীর এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চার দেয়াল ঘেরা জায়গাটুকু অনবরত নানা মানবিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। তিনি অনুভব করলেন, ওই সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পারেন। এমন কি সে-সবের মীমাংসাও করতে পাবেন। কারণ তিনি আর ওদের কেউ নন। শ্রীযুক্ত ওয়ায়দের সঙ্গে যৌনবিচ্ছেদের পর সব বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করে দিয়েছেন। শরীরে শরীর মেশানোর মধ্যে দিয়ে পড়ে-ওঠা এই শক্তিশালি রহস্যময় সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাবলেন তিনি। এই সম্পর্ক ছিঁড়ে দিলে তা শুধু দেহকেই নয় আত্মাকেও মুক্তি দিতে পারে। তাঁর আত্মা এখন যে-পথে ভ্রমণ করছে, সে-পথ চলে গেছে নিখিল ভুবনের প্রতিটি প্রান্তে। এই ভাবে তিনি যখন লিয়াংমোর মহলে পা দিলেন তখন তা নিছক আগমন করা হল না, তা হয়ে উঠল এক দেবীর আবির্ভাব।

বাচ্চাটার কাঁদার শব্দ কানে বেদনাময় তীক্ষ্ণ ধ্বনির মত আঘাত করল। তিনি

সবকিছু ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। মেং বসেছিল, আর বুকের দুধ দেবার জন্য যে ধাইটিকে রাখা হয়েছিল সে ক্ষুধার্ত শিশুটির মুখে তার শূন্য স্তন দিয়ে রেখেছিল। ছেলেটি প্রাণপণে স্তন চুষছিল এবং কিছুই না পেয়ে মাথা সরিয়ে রাগে দারুণ চীৎকার করছিল। ধাইর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরছিল।

কী হল ? তোমার বুকের দুধ কী করে শুকোল ? শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন তাকে। মেং-এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ওকে তুমি কাঁকড়ার সুপের সঙ্গে ডিম পোজ করে খাইয়ে দেখেছ ?

সব চেষ্টাই করেছি মা ; প্রথমটায় ভেবেছিলাম যে তেমন কিছু না ; একটু ঠাণ্ডা মতন লেগে থাকবে বা খাওয়া-দাওয়া বেশী হয়ে গিয়ে থাকবে ; তাই চালের গুঁড়ো দিয়ে ওই যে লপসি মত বানায় না, তা দু-একবার খাইয়ে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাচ্চাটা খেতে পাচ্ছে না। কেমন রোগা হয়ে গেছে এই কদিনে দেখুন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু ও-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মেং-এর সঙ্গে কথা বললেন, আমার শাশুড়ির মহলে তোমার আর লিয়াংমোর থাকার বন্দোবস্ত করেছি। জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য আজই চাকর-বাকরদের পাঠাচ্ছি।

মেংকে কোন উত্তর দেবার ফুরসৎ না দিয়েই তিনি সেমোকে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

এই সময়ে বাজারে তাদের ফসলের কারবার তদারক করবার জন্য সেমোর বেরিয়ে পড়বার কথা। কিন্তু সে তখনও ঘরে ছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাকে তার চাতালে বসে মুখ কুলকুচি করতে দেখলেন। অনেক ভোরে বেরিয়েছ তো মা !

এই দেখাশোনা করতে ঘুরছি। তোকে যে-কথাটা বলতে এলাম তা হল লিয়াংমোকে আমি তোর ঠাকুমার মহলে থাকতে বলেছি। তাতে নাতিদের চোখে চোখ রাখতে পাব। লিয়াংমোর মহলটা তোকে দেব।

রূলানকে বলব খনে, সেমো বলল।

রূলানের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে সেমোর মুখে যেন এক পোঁচ ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়ল। গণ্ডগোল আঁচ করলে তিনি যেমন সোজাসুজি কথা বলেন, সেভাবেই বললেন, শুনলাম রূলাং নাকি রাত্রিবেলা কান্নাকাটি করছে ?

তোমাকে কে বলল, সংক্ষিপ্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল সেমো।

ঝি-চাকরদের মুখ থেকে শুনলাম। বাড়ির কোন গণ্ডগোল নিয়ে যখন চাকর-বাকরা আলোচনা করে, তখন ভারি লজ্জাকর হয়ে দাঁড়ায়।

সেমো বলল, ঠিকই বলেছ মা। ওকে বিয়ে করা উচিত হয়নি আমার।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভালবাসা কি এর মধ্যে শুকিয়ে গেল ?

এর উত্তরে সে হ্যাঁ কি না কিছুই বলল না। চত্বরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বললেন, তুই বাইরে কোথাও ঘুরে আর কিছুদিন। ফিরে আসার পর নম্র ভাবে ব্যবহার করবি ওর সঙ্গে, একগুঁয়েমি করবি না। ওকে কখনো মনে করিয়ে দিবি না যে ও তোর চেয়ে বয়েসে বড়, আর ওই তোকে আগে চেয়েছে।

তুমি কী করে জানলে মা যে ও-ই আমাকে প্রথমে চেয়েছিল ? পায়চারি করা থামিয়ে সে প্রশ্ন করল। তুমি কী করে সব কিছু জানতে পারো ?

চোখ দিয়ে দেখি। লাঠির ওপর কনুই রেখে এবং করতলের মধ্যে নিজের গোল মুখটা রেখে তিনি বললেন। ও তোকে ভয় পায়, আর ভয় পায় বলে ঘেন্না করে নিজেকে। নিজের ভালবাসাকেও ভয় পায় ও। হ্যাঁ, ওকে আমার কাছে রেখে দূরে কোথায়ও চলে যা। নারী-পুরুষের মধ্যে একটা নিয়ম মেনে চলতে হয়। তোরা তা মানিস নি। মেংকে দ্যাখ—ওর সবকিছুই এভাবে চলে যেন তা ঈশ্বরের বিধান, তার জীবনে ও সংসারে কত সামঞ্জস্য! একে ওর কোলে ছেলে আসছে, লিয়াংমো ওকে নিয়ে কত সন্তুষ্ট! ওদের কেউই অন্যজনকে খুব বেশী ভালবাসে না আর একসঙ্গে ওরা ওদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সৃষ্টি করে চলেছে।

রুলান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার জানলার সামনে ছোট চাতালে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে তা না শোনার ভান আর সে করতে পারছিল না। শ্রীমতী ওয়ায়্‌ বেশ বুঝতে পারলেন, রুলান সব কিছু শুনেছে।

এই যে বৌমা তুমি, আমি সেমোকে বলছিলাম যে, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে তোমরা লিয়াংমোর সঙ্গে চলে যাও। ওরা তোমাদের ঠাকুমার ঘরে থাকবে। ওরা ওখানে থাকলে আমি নাতিদের দেখাশোনা করতে পারব।

আপনাকে ধন্যবাদ মা, রুলান বলল। কিন্তু তার চোখে বা গলায় ধন্যবাদের লেশ ছিল না। সে একটা বিচ্ছিরি পোষাক অযত্নে পরে এসেছিল। ধূসর ও সবুজ রংয়ের চৌকো চৌকো খুপরি একটার পর একটা সাজিয়ে নক্সা আঁকা সেই পোষাকে। তাকে বয়েসের চেয়ে বেশী বুড়ী বুড়ী দেখাচ্ছিল। সেমো বাইরে গেলে, ওকে বেশবাস করতে শেখাতে হবে, শ্রীমতী ওয়ায়্‌ ভাবলেন। তিনি চিন্তিত ভাবে পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। তাঁর এই তাকিয়ে-থাকা দেখে সেমো রুলানের আরো কিছু দোষ আবিষ্কার করল।

ওই পোষাকটা দেখে আমার ঘেন্না ধরে যাচ্ছে, সে তীব্রভাবে বলল। আরেকটা কিনে দিও, খাটো চুল এক ঝাঁকুনিতে পেছনে সরিয়ে সে উদ্ধত ভাবে বলল।

শ্রীমতী ওয়ায়্ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন। এদের ঝগড়াঝাটির সময়ে তিনি থাকতে চান না। যাতে ওদের ভেতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে হয়। সেমো কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে। আমি ওকে অনুমতি দিয়েছি। ওর যাবার দিন পর্যন্ত শান্তিতে থেক দুজনে। নতুন মহলে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার আয়োজন করো।

সেমো গেলে আমিও যাব বুলাং বলল।

তার হতশ্রী পরিচ্ছদ পরে সে ঋজু হয়ে দাঁড়াল। দুহাত শরীরের দুপাশে ঝুলছিল।

তুমি যাবে না। তুমি আমার কাছে থাকবে। তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। আমি তোমাকে শেখাব।

এবারও তিনি তার এই পুত্রবধূটিকেও জবাব দেবার কোন ফুরসৎ দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিরে চলে গেলেন দ্রুতপায়ে। একবারও ফিরে তাকালেন না। শ্রীমতী ওয়ায়্ চলে যাওয়ার পর বুলাং তাঁর বিক্ষুব্ধ চোখজোড়া মেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে স্বরে বলল, আমাকে ফেলে তুমি চলে যেতে চাও?

এটা আমার মার পরিকল্পনা। সেমো হালকা স্বরে বলল।

মাথাটা পেছনে হেলিয়ে সে কপালের ওপর এসে-পড়া কয়েকটা চুল ঠিক করে নিল। সেমোর হাতের দিকে নজর পড়তেই সে তার বুকের মধ্যে তীব্র আকর্ষণ বোধ করল। সেজন্য এখন নিজের ওপর খেপ্না ধরল তার।

আমিও চলে যাব।

সেমো হাসল। তা বলে আমার সঙ্গে নয়—তাহলে এ-বাড়িতে ফেরার সাহস হবে না আমার।

তোমার মাকে তুমি ভয় পাও। বুলাং চেঁচিয়ে বলল।

তা বটে। সে একমত।

এইভাবে একমত হয়ে যাওয়াটা তার একটা কৌশল। অনেকবারই সে বিতর্কিত বিষয়ে বুলানের মত মেনে নিয়ে বুলানের কলহের তূণীর নিরস্ত্র করে দিত।

আমার ছেলেরা আমাকে যদি ভয় পায় তবে সেরকম ছেলে যেন আমার না হয়।

তা তোমার তো কোন ছেলে নেই, প্রশান্ত স্বরে সে বলল। এই পুরোনো বিদ্রূপে তার পাঁজরা যেন গুঁড়িয়ে গেল। যতই এতে অনাহত ও অবিচলিত থাকার চেষ্টা সে করুক না কেন, এই বিশেষ বিদ্রূপটি প্রতিবারই লক্ষ্যভেদ করেছে মর্মে। সেমোর কাছে এগিয়ে গিয়ে সে ফিসফিস করে বলল, সেমো তুমি কি সত্যি আমাকে ঘেন্না করো?

সেমো তার মুখের দিকে তাকাল। সে দাঁত চেপে বলল, কেন তুমি সবসময় আমাকে আহত করো তোমার ধারালো কথায়, একটুও শান্তি পেতে দাও না?

আমার কাছ থেকে শান্তি পাও না ? [redacted]

তীব্র আবেগের সঙ্গে কথা বলল বৃলাং।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ঠিক এই মুহূর্তে যখন সে সেমোর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছে তখন শ্রীমতী ওয়ায়ুর কথাই মনে পড়ল তার। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ চরিত্রের মেয়ে বলে সে তক্ষুনি সেমোর পাশ কাটিয়ে চত্বর পেরিয়ে সোজা লাইব্রেরী ঘরে হাজির হল। যেখানে শ্রীমতী ওয়ায়ু বসে তাঁর ছোট্ট পাইপে ধূমপান করছিলেন।

মা, আমাকেও আপনি মুক্তি দিন। বৃলাং বলে উঠল কেঁদে।

তার কান্নার শব্দে শ্রীমতী ওয়ায়ু যেন তাঁর নিজের আত্মার ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনলেন। কিন্তু তার হতবুদ্ধি ভাবটা প্রকাশ করলেন না। হাত থেকে পাইপটা টেবিলের ওপর রেখে, দীর্ঘদেহিনী পুত্রবধূর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, শান্ত হও, বসো। চুলটা ঠিক করে নাও। চোখদুটো মোছ। তোমার কথা ভাবার আগে, তোমাকে বলতে চাই, ওই জামাটা তুমি যেন আর পরো না। তোমার উজ্জ্বল বাহারী রংয়ের পোষাক পরা উচিত। রংয়ের আনন্দ তোমাকে আনন্দের রংয়ে রাঙিয়ে তুলবে, ম্রিয়মান বিমর্ষতার অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোর আনন্দ ফুটবে তোমার জীবনে। এখন বলো, কী ভাবে তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি?

আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাই—সেমোর কাছ থেকে দূরে যেতে চাই বৃলাং উত্তর দিল। শ্রীমতী ওয়ায়ুর ইঙ্গিত মত না বসে সে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ুর কোন কথাই তার মাথায় ঢোকে নি, দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল সে। তিনিও তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

আমি তো তোমাকে বলেছি, যে সেমো চলে যাচ্ছে। তুমি তার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

আমি চিরকালের জন্য ওর হাত থেকে মুক্তি চাই। বিয়ে করাই উচিত হয় নি আমার! ওর ওপর আমার দুর্বলতার জন্য নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। আমি যেন একটা ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়েছি। ওর ইচ্ছেমতনই আমাকে চলতে হয়, আমার ইচ্ছেমত কখনও ও চলবে না।

এজন্য কি ওকে দোষ দেওয়া যায়? শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

আমাকে ছেড়ে দিন মা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অদ্ভুত রাগী মেয়েটিকে আবার পছন্দ করতে শুরু করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবে তুমি? স্বামীর আশ্রয়ের বাইরে মেয়েদের স্থান কোথায়? ধরো যদি এই বাড়ি থেকে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলেও কি তুমি মুক্ত হতে পারবে? যে মেয়ের স্বামী নেই—তাকে

ভয় পেয়ে বুলাং তাঁর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমি কীভাবে মুক্তি পাব তা আমাকে বলে দিন।

শ্রীমতী ওয়ায়্রে ভারী মায়া হল মেয়েটির জন্য। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, হায় মা, তা আমি তোমাকে বলে দিতে পারব না, কারণ আমি নিজেই তা জানি না।

আপনি কি কখনো কাউকে ভালবাসেন নি ?

শ্রীমতী ওয়ায়্র চোখ নিচু করলেন। কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর মনে হল যে সেমো এই মেয়েটির ওপর যেভাবেই হক ভুল করেছে। এর যা বক্তব্য তা সে বুঝবে কেমন করে। সে তো শুধু একাই ছিল, যদি তা এই মেয়েটির পক্ষে যথেষ্ট না হয় তা সে বুঝবে কী ভাবে। তিনি অনুভব করলেন যে শ্রীযুক্ত ওয়ায়কে তিনি যে খুব বেশী ভালবাসতে যান নি সেটা তাঁর সৌভাগ্যই। যখন তাঁর খুব অল্প বয়েস, তখন এ থেকে বিপদ ঘটতে পারত। তাঁর খুঁৎখুতুনিই তাঁর রক্ষাকবচের কাজ করেছিল। বুলাং-এর কোন খুঁৎখুতুনি নেই।

যদি তোমার একটা বাচ্চা থাকত, তবে তুমি ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারতে। অন্তত তোমার ভালবাসা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেত। শিশুর প্রয়োজন অনেক, আর তুমিও তা দিতে যাও। অথবা এ-রকমও হতে পারে, যেহেতু তোমার কোন বাচ্চা নেই, তুমি পড়াশোনা বা ছবি-আঁকা অথবা ঐরকম কিছু নিয়ে থাকতে পারতে। মা, তোমাকে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে দিতে হবে তোমার মনকে। তুমি তোমার সব শক্তিকে এক গভীর ও সংকীর্ণ নদীখাতে বইয়ে দিয়েছ। এখন তুমি শাখানদী খাল এসব তৈরী করো এবং সেইসব পথে তোমার ভালবাসাকে প্রবাহিত করে দাও।

জোর করে, বলছেন ?

যদি সেরকম দরকার হয়, তবে তা-ও। কারণ, এটাই তোমার শান্তি পাবার উপায়। নাহলে তুমি যে মারা পড়ে যাবে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তা না করলে ও তোমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারবে না। ও এখন সেই অবস্থারই কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই ওকে আমি তোমার কাছছাড়া হয়ে অন্য কোথাও দু'দিন ঘুরে আসতে বলেছি।

বুলাং তার ফ্যাকাশে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, সব পুরুষমানুষই কি ওর মত ?

জলে যেমন পুঁটিমাছ সব একরকম পুরুষমানুষরাও তেমনি। মেয়েরা যখন তাদের সেটা আবিষ্কার করে তখনই তাদের মুক্তি।

তবে আমি শুধু সেমোকেই কেন ভালবাসি
সেটা হয়ত ওর চেহারার কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য ; ওর ভুরুর টান, ঠোঁটের গড়ন, কোটের মধ্যে ফুটে-ওঠা ওর কাঁধের আকৃতি, ওর হাত—

আপনি কী করে জানলেন, বিড়বিড় করে বুলাং বলল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু হাসলেন। জানো, বিধাতা তাঁর সৃষ্টি চালাবার জন্য অনেক মায়া, অনেক ফাঁদ পেতে রেখেছেন।

বুলাং এ কথায় রাগ করতে পারল না। সে ফাঁদে-পড়া হরিণীর মতো ছটফট করছে বইতো নয়। তিনি বুঝলেন কি করুণ আর কত সুতীব্রভাবে বুলাং সেমোকে ভালবেসেছে। তিনি তার সবকিছু মার্জনা করলেন।

তিনি তাঁর ক্ষীণ হাতদুটি দিয়ে বুলাংয়ের একটি হাত নিয়ে মৃদুভাবে চাপড়ে দিলেন। তারপর বললেন, আর কষ্ট পাবে না। এ-বাড়িতে কেউ কষ্ট পাবে, তা আমি চাই না। দ্যাখো, তোমাদের সুখী করাই এখন আমার ধ্যানজ্ঞান। বল বৌমা, কী পেলে তুমি সুখী হবে ?

তাঁর ওই মমতামাখা সুন্দর কথায়, সুরেলা কণ্ঠস্বরে বুলাং অভিভূত না হয়ে পারল না। সে শ্রীমতী ওয়ায়ুর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল ও তবে যাক ! আপনার কথাই আমি শুনব মা, নম্রভাবে বুলাং বলল।

বুলাং চলে গেলে তিনি শান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবলেন, আমিও তো নিজের শান্তি চাই।

দীর্ঘ শান্ত দৃষ্টিতে বসে শ্রীমতী ও[illegible] যেন নিজের বাড়ির কথা বিস্মৃত হয়েছেন। ভাইসাহেবের রোদেজলে তৈরী [illegible] বাদামী মুখের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়ে তিনি ওঁর এই ছাত্রীটির জ্ঞান-ভাণ্ডার এমন ভাবে পূর্ণ করে দিতে লাগলেন, যেভাবে আর কাউকে দেন নি। নির্মল স্বচ্ছ বুদ্ধিমতী তবু কত তরুণ তাঁর মন। তিনি তাঁকে পৃথিবীর ইতিহাস পড়ালেন বিভিন্ন জাতির পতন অভ্যুদয়ের কাহিনী শোনালেন [illegible] জাতির পতনের কথা বললেন। তিনি তাঁকে বিদ্যুৎ ও বেতার আবিষ্কারের গল্প বললেন, যে শব্দতরঙ্গ মানুষের কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয় তার কথা শোনালেন।

এইসব কথা ও গান ধরার মত গ্রাহক-যন্ত্র আপনার আছে ? শ্রীমতী ওয়ায়ু আজ জিজ্ঞেস করলেন।

আছে, আমি নিজেই একটা বানিয়েছি।

এখানে নিয়ে আসবেন একবার ? আগ্রহসহকারে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

একটু ইতস্তত করলেন ভাইসাহেব। তারপর বললেন, হায় ! জানেন ওই

যন্ত্রটা মেলাই তার খাটিয়ে দেয়ালের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আপনি— আপনি কি আমার কুটিরে দয়া করে একবার এসে দেখে যেতে পারবেন ?

একটু ভেবে নিলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। সঙ্গে কাউকে নিয়ে হলেও, তিনি একজন কুলবধূ হয়ে কীভাবে জনৈক বিদেশীর বাসস্থানে যাবেন! হঠাৎ তার ভারি লজ্জা লাগল। তিনি কোনরকমে বললেন—হয়ত। বলেই মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

বিব্রত হবেন না। আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই, যাতে আপনি বিব্রত হতে পারেন! আমার ভেতরের পুরুষমানুষটা মরে গেছে। ঈশ্বর তাকে নিহত করে রেখেছেন, ভাইসাহেব বললেন।

এই বিচিত্র কথাগুলি উচ্চারণ করে ভাইসাহেব চলে গেলেন। আর তাঁর চলে যাওয়ার পর তিনি যেমন স্বস্তি অনুভব করেন, সেরকম স্বস্তি অনুভব করলেন। তাঁর মনে তিনি অনেক ভার চাপিয়ে দিতেন। তিনি স্মিতমুখে বসে বসে ভাবছিলেন আর পাইপ টানছিলেন। তাঁর মন সারা পৃথিবীতে বেড়াচ্ছিল। যে-পৃথিবীর কথা ভাইসাহেব এইমাত্র বলে গেলেন। আচ্ছা আমি কি কখনো এই শহরের বাইরের পা দিতে পারব? ওইসব জাহাজে করে পাড়ি দিতে পারব বা উড়ে যেতে পারব সুদূরে? তিনি চুপচাপ বসে ভাবছিলেন।

দিনের পর দিন তিনি বাড়ির সবাইর সঙ্গে মিশছিলেন, খাবার টেবিলে তাঁর নিজের আসনে বসে সবাইর দিকে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁদের দেখছিলেন না। তাঁর মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল অজানার মধ্যে। একদিন তো তাঁর জড়োয়া গয়নাগুলি সাফ করার সময় ইং এ নিয়ে একেবারে দারুণভাবে ফেটে পড়ল। শীতের মাঝামাঝি একটি দিন। শ্রীমতী ওয়ায়ু টেবিলে নুড়ি-বসানো একটা পাত্রে কিছু লিলিফুল সাজিয়ে রেখেছিলেন, ঘুলঘুলি দিয়ে সূর্যের আলো সেই মুহূর্তে এসে পড়েছিল ওই ফুল ও গয়নায় বসানো দামী পাথরগুলির ওপর।

দ্যাখ দ্যাখ কী একরকম এরা সব দেখতে—এই পাথরগুলি আর ফুলেরা, মুক্তো, পান্না, পোখরাজ আর ফুলে পাঁপড়ির সাদা-সবুজ-হলুদ রংয়ের বাহার।

হাতের ব্রেসলেটটার দিকে তাকাল ইং, বৌদি তুমি তো এসব খুব চটপট দেখে নাও, কিন্তুক বাড়িতে যে কী ঘটছে তা তুমি দেখতে পাও? সে বলল।

আমি দেখি না-টা কী, অপরাধী অপরাধী ভাবে শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রশ্ন করলেন। তাঁর মনে স্বভাবতই দুই পুত্রবধূর কথা উঁকি দিচ্ছিল।

কেন, দাদাবাবু, ইং বলল।

তাঁর আবার কী হল? তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ফাড়পাড়ায়, ইং সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিল।

না, না, উনি সেখানে যাবেন না ! শ্রীমতী ওয়ায়ন্ বললেন।

উনি যাচ্চেন। ইং জোর দিয়ে বলল। ওখানে যাওয়াটা বড় কতা নয়, অনেক ব্যাটাছেলেই যায় ; কিন্তুক কথাটা হচ্ছে কি, তিনি যদি কোন বিচ্ছিরি রোগটোগ ওখান থে নিয়ে আসেন এ-বাড়িতে তখন কী হবে ?

শ্রীমতী ওয়ায়ন্ গভীর ভাবে ভাবলেন এক মুহূর্ত। তোর নতুন বৌদিকে এখানে ডেকে দে, তিনি বললেন।

ইং চিউমিংকে ডেকে দিল। গর্ভের ভাবে তার গতি মন্থর, মুখের রেখাও বদলে গেছে। চোখদুটো বড় বড় দেখাচ্ছে। ঠোঁট টুকটুকে লাল।

শ্রীমতী ওয়ায়ন্ তাঁর ছোট্ট পাইপটা ভরে নিয়ে জ্বালিয়ে বারদুয়েক টেনে আবার টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। টেবিলের ওপর অল্প একটু ছাই পড়ল। চিউমিং ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে দিল।

হ্যাঁ দ্যাখো, উনি কি মেয়েপাড়ার যাতায়াত করছেন নাকি ? তিনি বললেন। চিউমিং-এর মুখ লাল হয়ে উঠল।

সে বলল, শুনেছি যে তিনি যান। তবে আমাকে কখনো সেকথা বলেন নি।

তুমি নিজে বুঝতে পাব না ? শ্রীমতী ওয়ায়ন্ প্রশ্ন করলেন যে, তোমার ওপর ওনার টান কতটা ?

সে যাই হক না কেন, আমার পক্ষে তা বেশী, কারণ আমি তাঁকে ভালবাসতে পারি নি। বিষণ্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে সে কথাগুলো বলল। শ্রীমতী ওয়ায়ন্ শুনলেন, শুনে শ্রীযুক্ত ওয়ায়নের প্রতি গভীর করুণা অনুভব করলেন।

তিনি বললেন, আমরা দুজনেই তার ক্ষতি করেছি—আমার বেশী বয়েসের জন্য আর তোমার অল্প বয়েসের জন্য। তুমি কি ওঁকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছিলে ?

চিউমিং তার সরল কালো দু' চোখ তুলে বলল, ও হ্যাঁ, তা করেছিলাম। তা কি আমার কর্তব্য নয় ?

বটেই তো, তা তোমার কর্তব্য বই কি, শ্রীমতী ওয়ায়ন্ বললেন।

আমিও তাই জানি ! চিউমিং আবার তার বিষণ্ণ গলায় বলল। আমি তাঁর সব কথা শুনে চলি।

উনি কি জানেন যে তুমি তাঁকে ভালবাস না ? শ্রীমতী ওয়ায়ন্ আবার জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, উনি আমাকে জিজ্ঞেস করায় আমি ওঁকে বলেছি সেকথা।

আঃ-হাঃ, না বললেই পারতে ! শ্রীমতী ওয়ায়ন্ বললেন। তারপর স্বগতোক্তি করলেন, যদি প্রতিটি মেয়েই পুরুষদের এভাবে সত্যিকথা বলে তবে কী ঘটবে ?

[illegible] তো খোকা, চিউমিং বলল।

তাই উনি মেয়েপাড়ায় যেতে শুরু করেছেন, তিনি ভাবলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষের মধ্যেকার সমস্যার যেন কোন শেষ নেই। তোমার বাচ্চা হবে কবে?

আসছে মাসে।

তুমি খুশি তো, শ্রীমতী ওয়ায়ু আচমকা প্রশ্ন করলেন।

চিউমিং যখন কথা বলত না, তখন সে সবসময়ই একটা বিশেষ ভঙ্গিমায় থাকত—কোলের ওপর দুহাত জড়ো-করা, চোখ নিচের দিকে নাবানো এবং কাঁধ ঝুঁকে পড়া। তাকে যখন প্রশ্নটা করা হল, তার হাতদুটি আরও শক্ত হয়ে গেল, সে চোখ তুলে তাকাল।

এ-বাড়িতে আমার নিজের বলতে একটা জিনিস হবে, বলে সে আবার চোখ নিচু করল।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মনে হল যে মেয়েটির কাছ থেকে আর বেশী কিছু জানার নেই। তিনি চিউমিংকে বললেন, আচ্ছা এসো, ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি, উনি কি ভাবছেন।

শান্ত সরল ভঙ্গিমায় চিউমিং উঠে দাঁড়িয়ে নত হয়ে অভিবাদন করল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি হল। রাত্রের খাবার সময়ের কিছু আগে, ইংকে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর কাছে পাঠিয়ে তিনি যে দেখা করতে যাচ্ছেন, সেখবর পাঠালেন। খবর পেয়ে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তক্ষুনি স্বয়ং চলে এলেন।

আমিই চলে এলাম গো, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন!

শ্রীমতী ওয়ায়ু অবাক হয়ে দেখলেন যে তিনি আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছেন। নিজেকেই দোষ দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর দুজনে বসলেন। যতই তাঁকে দেখছিলেন, ততই তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়ছিল। মোটেই ভাল দেখাচ্ছিল না তাঁকে। তাঁর উজ্জ্বল ও চঞ্চল চোখ এখন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তাঁর ঠোঁট যেন ফ্যাকাশে।

তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে তোমার কি অসুখ করেছে?

মোটেই না, তিনি উত্তর দিলেন।

তুমি কিন্তু ভাল নেই।

বেশ ভাল আছি।

চিউমিং?

ও আমার জন্য যথেষ্ট করে।

কিন্তু তোমার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে কিছু অপ্রতিভ দেখাল। তিনি বললেন, দ্যাখ সেটা অল্প-বয়েসী একটি মেয়ের পক্ষে শক্ত কাজ। আমি তো আর অল্পবয়েসী নই।
এবার তিনি নগ্ন সত্যকে উপস্থাপিত করতে চাইলেন, আমি শুনতে পেলাম যে তুমি নাকি মেয়ে পাড়ায় যাচ্ছ!
শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু কাঁধ ঝাঁকালেন। তাঁকে বিন্দুমাত্র লজ্জিত দেখাচ্ছিল না। তিনি বললেন, মাঝেমধ্যে ক্যাং ভাইর সঙ্গে যাই বটে, হ্যাঁ দ্যাখো, ভালবাসার প্রত্যাশা না করে, ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মেয়েমানুষ কেনাটা অনেক সোজা কাজ। একটা ভান-করার ব্যাপার থাকে। এটাই সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার। তোমার কাছে কখনো ভান করি নি। আইলীয়েন, তোমাকে এত ভালবেসেছি, এখন এই চিউমিংকে আমি ভালবাসতেও পারি না আবার ভাল না বাসতেও বাঁধে—তিনি মাথাটা চুলকে নিয়ে তাকালেন—তার চেয়ে সোজাসুজি ওসব মেয়েমানুষের কাছে যাওয়াটাই ভাল।
পরের মাসে তোমার ছেলে হবে।
ও, হ্যাঁ। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কী জানো, আমার মনেই হয় না যে আমারই ছেলে। তোমার আর আমার—আমাদের তো চারটি ছেলে আছেই। আমার মনে হচ্ছে, এই চিউমিংকে কোন কাজে লাগবে না এ-বাড়িতে। একটু পরে তিনি বললেন।
শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু আবার মাথা চুলকে নিলেন, হয়ত…হয়ত সেকথা ঠিকই, একমত হয়ে তিনি বললেন।
আমি তো ভেবে ছিলাম যে তুমি বুনোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো নি। শ্রীমতী ওয়ায়ু তীক্ষ্ণস্বরে বললেন।
দোষস্বীকার করার ভঙ্গীতে তিনি বললেন, ওর সঙ্গে আমি খুব নরম ব্যবহার করেছি।
তুমি ওকে কিছু কিনেটিনে দাও নি।
তা সত্যি। ভুলে গিয়েছিলাম, প্রত্যেকবারই ভুলে গিয়েছিলাম।
আচ্ছা বল তো মেয়েমানুষের কাছে তুমি কী চাও?
একটু অপ্রতিভ দেখাল শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন মেয়েমানুষের?
যেকোন মেয়েমানুষ, তিনি বললেন।
প্রশ্নের মধ্যে অধৈর্যের সুরটা তাঁর কান এড়াল না। তাঁকে প্রসন্ন রাখার জন্য সবসময়ই তিনি চেষ্টা করে এসেছেন; সেজন্য প্রশ্নের বিষয়ের ওপর তিনি মনোযোগ দিলেন।
তারপর ভেবেচিন্তে বললেন, বেশ তবে বলি, এইযে আমি—এ পর্যন্ত বলে তাঁর

মনেহল, আরম্ভটা বাজে হল। এভাবে শুরু না করলেই হত। তাই তিনি আবার শুরু করলেন, মেয়েমানুষের কাছে আমার চাহিদা খুব বেশী কিছু না। আমি চাই যে…। মানে যাকে বলে, মানে আমি হাসতে চাই—তুমি তো জানই। আমি বেশ মজাব কৌতূহলোদ্দীপক কিছু শুনতে পছন্দ করি—তুমি আমাকে সেরকম কত বিষয়েই তো বলতে। তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে সেসব শুনে আমি কেমন হেসে উঠতাম। এই আর কি—একটা অনির্দিষ্ট ভাবের মধ্যে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

আমি তো আর তোমাকে চিরকাল আমোদ দিতে পারি না, তিনি বলে উঠলেন।

না, না, নিশ্চয়ই না। তাই দেখছই তো যে, আমি অন্য মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি।

ওখানে কী হয়? শ্রীমতী ওয়ায়্ প্রশ্ন করলেন। নিজের কৌতূহল দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন।

তেমন কিছু না, প্রথমটায় আমরা কিছু খানাপিনা করি। এই তারপর একটু জুয়াটুয়া খেলি। মেয়েগুলো বাঁশী বা ওই জাতীয় কিছু বাজায় বসে বসে।

মেয়েগুলো? ওখানে কজন মেয়ে থাকে?

পাঁচ—ছয়—মানে যারই ফুরসৎ আছে। ক্যাং আর আমি—হ্যাঁ আমাদের দয়াদাক্ষিণ্য একটু বেশী—তাই সাধারণত ওরা—তাঁর গলা কেঁপে উঠে থেমে গেল।

তারপরে? তিনি প্রশ্ন করলেন।

আবার চিন্তা করে তিনি শুরু করলেন, বেশ, হ্যাঁ দ্যাখো বিকেল-সন্ধ্যা কী চটপট ফুরিয়ে যায়। মেয়েগুলো যেন এক একটা গল্পের জাহাজ আর অনেক খেলা হেঁয়ালি জানে।

বলতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি মিটি মিটি হাসছিলেন।

তোমরা সারারাত ওখানে কাটাও?

একেবারে তেমন বাঁধাধরা কিছু নেই, দায়সারাগোছের উত্তর দিলেন তিনি। শ্রীমতী ওয়ায়্ তাঁর স্বামীর শান্ত ভদ্র মুখখানা দেখলেন। রেখা ফুটেছে সেই মুখে। রেখাগুলি তাঁর ভাল লাগল না। ওই মুখে তারুণ্যের যে-সজীবতা স্থায়ী বলে মনে হয়েছিল, তা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

ভেতরে যে অসহিষ্ণু ভাবটা জমেছিল সেটা এখন বেড়ে যাচ্ছে বুঝলেন। ওখান থেকে একটা মেয়েকে কি এ বাড়িতে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করে তোমার?

অবাক হয়ে শ্রীযুক্ত ওয়ায়্ বললেন, তা কেন করতে যাব?

তাহলে শুধু খেলাব জন্যই ওখানে যাও তুমি, শ্রীমতী ওয়ায়ু পরিষ্কার ভাবে বললেন !
তা-ই। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু স্বীকার করলেন।
ছেলেমানুষের মত কী লঘু-চপল স্বভাব তোমার।
তোমার মত বুদ্ধিসুদ্ধি আমার নেই আইলীন দীনভাবে তিনি বললেন। বসেবসে বই পড়তে আমি কখনো পারি না। আব দ্যাখো, এখনতো আমার হাতে কোন কাজই নেই। লিয়াংলোই সব দেখাশোনা করছে। এমন কি সেমো আর ফেংমো চলে গেলেও তোমাব বড়ছেলে একাই সব চালিয়ে নিচ্ছে। আমাকে আর দরকার নেই। একটু থেমে নিয়ে তিনি কাতর ভাবে বললেন, যদি আমার করাব মত কোন কাজ থাকে বলে মনে করো তবে আমাকে দিও, আমি তা করব। আমার করা উচিত এমন কিছু আমি করতে চাই। তাঁর গলার কাতরতা যেন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। দেবার মত কোন উত্তরও ছিল না। তাঁর করার মত কোন কাজই নেই।
শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বসে ছিলেন। সুপুরুষ, দয়ালু। কাজ করতে ইচ্ছুক, এবং লঘুচপল প্রকৃতির একটি মানুষ যাকে তিরস্কার করতে মন চাইল না তাঁর।
চলে যাবার আগে, শ্রীমতী ওয়ায়ু লক্ষ করলেন যে তার স্বামী যেন আবার আগের মত প্রাণোচ্ছল ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কারণ একসঙ্গে বসে দুজনে কথা বলেছেন। তাঁর মনে হল, যতদিন এই মানুষটা বেঁচে থাকবেন, তাঁর কোন মুক্তি নেই। তাঁর শরীরের ভেতর দিয়ে মানুষটা তাঁর আত্মার ভেতরেও যেন প্রবেশ করেছে। মানুষটাকে ভাল না বাসাটাই যথেষ্ট নয়। দায়িত্বের শরিক নয় ভালবাসা।
উঃ ভগবান, আমি কি চিরজীবন ওঁর দায়িত্ব নিয়েই কাটাব ? যন্ত্রণাকাতর গলায় শ্রীমতী ওয়ায়ু স্বগতোক্তি করলেন।
তাঁর ধীর প্রশান্ত মনের মেলে দেওয়া ডানাদুটি যেন আবার এই ধূলোমাটির পৃথিবীর দিকে অবসন্ন স্খলিত হয়ে নেবে আসছে।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর কাছ থেকে ফিরে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু সোজা চলে গেলেন ওইসব মেয়েমানুষদের পাড়ায়, যেখানে যাতায়াত সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রী ঐইমাত্র আপত্তি জানালেন।
প্রথম দিকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং অবশ্যই বিবেকের নির্দেশ লঙ্ঘন করে দোস্ত-ইয়ার ক্যংয়ের সঙ্গে যেতেন। তারপর ইচ্ছে এবং বিবেকের সঙ্গে একটা রফা করে জয়ী হলেন। ইচ্ছের সায় এখন পুরোপুরি মিলছে এবং তা এতই

বেশীভাবে যে, এখন তিনি রীতিমত অপেক্ষা করে থাকেন কতক্ষণে ওই প্রমোদকুঞ্জে গিয়ে হালকা আমোদে মেতে উঠবেন। তাঁর বিবেকবুদ্ধি এই টানাপোড়েনে পড়ে গিয়ে এখন সাময়িকভাবে নির্বিকার হয়ে রয়েছে।
চিউমিংকে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। শ্রীমতী ওয়ায়ুর মত প্রজ্ঞাময়ী সে নয়। যে প্রজ্ঞার জন্য শ্রীমতী ওয়ায়ুকে নীরবে শ্রদ্ধা করেন। পুরোহিত যেমন নিত্যপূজার দেবী বিগ্রহকে করেন, সেভাবে। চিউমিং দেবীও নয় আবার মেয়েমানুষও নয়। দেবীর আসনে তাকে বসালে সে যায় ঘাবড়ে। তাছাড়া দেবীর মত সে মোটেও নয়। মেয়েমানুষ হিসেবে ব্যবহার করলেও তাঁর মনে হত যে সে বুঝি আহত হচ্ছে। দুটো পথেই ধাক্কা খেয়ে ভদ্রলোকের সব এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে গেল, যে তিনি আর এগোলেনই না। তাদের দুজনের সম্পর্ক এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়াল, যার সঙ্গে কেমন ধারায় মিশতে হবে ঠাহর করতে না পেরে, তিনি তাকে পুরোপুরি বাদ দিয়েই চলতে লাগলেন।
এই নূতন অভিজ্ঞতার ফলে শ্রীমতী ওয়ায়ুর ওপর তাঁর শ্রদ্ধা আরো অনেক বেড়ে গেল, কারণ এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে শ্রীমতী ওয়ায়ু দরকার মত দেবী অথবা মানবীর ভূমিকায় নাবতে পারেন কিন্তু একসঙ্গে দেবী ও মানবীর সহা-বস্থান কখনো দেখা যায়নি তার মধ্যে। মুশকিল হচ্ছে এই যে মেয়েমানুষের ভূমিকা নিতে তিনি এখন আর রাজী নন, এখন তিনি সর্বক্ষণ দেবীর ভূমিকায় ব্যস্ত বলেই শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর অন্য জায়গা থেকে মেয়েমানুষ যোগাড় করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না
এরকম মেয়ের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন নানা বাঁশীওয়ালার গলির পিওনি কুসুম রানীর বাড়ীতে। ছোটখাট গোলগাল হাসিখুশি চেহারার মেয়েটি। বাড়ীটা বেশ পুরানো। বাইরে থেকে দেখলে চা-খাবার দোকান বলে ভুল হবে কিন্তু ভেতরে জুয়া খেলার আসর ও গণিকালয়। ওখানকার মেয়েরা সবসময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হাসিখুশী। শ্রীযুক্ত ক্যাং তাঁকে বলেছিলেন যে অনেক বছর ধরেই ওখানে তিনি যাচ্ছেন কিন্তু আজ অবধি এরকম ছাড়া অন্য কিসিমের লেড়কী তাঁর নজরে পড়ে নি
তাছাড়া জায়গাটায় খদ্দের নিয়ে টানাটানি বা জবরদস্তি কোন ব্যাপার নেই। এটা ওজায়গার সর্বজনমান্য নীতি। যদি কোন লোক খানাপিনার সময় সামনে কোন মেয়েকে বসিয়ে দেখতে চায়, তাহলে আর বেশীদূর না এগিয়ে ওই পর্য্যন্তই চলতে পারে। যদি কোন অতিথিকে সঙ্গ দেবার জন্য মেয়ে ভাড়া করতে চায়, তাও মিলবে।. তবে এর বেশী কিছু সেবাধর্ম্ম সওদা করতে গেলে আলাদা বন্দোবস্ত করে নিতে হবে, কারণ খদ্দেরদের লিষ্টি করে রাখা হয়,

যেমন যেমন আসেন তারা। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর পক্ষে এসেই একলাফে গ্রহ লিস্টির মাথায় চড়ে বসাটা বেশি কঠিন কিছু হল না। খানদানী পরিবারের গৃহকর্তার খাতির আছে।

সুন্দর ভাবে সাজানো হলঘরটায়, পরিচিত অতিথির মত সেলাম কুড়োতে কুড়োতে তিনি ঢুকলেন। বাড়িওয়ালা হাঁক দিয়ে তার সহকারীকে ডাকল, যূথিকাকে বল্ যে বাবু এয়েচেন।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু ভেতরের একটা ঘরে ঢুকতেই তাঁকে চা দেওয়া হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এল মদ ও একটা বাটিতে হালকা কিছু সুপ। খাওয়া-দাওয়া অর্দ্ধেক শেষ হয়েছে এমন সময় যূথিকা ঘরে ঢুকল। মোটাসোটা মেয়েটির ঠোঁটদুটি যেন সব সময় হাসছে। খবর পেয়ে সে তার ছোট ছোট পায়ে ছুটে এসে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর চেয়ারের হাতলে বসে তাঁর গালে নিজের সুগন্ধি গালটা ঘসে দিল।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু এমন ভান করলেন যেন, তিনি তাকে লক্ষ করেন নি। সে ঠোঁট ফোলাল। একটু পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলল, আমার খিদে পেয়েছে।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু চীনেমাটির বাটির ভেতর থেকে সুপ তুলে তুলে তাকে গম্ভীর ভাবে খাইয়ে দিতে লাগলেন, আর সে-ও বাচ্চা মেয়ের মতই সামনে ঝুঁকে পড়ে হাঁ করে খেতে আরম্ভ করল। তারা দুজনে চুপচাপ বাটিটা শেষ করে ফেললেন। খাওয়ার পরে তিনি টেবিলের কাছ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিলেন, যূথিকা অমনি ঝুপ করে তাঁর হাঁটুর ওপর বসে পড়ল।

কী করছিলে আজ, তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

মেয়েটি তার নখের লাল রংটা ভাল করে দেখল। তারপর বলল, ওহ্, কী আবার করব—আপনার জন্য পথ চেয়ে বসেছিলাম—আমার করার মধ্যে তো ওই এক কাজ।

আরে আমি তো এখানে সারাক্ষণই থকেতে পারি না। আমাকে ব্যবসায় দেখতে হয়। অনেক কাজ আমার। আমার কয়েকটা দোকান আছে, তাছাড়া বাজার, জমির চাষবাস তদারক করতে হয়। আমি না দেখলে কোন কাজই ওরা করতে পারে না। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বলে গেলেন।

আপনাকে দেখছি খুব খাটতে হয়। আপনার ছেলেদের বাপু সাহায্য করা উচিত, মেয়েটি বলল।

ওহ্ ছেলেরা! তারা কেবল নিজের আর বৌর কথাই ভাবে। বাবু আর বিবি ব্যস্! দুটোতো বাড়ি থেকে চলেই গেছে—বড়টা, হ্যাঁ, সে চেষ্টা

করে ; কিন্তু সবকিছু ওর ওপর ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না আমার। শ্রীযুক্ত ওয়ায়্ন অনুযোগের সুরে বললেন।

মেয়েটির পরিপুষ্ট নধর, ছোটখাট শরীরের চাপ তাঁর কাঁধের ওপর পড়ছিল। বেশ লাগছিল তাঁর। শ্রীমতী ওয়ায়্নের প্রশ্নটা তাঁর মনে পড়ল। যূথিকাকে কি তিনি বাড়ি নিয়ে যেতে চান ? তাঁর নিজের দিক থেকে, সেটা খুবই ফূর্তির হবে বটে, কিন্তু বাপ-ঠাকুরদার বসতবাটিতে একটা বেশ্যাকে নিয়ে গিয়ে তুলবেন ! যেন তাঁর মনের কথা টের পেয়েই যূথিকা তাঁর কাছ ঘেঁসে. হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আহা যদি আপনার কাছে গিয়ে থাকতে পারতাম ! খুব ভাল হয়ে চলব আমি। গিন্নীমাদের একটুও ঝামেলায় ফেলব না। আপনি না আসা পর্যন্ত আমি একা-একাই থাকব।

না, না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন। তোমাকে আমি বাড়িতে পেতে চাই না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমি বরং তোমার কাছে আসব। তোমাকে যদি বাড়িতে নিয়ে যাই, তবে তুমিও বাড়ির একটা অংশ হয়ে যাবে। আমার তখন স্ফূর্তি করতে কোথাও যাওয়া হবে না। পুরুমানুষকে কোথায়ও গিয়ে একলা হতে হয়।

যূথিকা যেন এই কথার জবাব তৈরী করেই রেখেছিল। তার বুড়ী মা যৌবনে বেশ্যাগিরি করত। সে তাকে গতর থাকতে থাকতে গুছিয়ে নিতে শিখিয়েছিল। বুড়ি মা তাকে বলত, সম্ভব হলি রক্ষিতে হয়ে যাবি, তা না জুটলে একটা বাড়ি অন্তত হাতিয়ে নিবি বাবুর কাছ থেকে।

আপনি আমাকে একটা বাড়ি কিনে দিতে পারেন না বাবুমশাই ? আমি তবে আপনার কেনা বাঁদী হয়ে থাকব মালিক। আর কারুকে বসাব না ঘরে। সারা দিনরাত আপনার তরেই অপেক্ষা করব। তখন আপনি যখন খুশি একলা হতে পারবেন। এই সম্ভাবনার কথা শ্রীযুক্ত ওয়ায়্ন ভাবছিলেন। কুসুম-কন্যাদের এ-বাড়িতে এলে যেরকম আশ্বাস দিয়ে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, সেটা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। হাজার হক তিনি ওয়ায়্ন-পরিবারের মাথা, এই শহরের ভদ্রলোকদের মধ্যে তাঁর স্থান উঁচুতে। কিন্তু বাড়ির হিসেব রাখেন শ্রীমতী ওয়ায়্ন। যূথিকার বাড়ি কেনার জন্য অত টাকা কীকরে তাঁর কাছে চাইবেন ? তিনি কোমলস্বরে বললেন, ওগো আমার ছোট্ট যূঁইফুল, আমার গিন্নী চমৎকার মহিলা, তিনিই হিসেবটা রাখেন। তোমার জন্য বাড়ি কিনতে হলে আমি তাঁকে কী বলব ?

তাঁকে না জানিয়ে কিছু জমি বিক্রী করে দিতে পার না ?

তাঁকে আমি কখনো ঠকাই নি, বিব্রত স্বরে শ্রীযুক্ত ওয়ায়্ন বললেন।

তিনি আমার কথা জানেন ? অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

মোটামুটি জানেন।

মোটামুটি মানে, যূথিকা জানতে চাইল।

তার মানে, এই কিছু কিছু আর কী।

কিছু কিছু জানবেন কী করে? হয় জানেন, নয়ত জানেন না।

তাহলে ধরে নেওয়া থাক যে তিনি জানেন। তিনি জানেন না বলার চেয়ে, জানেন বলাটাই, অনেক নিরাপদ।

যূথিকা আবার চিন্তা করল। সে তঁার কাঁধে মুখ লুকাল, আমার মনে হচ্ছে আমি সন্তান-সুখ পেতে চলেছি। সেজন্যই বাড়িটা চাইছিলাম গো মালিক। এই পাপপুরীতে কি আমার সাধের বাছাকে আনতে মন চায়, বাবু! শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। হাঁটু থেকে সরিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সে তঁার সামনে মুখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি কঠোরস্বরে বললেন, দ্যাখো—আমার আগে অনেকেই এসেছে তোমার কাছে। তুমি ছুকড়ি বা কুমারী ছিলে না, বুঝলে?

মুখ ফিরিয়ে জামাব হাতায় সে চোখের জল মুছল। কিছু মনে করবেন না, মালিক। তার চপল স্বরে বিষণ্ণতার সুর বাজল।

সবই আমার নসিব, মালিক। মেরী কিসমৎ। আমার মত মেয়েদের—অনেক সময় হুঁসিয়ার হলেও এমনটি ঘটে যায় বাবুজী। যখন বিশেষ করে কোন মরদের সঙ্গে মহব্বত করে ফেলি। দিল্ বাবুজী—দিল। আওরৎ কী দিল—আমারই কসুর হয়ে গেছে। ভুল করে ফেলেছি, মালিক। যূথিকা যদি চাপ দিত, দাবী করত, তাহলে তিনি উঠে চলে যেতেন। হয়ত আর কখনো এমুখো হতেন না। কিন্তু তঁার মনটা ছিল নরম।

এখন, আমার দোষেই হক, বা না-ই হক, তুমিতো জানই যে এসব ঝামেলা খসিয়ে ফেলার ঢের উপায় আছে। এই নাও, রাখো—এ দিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা কোর। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তাঁর মানিব্যাগ বের করলেন!

যূথিকা তার ছোট ছোট দু-হাত দিয়ে তাঁর হাত সরিয়ে দিল। সে বলল, না গো না, বাচ্চাটা আসুক। আমি ওকে আনতেই চাই।

তুমি কিছুতেই তা করবে না, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন।

এই মুহূর্তে বাইরের ঘরে একটা সোরগোল উঠল। বাড়িওলা তাঁর নাম ধরে ডাকছিল। দরজাটা দুম করে সপাট খুলে গেল। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু দেখলেন তাঁর খাস খানসামা পেং এসে হাজির।

বাবু, বাবু—এখুনি বাড়ি যেতে বলেছেন আপনাকে। নতুন বৌদি গলায় দড়ি দিয়েছেন! ওই পোমিগ্রানেট গাছের ডালে!

লাফিয়ে উঠে চলে গেলেন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু।

ঘরের মধ্যে যূথিকা রাগে ভুরু কুঁচকে তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল।

বাড়ির হট্টগোল যেন পাঁচীল উপচে রাস্তায়ও এসে পড়েছিল। পুরুৎদের ডাকা হয়েছিল। তারা ঘণ্টা বাজিয়ে চিউমিং-এর পলাতক আত্মার উদ্দেশ্যে কী সব বলছিলেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

তিনি খোলা ফটক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে পিওনী কুঞ্জের দিকে গেলেন। ফটকে দারোয়ান ছিল না। পুরুৎরা সমবেত হয়েছিলেন। সারা বাড়ি ভেঙে পড়েছিল সেখানে। সবাই চিউমিং-এর নাম ধরে চেঁচিয়ে কাঁদছিল। সবাইকে ঠেলেঠুলে মধ্যিখানে গেলেন তিনি। সেখানে চাতালের পাথরের ওপর শুয়েছিল চিউমিং। তার পাশে নতজানু হয়ে বসে শ্রীমতী ওয়ায়ু নিজের বাহুর মধ্যে তার মাথাটা ধরেছিলেন। চিউমিং-এর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখটা শ্রীমতী ওয়ায়ুর বাহু থেকে ঝুলে পড়েছিল—নিষ্প্রাণ নিশ্চল ভাবে।

ও কি মরে গেছে, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু চেঁচিয়ে উঠলেন।

প্রাণের কোন চিহ্নইতো দেখছি না। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, আমি বিদেশী একজন যাজককে ডাকতে পাঠিয়েছি।

ঠিক এই মুহূর্তে আঁদ্রে ভাইসাহেব এসে পড়লেন। ঝোড়ো বাতাসে সাগরের জল যেমন ভাগ হয়ে যায়, সমবেত জনতা তেমনি দু-ভাগ হয়ে গিয়ে তাঁর আসার পথ করে দিল। অন্য পুরুৎরা ঈর্ষায় নিঃশব্দ হয়ে গেলেন। সেই নৈঃশব্দের কেন্দ্রে আঁদ্রে ভাইসাহেব হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে চিউমিং-এর বাহুতে একটা সূঁচ ফুটিয়ে দিলেন এবং সেই সূঁচটা ধরে রইলেন।

কী করছেন তা জিজ্ঞেস করল না। যাই করুন না তা ভাল বুঝেই করছেন, চাঙ্গা করে তোলার জন্য, হয়ত বড্ড দেরী হয়ে গেছে, ভাইসাহেব বললেন।

এত ক্ষিপ্র হাতে তিনি সূঁচটা বের করে নিলেন যে ওয়ায়ু দম্পতি ছাড়া আর কারো নজরে পড়ল না।

না, খুব দেরী হয়ে যায় নি।

চিউমিং-এর ঠোঁট কেঁপে উঠল।

সবাইর দৃষ্টির সামনে তার চোখের পাতা উন্মীলিত হল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। আঃ, ও বেঁচে আছে ; তবে বাচ্চাটাও বেচে আছে।

ও গলায় দড়ি দিল কেন ? শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

ওর মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত সেকথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তুমি বরং পুরুৎমশাইদের বলে দাও যে ওর প্রাণ ফিরে এসেছে। ভাল দক্ষিণা

দিয়ে দিও, বুঝলে ? ওঁরা যেন ভাবেন যে ওঁদের জন্যই এটা হয়েছে। ওঁরা বিদায় হলে আমরা একটু শান্তিতে বসতে পারব।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তার নির্দেশ অনুযায়ী পুরুৎদের ডেকে বারবাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়ির মেয়েরা থেকে গেলেন। সম্পর্কিত বোন ননদ ভাইবেটারা পুরুৎদের প্রশংসা করতে লাগলেন। মেং রূলাং আর লিনউয়ি চিউমিং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে এ-বাড়ির হলেও তারা অল্পই চিনত। তাদের বয়েসী হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্কসূত্রে তার স্থান এক পুরুষ আগের শ্রেণীতে। তাই তারা তার সঙ্গে সহজ হতে পারে নি। তাই তারা তাকে ভুলে গিয়েছিল।

এই হঠকারীতার মাধ্যমে সে যেন তাদের কাছের লোক হযে উঠল। সে অসুখী ছিল। বয়স্ক লোকের সম্পত্তি হয়ে থাকতে সে চায় নি। প্রতিটি তরুণী বৌদের মনের মধ্যে চিউমিং-এর জন্য সহানুভূতি জেগে উঠেছিল। মেং এর মনে সেই সহানুভূতি করুণায় রূপান্তরিত হয়েছিল ; লিনউয়ির মনে কৌতূহলের সঞ্চাব কবেছিল, রূলাংয়ের মনে বিদ্রোহেব সঞ্চার করেছিল। প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব ধরনে চিউমিংকে ভাবতে লাগল। সে কেন এমন ভয়ংকর কাজ করতে গিয়েছিল ?

কিন্তু এসব ভাববার সময় ছিল না।

চিউমিং একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই বোঝা গেল, যে শিগগীবই তার বাচ্চা হবে। তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইযে দিতে হবে। তারপব দাই ডাকতে হবে। এসব করা হয়ে গেল। ভাইসাহেব চলে যাবেন এমন সময় চিউমিং কথা বলে উঠল, আমি কি ওই পাদ্রীসাহেবকে দেখলাম ! ফিসফিস করে সে বলল।

উনি এখন চলে যাচ্ছেন, শ্রীমতী ওয়ায়ু জবাব দিলেন।

এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে একবাব এখানে আসতে বলবেন ? চিউমিং অনুরোধের সুরে বলল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন না যে চিউমিং ওই দীর্ঘকায় বিদেশীকে জানত। মৃত্যুর মুখ থেকে সদ্য ফিরে আসা মেয়েটির কাতর অনুনয় তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি নিজে গিয়ে ভাইসাহেবকে দাঁড়াতে বললেন, ও আপনাব সঙ্গে দেখা করতে চাইছে ; এক মিনিটের জন্য আসুন একটু।

ভাইসাহেব ফিরলেন। মাথা নুইয়ে নিচু দরজা পেরিয়ে তিনি চিউমিং-এর ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় শুয়ে ছিল চিউমিং।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না যে যূথিকার জন্যই সে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল। নিজস্ব ধরনে এটা তার নীরব প্রতিবাদ।

ভাইসাহেব বিছানার ওপর ঝুঁকতেই চিউমিং কী যেন বলল। এত অস্ফুট সেই কণ্ঠস্বর যে তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না। তিনি আরও ঝুকলেন। তখন তিনি তাকে বলতে শুনলেন, যদি মেয়ে হয় তবে আমি মরে গেলে তাকে আপনার হাতে দিয়ে যাব—সে হবে অনাথ, পরিত্যক্ত শিশু।

ভাইসাহেব মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এ-বাড়িতে কীকরে অনাথ, পরিত্যক্ত শিশু জন্মাতে পারে বলুন ?

আমি নিজেই যে কুড়িয়ে-পাওয়া অনাথ মেয়ে। আমার বাচ্চাও তো তাই হবে, চিউমিং বলল।

এই কটি কথা বলে সে চোখ বুজল। তার ব্যথা উঠছিল। ভাইসাহেব কাউকে এ-কথা না বলে গম্ভীর মুখে সরে গেলেন। এত ক্ষীণস্বরে সে কথা বলেছিল যে আর কারো কানে যায় নি।

সেদিন শেষরাতের দিকে চিউমিং-এর একটি মেয়ে হল।

এতটুকু ছোট্ট একটা প্রাণ ধুকধুক করছে। শ্রীমতী ওয়ায়ৃ কাপড়ে মুড়ে তাকে বুকের মধ্যে রাখলেন যেন প্রাণটা রক্ষা হয়। তারপর সবাইকে ছেড়ে বাচ্চাটাকে নিজের ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজে তার পাশে শুয়ে শিশুটিকে গায়ের ওম দিয়ে তাপসঞ্চার করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দাই আর ইং চিউমিং-এর পরিচর্যা করছিল। তার ঘরে একটি ঝি এসে কিছুর দরকার আছে কিনা দেখতে এসেছিল।

ইঁট তাতিয়ে এখানে নিয়ে আয়। পুরোমাসে হলো না তো, সাবধানে রাখতে হবে, শ্রীমতী ওয়ায়ৃ তাকে বললেন।

হঁ্যা মা, মরুক না ওটা ! আটাসে মেয়ে সন্তান, বড় হয়ে রোগাভোগা হয়ে সব্বাইকে জ্বালিয়ে খাবে, ঝিটি বলল।

যা বলি কর. শ্রীমতী ওয়ায়ৃ বললেন।

বিড় বিড় করতে করতে ঝি চলে গেল।

শ্রীমতী ওয়ায়ৃ ছোট্ট প্রাণিটির দিকে তাকালেন।

তার বুকে তখনও জীবন-স্পন্দন আছে।

দিনদুয়েক পরে আঁদ্রে ভাইসাহেব এসে শ্রীমতী ওয়ায়ৃকে চিউমিং-এর অদ্ভুত অনুরোধের কথা বললেন। শিশুটি মরে নি। খুব কচি বাচ্চা বলে বুকের দুধ টানতে পারছিল না। চামচে করে তার মুখে ফোঁটায় ফোঁটায় মার দুধ দিতে সে চুকচুক করে খাচ্ছিল! চিউমিং-এর বুকে দুধ এসেছিল। কিন্তু

সে এত দুর্বল যে কথা বলতে পারছিল না। এমন কি শ্রীমতী ওয়ায়ু যখন তাকে জানালেন যে বাচ্চাটা বেঁচে আছে, তখনও সে কোন উত্তর দেয় নি।
ওর বাচ্চা মোটেই অনাথ শিশু নয়। সে এই বাড়িতে হয়েছে, মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গীতে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন ভাইসাহেবকে।
আমি জানতাম যে আপনি ওই কথা বলবেন। আপনি যথার্থই বলেছেন। কিন্তু ওর তরুণী মা কেন নিজেকে কুড়িয়ে পাওয়া অনাথিনী বলল?
এখানে আসার আগে ও তা-ই ছিল, শ্রীমতী ওয়ায়ু জবাব দিলেন। একটু ইতস্তত করলেন, তারপর তিনি পরম আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলেন যে যা তিনি ভাইসাহেবকে কখনো বলেন নি, তা-ই তিনি তাঁকে বলছেন। কীকরে তিনিই চিউমিংকে এ-বাড়িতে আনিয়েছেন—সেই কথা।
চোখ নিচু করে, বিশাল দুই হাত হাঁটুর ওপর একত্র রেখে ভাইসাহেব একমনে তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি কখনোই না ভেবে পারেন নি যে ওই হাত-জোড়া কী করে অত কর্কশ হতে পারে? এখন তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনার হাতজোড়া অত কর্কশ কেন?
ভাইসাহেব তাঁর মনের হাওয়া-বদলার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি বললেন, কারণ বাচ্চাদের খাওবার জন্য আমাকে জমি চষতে হয় যে ফসলের জন্য। তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে হাতদুটি সরালেন না তিনি। শ্রীমতী ওয়ায়ু আবার তাঁর কথা শুরু করলেন ভাইসাহেবের হাতের দিকে চোখ রেখে।
সব কথা শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, দেখুন, আমার মনে হয় যে নিজে ধর্ম-যাজক বলে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই আমি বুঝতে পারি।
তাহলে বলছেন যে আমি যা করেছি তা ভুল করেছি? ভাইসাহেবের হাত থেকে মুখে দৃষ্টির স্থাপন করে তিনি বললেন। এত লোক থাকতে তিনি যে শেষপর্যন্ত একজন বিদেশীকেই তার মনের কথা বলতে বেছে নিলেন, তা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগল তাঁর। সাতসাগরের পারে এই বিদেশী মানুষটির দেশ, যে-দেশের জলবায়ু কেমন তা তিনি কোনদিনই জানবেন না।
ভাইসাহেব বললেন, মানুষ যে কেবল রক্তমাংসেই গঠিত নয়, এ-কথাটা আপনি ভাবেন নি মোটে। এমন কি আপনার স্বামীর মত একজন মানুষও ঈশ্বরের সঙ্গে একই যোগসূত্রে আবদ্ধ। তাঁকে আপনি ঘৃণার চোখে বিচার করেছেন।
আমি? জোরেই উচ্চারণ করলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু, তাঁর কল্যাণ ছাড়া আমি তো আর কিছুকেই মনে ঠাঁই দেই নি।
সে তো আপনি কেবল তাঁর উদরপূর্তির আর শয্যার কোমতলার কথা চিন্তা করেছেন, ভাইসাহেব সাদামাটা ভাবে বললেন। এর চেয়েও নিকৃষ্ট জিনিস হল যে আপনি একটি তরুণীকে কিনে এনেছেন, যেমন করে এক-

আধ সের মাংস কেনেন। কিন্তু একটি মেয়ে, যে-কোন মেয়ে, তার চেয়ে বেশী কিছু। সব মেয়ে সম্পর্কেই সে-কথা সত্যি বলে জেনে রাখবেন। আপনি তিনটি পাপে অপরাধী হয়ে পড়েছেন।

অপরাধী? শ্রীমতী ওয়ায়ু পুনরাবৃত্তি করলেন।

আপনি আপনার স্বামীকে ঘৃণা করেছেন, আপনি ভগ্নীস্থানীয়া একটি নারীকে ঘৃণা করে চলেছেন এবং নিজেকে আপনি সমস্ত মেয়েদেব ওপরে অতুলনীয়া বলে ভেবেছেন। এই পাপগুলির ফলেই আপনার সংসারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। আপনার ছেলেরা অস্থির হয়ে উঠেছে, আপনার পুত্রবধূরা অসুখী। আপনার পরিকল্পনা সত্ত্বেও কেউ সুখী নয়। কী আপনার উদ্দেশ্য মাদাম?

ভাইসাহেবের শান্ত পরিষ্কার দৃষ্টির সামনে তিনি কিছুটা কেঁপে উঠলেন। তারপর বলেলেন, শুধু মুক্তি পাব বলে। তাঁব কথা বেঁধে গেল। তিনি বললেন—আমি ভেবেছিলাম যে, যদি আমি সবাইর প্রতি আমার কর্তব্যের পালা চুকিয়ে দেই, তবেই আমি মুক্তি পাব।

মুক্তি বলতে কী বোঝেন আপনি! ভাইসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

খুব কমই বুঝি, নম্রভাবে তিনি উত্তর দিলেন। সোজা কথায় বলতে গেলে আমার নিজের ব্যক্তিসত্তার ও আমাব সময়ের পরিপূর্ণ অধিকারিনী হতে।

বড় বেশী চেয়ে ফেলেছেন, মাদাম। আপনি সবকিছুই চেমে বসে আছেন। ভাইসাহেব উত্তর দিলেন।

অনেক বছর পরে এই প্রথম তাঁর চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ভাইসাহেব তাঁর সত্তার শান্ত কেন্দ্রটি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। তার নিজের ন্যায়পরায়ণতার ওপর আস্থা ধ্বসে গিয়েছে, তাই তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন।

এই বাড়িতে সবাই তাঁরই মুখ চেয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করে এতদিন রয়েছে: সেই তাঁরই যদি ভুল হয় বা তিনি শুধু ভুল করে এসেছেন এমন হয, তবে তাদের সবাইর কী হবে?

আমি কী করব ক্ষীণস্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

নিজের সত্তার কথা ভুলে যান, ভাইসাহেব বললেন।

কিন্তু এত বছব ধবে আমি এত সাবধানে আমার কর্তব্য পালন করে এসেছি। তিনি জোর দিয়ে বললেন।

সে তো আপনার নিজের মুক্তির কথা মনে ভেবেই করে এসেছেন।

অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি। মুক্তো-ধূসর রংয়ের সাটিনের পোষাকের ওপর হাত ভাঁজ করে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন তিনি।

শেষে তিনি বললেন, আমাকে বলে দিন।

আপনার নিজের মুক্তির পরিবর্তে ভাবুন, কী করে আর সবাইকে মুক্তি দিতে পারেন, তিনি শান্তভাবে বললেন।

তিনি ধর্মপরায়ণা মহিলা নন। কিছুটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি ভাইসাহেবের দিকে তাকালেন, আপনি কি আপনার দেশের ধর্মাচরণের কথা বলছেন? যদি তাই হয়, তবে আমি তা বুঝতে পারছি না।

আমি আমার দেশের ধর্মাচরণের কথা বলছি না।

আপনি কি আমাকে খৃস্টান সন্ন্যাসিনী হতে বলছেন? তিনি জোরে বলে উঠলেন।

আমি আপনাকে কিছু হতে বলছি না, প্রশান্ত গলায় ভাইসাহেব উত্তর দিলেন। তারপর পর্বতচূড়ার মত উঠে দাঁড়ালেন এবং বিদায় না জানিয়ে চলে গেলেন। অন্য কারো চোখে এটা রূক্ষ ব্যবহার বলে মনে হতে পারত কিন্তু শ্রীমতী ওয়াঙের মনে হল, তাঁদের এই আলাপ বা এর পরেও তাঁরা যখনই আলাপ করবেন, তারমধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই—তা যেন প্রবাহমান এক স্রোত।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি উঠলেন না।

হাওয়া শান্ত এবং ঠাণ্ডা। তবে ঘরটা ঠাণ্ডা লাগছিল না। ভেতরের দেয়ালের মাঝবরাবর একটা টেবিলের সামনে বড় একটা মালসায় কয়লা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই জ্বলন্ত কয়লা থেকে ফিরোজা রংয়ের লম্বমান শিখা ঝকঝক করছিল।

তিনি যতটা সোজা ভেবেছিলেন, কোন কিছুই ততটা সোজা নয়। মুক্তি কেবল কতগুলি ব্যবস্থা করে ফেললেই মেলে না।

তিনি যেন গাছে-ফলা পীচফলের মত মুক্তিকে দেখেছিলেন। গাছটিকে তিনি যত্ন করলেন। তারপর তোলার সময় হলে তিনি ফলটি তুলে আনলেন, কিন্তু দেখলেন ফলটা তখনও কাঁচা। একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

চিউমিং-এর বাচ্চাটা কেঁদে উঠল পাশের ঘরে।

পাশের ঘরে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে এঘরে এসে মালসার পাশে বসলেন। গরমের জন্যই হক, অথবা কোলের আরামেই হক বাচ্চাটা বেশ স্বস্তি পেয়ে কান্না থামিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

এই বাচ্চাটাকে আমি ভালবাসি না, শ্রীমতী ওয়াং ভাবলেন। হয়ত আমি কখনো কোন বাচ্চাকেই ভালবাসি নি। সম্ভবত, সেটাই আমার সমস্যা যে, আমি কখনো কাউকে ভালবাসতে পারলাম না। ভাল না বাসলেও, তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অত্যন্ত যত্নে তিনি বাচ্চাটাকে কোলে রেখেছিলেন। ইং এসে যখন বাচ্চাটাকে খাওয়াল, তখন তিনি খুশি হয়ে দেখলেন যে, বাচ্চাটা

বেশ তৃপ্তিভরে খাচ্ছে।

এটা দেখে ইংকে বললেন, খুকীকে আমার কাছে দে। ওকে ওর মার কাছে নিয়ে যাব। খুকীটা, এই ক্ষুদিটা বেঁচে থাক, ওই ওর মাকে বেঁধে রাখবে বেঁচে থাকার জন্য।

তাই একটু পরে রৌদ্রালোকিত উঠোন পেরিয়ে তিনি তাঁর আগের মহলের যে-ঘরে চিউমিং মশারি ফেলা বিরাট বিছানায় শুয়ে ছিল, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সেখানে গেলেন। দেয়ালের পর্দায় বংশবৃদ্ধির প্রতীক ফলগুলির ছবি।

চিউমিং চোখ বুজে ঠোঁট চেপে শুয়ে ছিল। পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল তাকে। রেশমের ঢাকনার ওপর হাতদুটি খোলা শিথিল ভঙ্গীতে রাখা। গত কয়েকমাসে তার হাতদুটির বেশ পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম যখন সে এসেছিল তখন তার হাত ছিল কাজেকর্মে শক্ত ও অমসৃণ ; এখন তা পাৎলা ও ফরসা দেখতে লাগছে। এই যে তোমার বাচ্চা, শ্রীমতী ওয়ায়ু নরম ভাবে বললেন, ও বেশ ভাল খেয়েছে। খেয়ে গায়ে এমন শক্তি হয়েছে যে একেবারে তোমার কাছে এসে পড়েছে তোমার বুকে শুয়ে থাকবে বলে।

চিউমিং কোন জবাব দিল না দেখে তিনি বাচ্চাটাকে উঁচু করে তুলে লেপের মধ্যে শুইয়ে দিলেন।

চিউমিং-এর হাতদুটি ওকে আঁকড়ে ধরল। সে চোখ খুলে দীনভাবে বলল, আমি যে আপনাদের প্রতিদান হিসেবে একটি ছেলে দিতে পারলাম না, এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন

আমি কি জানি না যে ছেলেই হক, মেয়েই হক, সবাই হল দান ? তা ছাড়া এ-যুগে মেয়েরাও ভাল।

হঠাৎ তার আন্দ্রে ভাইসাহেবের কথা মনে পড়ল। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি যেন ভেব না যে আমার প্রতি তোমার কোন কর্তব্য আছে।

চিউমিং অবাক হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, তা না হলে আমি এখানে কেন এসেছি ?

শ্রীমতী ওয়ায়ু তার বিছানার ধারে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, জানো বোন, আমার চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমি তোমার ওপর ভয়ংকর অবিচার করেছি। আর সত্যিই তো যেভাবে আমি এক আধ সের মাংস কিনি, সেভাবেই আমি তোমাকে এ-বাড়িতে কিনে এসেছি। একজন মানুষের ওপর এরকম ব্যবহার করার সাহস আমার কীকরে হল ? এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমি তোমার মন ও আত্মার কথা মোটেই ভাবি নি। এখন বলো তো, কীভাবে তোমার ক্ষতিপূরণ করব ?

তাঁর সুচারু কণ্ঠস্বর একটুও ওঠা-নামা করল না বলার সময়। চিউমিং-এর

মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তোতলাতে তোতলাতে সে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমি কোথায় যাব ?

শ্রীমতী ওয়ায়ু দেখলেন যে চিউমিং তাঁর কথা মোটেই বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছে যে, ধনী সম্ভ্রান্ত লোকেরা যেমন বলেন, সেভাবে তাকে ঘুরিয়ে বুঝি বলা হচ্ছে যে তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাই তাকে আর দরকার নেই।

আমি কিন্তু তোমাকে কোথাও যেতে বলছি না। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই, আমি তোমার ওপর ঘোর অবিচার করেছি। মানে খুলে বলতে গেলে তা এইরকম যে, যদি অন্য কেউ তোমার দায়িত্ব না নেয় তবে তুমি কী করবে ?

কেউ দায়িত্ব নেবে না কেন ? আমাদের বাবু আছেন, আপনি আছেন। আপনাদের এই বিরাট পরিবারের সবাই আছেন, চিউমিং হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করল।

যদি তোমার মেয়ে তবে তুমি ওই পাদ্রীসাহেবকে মেয়েটি নিয়ে যেতে বলেছিলে কেন ?

মেয়েদের নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট, আমি তাতে আর আপনাদের জড়াতে চাই নি।

গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলে কেন ?

কারণ…কারণ আমার পেটের ভার দেখে ইং বলেছিল, মেয়ে হবে। তাই আমি ভাবলাম যে আমরা দুটো আপদই যেন একসঙ্গে মরে সবাইকে রেহাই দিয়ে যাই।

বেঁচে থাকায় যেমন ঝঞ্ঝাট, মরলেও তেমন হতে পারে, পরমায়ুর দু-ধারেই যে সমস্যা জড়ানো।

আমার ক্ষেত্রে নয় ; কারো কাছেই তো আমার কোন মূল্য নেই।

শ্রীমতী ওয়ায়ু এ-কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণের জন্য তিনি সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করলেন। তারপর বললেন, ও-সব চিন্তা ছেড়ে দাও। তুমি মরে গেলে তোমার বাচ্চাকে মানুষ করতে অনেক অসুবিধা। আর জেনে রেখ, আমি অন্তত তাদের দলে নই, যারা ভাবে যে মেয়েসন্তান মরে গেলেই ভাল।

আপনি ভাল, বলে চিউমিং চোখ বুজল। তার চোখের কোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু লক্ষ করলেন। তিনি আরো লক্ষ করলেন, চিউমিং তার দুই বাহুর আড়ালে বাচ্চাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। এটাকে একটা ভাল চিহ্ন হিসেবে ধরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

চত্বরটা পেরিয়ে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর দেখা হল। তিনি

রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকছিলেন। দেখা হবার কথা ছিল না, অথচ দুজনে মুখোমুখি হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে হল যে তাঁর স্বামী বোধহয় এমন কিছু করছেন যা তিনি অনুমোদন করবেন না। কারণ শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, কপালে ঘামের মৃদুকণা ফুটে উঠল।

এই যে গো, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন।

এইমাত্র চিউমিংকে দেখে এলাম, শ্রীমতী ওয়ায়ু স্মিত মুখে বললেন, ওর বিষয়টি আমাদের ভাবতে হচ্ছে। ওর মেয়ে হবে ভয়ে ও মরতে গিয়েছিল। কী বোকামি বলো দেখি। আমরা কি ছাঁপোষা লোক যে, এক-আধটা পেট বেশী হলে ভাবতে বসব!

আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। তোমার বুদ্ধি-পরামর্শ দবকার আমার। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

তারা দুজনে একসঙ্গে এসে বড় চৌকোনো ঘরটায় ঢুকলেন। এ-ঘরে তাঁরা যুগলজীবনের কত সময় একসঙ্গে কাটিয়েছেন। একদিকে শোবার ঘরটা, সেখানে বাচ্চাকে বুকে নিয়ে চিউমিং শুয়ে আছে। তাঁদের কথাবার্তা ওর কানে যাবার আশঙ্কা নেই। মাথার অনেক ওপরে ছাত। সেখানে সব কথা মিলিয়ে যায়।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। দ্যাখো—এখন তো ওর একটা বাচ্চা হল; মা ও মেয়েকে নিয়ে কী করব এরপর। দেখতেই পাচ্ছি ওকে তোমার পছন্দ হয় নি। তবু ও এখানে আছে। তোমার কাছে এ-জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু অস্বস্তিভরে তাকালেন। এই সকালবেলাতেই তাঁর গায়ে গরম পোষাকের আধিক্য হয়ে গিয়েছিল। দিনটাও গরম ছিল। অল্পেই গরম লাগে তাঁর। এমন কি শীতেও। আমার ভারি লজ্জা লাগছে যে—তুমি ভেবেচিন্তে—না মানে, ও বেশ ভাল—আর তুমি তো জানই যে কোন মেয়ে ভাল হলে কী চমৎকার হয়, কিন্তু—তিনি বললেন।

আমি খুব স্বার্থপর হয়ে গিয়েছিলাম, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে কোলের ওপর হাত জড়ো করে বসেছিলেন। স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিলেন না। তার বদলে তিনি মেঝের ওপর পড়া ছায়ার দিকে তাকাচ্ছিলেন। দরজার বাইরের কয়েকটি বাঁশগাছের ছায়া পড়েছিল রোদের আলোয়। তাদের ছুঁচোলো পাতাগুলিতে হাওয়ায় কাঁপন ধরছিল থেকে-থেকে। তাদের ছায়া কাঁপছিল থিরথির করে। ভাইসাহেবের কথা মনে পড়ল তাঁর। হঠাৎ তিনি ভাইসাহেবের কথা যেন বুঝতে পারলেন। যতদিন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করতে না পারছেন, ততদিন তাঁর কোন মুক্তি নেই। আর সেই উৎসর্গ করার কাজ তখনই পরিপূর্ণ হবে

যখন তিনি তীব্র ঘৃণাভরে যাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, তাকেই কাছে ঠেনে নেবেন।

চোখ না তুলে তিনি বললেন, আমার দোষটা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যেমন চাইবে, এখন থেকে তা-ই হবে। যদি তুমি বলো, তবে চিউমিংকে না হয় সরিয়ে দিচ্ছি। আমি আবার আগের জায়গায় ফিরে আসব। গত কয়েক মাসের স্মৃতি আমরা ভুলে যাব।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর উৎসুক কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি অপেক্ষা করলেন কিন্তু তা শোনা গেল না। নীরবতা আরো নিবিড় হয়ে উঠলে তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁব মুখ ঘামে ভেসে যাচ্ছে। জামার কলারটা উল্টে দিয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মুখটা মুছলেন।

আমি যদি জানতাম—আমি যদি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম—হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন।

কনকনে ঠাণ্ডা বরফের একটা চাপ যেন নেবে এল শ্রমতী ওয়ায়ুর বুকে। উনি আর তাঁকে চান না। তিনি যা শুনলেন তা সত্যি। উনি অন্য কোন নারীর সন্ধান পেয়েছেন।

তিনি নম্র ভাবে বললেন, সে কেমন বলো।

থেমে থেমে, আমতা আমতা করে বিব্রত ভাবে হাসতে হাসতে বললেন আমি ভাবছি যে, যূথিকাকে অন্য একটা বাড়িতে রাখব কিনা! কারণ সে বয়েসে ছোট, আর ভারি ছেলেমানুষী তাব। এই বাড়িতে তোমার জন্য নতুন কোন ঝামেলা বাড়াতে চাই না।

শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর দীর্ঘায়ত চোখ-দুটি তুলে স্পষ্ট গলায় বললেন, তুমি যদি সুখী হও, তবে আমার ঝামেলা কি বাড়তে পারে! তাকে নিয়ে এস, সে এখানেই থাকুক। তোমার সংসার ভাগ হবে কেন?

তিনি উঠে শ্রীমতী ওয়ায়ুর কাছে গিয়ে তাঁব হাত ধরলেন। ঠাণ্ডা নিঃসাড় সেই হাত। তারপর বললেন, তুমি খুব ভাল মেয়ে। পুরুষমানুষ যা চায় তা পেতে পারে না সবসময় এবং পেলেও নিজের বাড়িতে শান্তিতে বাস করতে পাবে না।

অল্প হেসে নিজের হাত সরিয়ে নিলেন তিনি।

এর অনেক পরে একা একা বসে ভাবছিলেন তিনি। সুখের যে ঠাণ্ডা ভাবটা তিনি বোধ করলেন তা ভেবে তাঁর আশ্চর্য লাগল। তিনি নিজেই স্বামীর জন্য মেয়েমানুষ পছন্দ করে দেবেন সেটা এক কথা, আর তাঁর স্বামী নিজেই নিজের মেয়েমানুষ পছন্দ করে নেবেন সেটা আরেক কথা। মানুষটাকে ভালবাসেন না বলে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি বুঝি তাঁর হাত থেকে

মুক্ত হয়েছে। কিন্তু যখন স্বামীর ভালবাসাও বন্ধ হয়ে গেছে দেখে তাঁর মনের গর্ব আহত হয়, তক্ষন তিনি কী করে মুক্ত!

অাঁদ্রে ভাইসাহেব ঠিকই বলেছিলেন। বরাবর তিনি নিজের কথাই ভেবে এসেছেন। নিজের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাব, ভাইসাহেবকে একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন। কেবল অন্যদের কথা ভাবুন, ভাইসাহেব জবাব দিলেন। তার মানে কি এই, আমাকে সবসময় অন্যের কাছে নতিস্বীকার করেই চলতে হবে? তিনি প্রশ্ন করলেন।

নতিস্বীকার যদি কেবল নিজের দর্প ও অহঙ্কারের জন্য না হয়, তবে নতিস্বীকারও করতে হবে, ভাইসাহেব বললেন।

আমার স্বামী এ-বাড়িতে অন্য একটি মেয়েমানুষ আনতে চান। আমাকে কি তাঁর সেই ইচ্ছের কাছেও নতিস্বীকার করতে হবে?

প্রথম মেয়েমানুষটিকে এ-বাড়িতে নিয়ে আসার অপরাধটাতো আপনারই।

তিনি রেগে গেলেন উত্তর শুনে। ঝড়ের ছোট ছোট ঘূর্ণী বাতাসের মত তাঁর রাগ ছড়িয়ে পড়ল মনের মধ্যে।

এখন আপনি ঠিক পাদ্রীসাহেবের মতই কথা বলছেন। উষ্মাভরে বললেন তিনি। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর কোন পুরুষের হাতে আত্মনিবেদন করে চলাটা যে কত মর্মান্তিক, সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারনা নেই।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর মধ্যে অদ্ভুত একটা বাসনা জাগল। ভাইসাহেব তার অসুখী মনের অংশীদার হল। তিনি তাঁকে বলার কোন সুযোগ না দিযে বলে চললেন, একজনের সুচারু ও সূক্ষ্ম দেহ অন্যজনের স্থূল ও অমার্জিত হাতে ছেড়ে দেওয়া, একদিকে কামনার তাপ প্রখর হয়ে ওঠা এবং অন্যদিকে নিজের রক্তমাংস নিস্পৃহ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া—হৃদয়াবেগ ক্ষীণতর ও মন রুগ্ন হয়ে যাওয়া তবু ঘরের শান্তির জন্য যদি বধ্যতামূলক ভাবে তার চর্চা করে যেতে হয়!

ভাইসাহেবের মুখ অপরিবর্তিত ও অপ্রভাবিতই রইল। তিনি বললেন, জানেন আত্মার জন্য দেহকে আহুতি দেবার অনেক রকম ধরন আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, তবে কি এই দ্বিতীয় মেয়েমানুষটিকেও এ বাড়িতে ঢুকতে দেব?

ভাইসাহেব বললেন, আপনার অনুমতি না নিয়ে অন্য একটা বাড়িতে রাখার চেয়ে, আপনার অনুমতি নিয়ে এ-বাড়িতে থাকাটাই কি শ্রেয় নয়?

ভেতরে ভেতরে রাগে জ্বলে উঠে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, আমি কখনো ভাবি নি যে কোন বিদেশী পাদ্রীসাহেব আমাকে এ-রকম উপদেশ দেবেন। কথা না বাড়িয়ে তিনি বই খুললেন।

ভাইসাহেবের কাছে তিনি তখন হিব্রু ভাষায় পূজার গানগুলি পড়ছিলেন।

আমাদের ভগবান কি আপনাদের ঈশ্বর এবং আপনাদের ঈশ্বরই আমাদের ভগবান! তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁরা দুজনেই এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি উত্তর দিলেন।

লিটল সিসটার সিয়া কিন্তু আমাকে বলেছিলেন, তাঁরা এক নন। তিনি সবসময়েই আমাদের এক সত্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে বলতেন, আমাদের স্বর্গের ভগবানকে নয়। তিনি বলতেন যে তাঁরা অভিন্ন নন। খুঁজলে যে-কোন মন্দিরেই কিছু নির্বোধ লোক পাওয়া যাবে। সত্য যিনি, ঈশ্বর তিনি এক। তাঁর নাম অনেক।

আর তাই তারা পরস্পরের ভাই, ভাইসাহেব বললেন।

যদি আমি ঈশ্বরের কোন রূপই বিশ্বাস না করি?

ঈশ্বরের অসীম ধৈর্য। তিনি অপেক্ষা করে থাকেন। অনন্তকালই তো পড়ে আছে।

ভাইসাহেব এবং তাঁর নিজের মধ্যে দিয়ে যেন একটা অচেনা উষ্ণস্রোত বয়ে যাচ্ছে বলে তিনি অনুভব করলেন। এই স্রোতের উৎস ভাইসাহেব নন বা এর মোহনা-ও তিনি নিজে নন। তাঁরা উভয়েই যেন এই অশরীরী স্রোতকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিক্ষেপ করে চলেছেন মাত্র!

ভগবানের অসীম ধৈর্য, তিনি অপেক্ষা করে থাকেন, শ্রীমতী ওয়ায়দ্ আবৃত্তি করলেন।

সেদিন এই কথাবার্তার পর ভাইসাহেব চলে গেলেন। একটা পুরোনো ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো রুমালে বইগুলি বেঁধে বগলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি লাইব্রেরীর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে যেতে দেখলেন। তাঁর বিশাল দেহটি ঝুঁকে পড়ছিল। যেন ধূসর-আভা-লাগা-চুলসুদ্ধ মাথাটি তাঁর চওড়া কাঁধের ওপর একটা বোঝার মত, অথবা শ্রীমতী ওয়ায়দ্ ভাবলেন এমনও হতে পারে যে, তিনি ঠিক তাঁর সামনের পথটুকুই দেখছেন। পথের শেষ মাথায় যে কী আছে তা দেখার জন্য তিনি ক্বচিৎ মাথা তুলে তাকান।

অভ্যেসমত তিনি লাইব্রেরী ঘরে ফিরে এসে আবার পড়ার টেবিলে ঘণ্টাখানেক বসে, ভাইসাহেবের সঙ্গে একত্র যে-বিষয়গুলি পড়লেন, যে শব্দগুলি উচ্চারণ করলেন সেগুলি একা-একা চিন্তা করলেন।

কিন্তু আজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাইরের চত্বরে উঁচু গলায় একটা চীৎকার শুনলেন। যাই ঘটুক না কেন, ইং তাঁকে খবরটা এনে দেবে। চিন্তাটা মনে উঠতেই দেখলেন ইং দৌড়ে তাঁর মহলে ঢুকছে। সে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ছুটে আসছে।

শ্রীমতী ওয়ায়দ্ চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতের বইটা মেঝেতে মুখ

থুবড়ে পড়ে গেল। নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ এনেছে ইং। বড়ছেলে লিংয়ামোর কথা মনে হল। ইং কাছে এসে পড়েছে। সে মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, হায়! হায়!—ওই পরদেশী পাদ্রীসাহেব গো!

কী হয়েছে তাঁর? এই তো একটু আগেই গেলেন তিনি, শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রশ্ন করলেন তীক্ষ্ণকণ্ঠে।

তেনাকে মেরে পথে ফেলে দিয়েচে গো! মাথার খুলিটা ফাঁক হয়ে গেচে, ইং বলল।

মেরেছে তাঁকে!! শ্রীমতী ওয়ায়ুর কণ্ঠস্বর যেন প্রতিধ্বনি করল ইং-এর কথার।

ওই ছোঁড়াগুলো। 'গ্রীন ব্যাণ্ড' দলের মাস্তানরা। ওরা একটা সুদখোর মহাজনের গদি লুটপাট করছিল। পাদ্রীসাহেব দেখলেন যে, সুদখোরটা কাইনতেছে আর ভগমানকে শাপ-শাপান্ত কইরতেছে! দেইখে তিনি লোকটারে বাঁচাতি গেলেন; তখন ওই ছোড়াগুলোন বেইরে এসে তেনাকে বেধড়ক মাইরলো, মাতায় পর্যন্ত মারলো।

শ্রীমতী ওয়ায়ু কালেভদ্রে এই গুণ্ডাদলের কথা শুনেছিলেন। তিনি শুধু জানতেন এই দুর্বৃত্তরা গ্রামে এবং শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। নায়েবমশাইর খরচের হিসেবে সর্বদাই 'গ্রীন ব্যাণ্ড দলের চাঁদা' এই খাতে একটা অঙ্ক বসানো থাকে।

আঁগ্রে ভাইসাহেব কোথায়? তিনি প্রশ্ন করলেন।

লোকেরা তাঁকে ধরাধরি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেচে। তেনি শুয়ে আচেন। সে-বাড়ির দারোয়ান এসে বলচে যে তেনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইচেন, ইং বলল।

আমি নিশ্চয়ই যাব। আমাকে পোষাক পরিয়ে দে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

পাল্কী-বেয়ারাদের খপর দি, ইং কেঁদে বলল।

না রে, অত সময় নেই। ফটক থেকে একটা রিক্সা ধরে নেব অখন, তিনি বললেন।

কয়েক মিনিট পরে বাড়িসুদ্ধ সবাই জানতে পারল যে শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর জীবনে এই প্রথম এমন একটি জায়গায় গেছেন যা তাঁর সমূহ অচেনা—তা বিদেশী সেই পাদ্রী সাহেবের বাড়ি। রিশকায় তিনি ঋজু হয়ে বসলেন। রিশকাওয়ালার পেছন থেকে বললেন, যদি দুনো জোরে চলো তবে তোমাকে দুনো ভাড়া দেবো।

তিনগুন দিলে তিনগুন জোরে ছুটব, রিশকাওয়ালা ছুটতে ছুটতে জবাব দিল। তাঁর অনেক পেছনে ইং অন্য একটা রিশকা নিয়ে আসছিল।

একবারও শ্রীমতী ওয়ায়ুর মনে হল না যে, লোকে কী বলবে ! কেবল একটা চিন্তাই ত'ার সারা মন তোলপাড় করছিল, যেন তিনি সময় থাকতে থাকতে ভাইসাহেবের কাছে পৌঁছুতে পারেন। যেন আরেকবার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পান যা ত'ার বাকী জীবনের দিশারী হয়ে থাকবে। ইঁটের দেয়ালের মাঝখানে একটা কাঠের দরজার সামনে আসতেই তিনি ক্ষিপ্র পায়ে নেবে পড়লেন। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

দাদা কোথায় ? শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

বৃদ্ধাটি ফিরে তাকিয়ে ত'াকে একটা নিচু পাকা ঘরে নিয়ে গেলেন। চাতাল পেরিয়ে যাবার সময় একদল ছেলেমেয়েকে কাঁদতে দেখলেন তিনি। পরে একটা ঘরে ঢুকলেন ত'ারা।

একটা নিচু বাঁশের খাটে আঁদ্রে ভাইসাহেব শায়িত ছিলেন। শতচ্ছিন্ন জামা-কাপড়-পরা পথের লোকেরা ত'াকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা ত'াকে পথ ছেড়ে দিল।

যেন তিনি ত'ার উপস্থিতি অনুভব করতে পারলেন। এইভাবে তিনি চোখ খুললেন। একটা সাদা তোয়ালে দিয়ে ত'ার মাথাব ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল শক্তভাবে। ব্যাণ্ডেজ ভিজে রক্ত পড়ছিল গাল বেয়ে। মাথার বালিশটা ভিজে যাচ্ছিল রক্তে।

এই যে আমি ! আমি কী করব বলে দিন, তিনি বললেন।

বেশ অনেকক্ষণ তিনি কোন সাড়া দিলেন না। ত'ার শেষসময় ঘনিয়ে আসছিল। ত'ার কালো চোখের গভীরে এক শূন্যতা দেখতে পেলেন তিনি। তারপর তিনি সব ইচ্ছাশক্তি সংগ্রহ করলেন. ত'ার ঠোঁট ফ'াক হল, ত'ার দিকে তাকিয়ে ত'ার বুক ফুলে উঠল ভারী একটা নিঃশ্বাসে ; ভাইসাহেব স্পষ্টস্বরে বললেন। আমার বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবেন।

মৃত্যু নেবে এল। নিঃশ্বাস থেমে গেল। চোখের পাতা দুয়েকবার ওঠানামা করল। সব ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। ভাইসাহেবের বিশাল দেহটা কেঁপে উঠল। দুপাশে দু-হাত ছড়িয়ে পড়ল ত'ার। প্রায় মাটিতে ছু'য়ে গেল হাতের আঙুল। শ্রীমতী ওয়ায়ু নিচু হয়ে ত'ার ডানহাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। একটি জীর্ণ চেহারার লোক এসে বাঁ-হাতটি তুলে নিল। দুজনে দুটি হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীমতী ওয়ায়ু ভাইসাহেবের শরীরের দিকে তাকালেন। ভাইসাহেবের চোখে এসে ত'ার দৃষ্টি থামল। তিনি এখন কিছু-না, ভৃত্য বা ভিক্ষুক। ভীরু চোখে তিনি ভাইসাহেবকে দেখলেন, তারপর ত'ার স্পন্দনহীন বুকের ওপর ধীরে নাবিয়ে রাখলেন ডান

হাতটি। ছোট ছোট বাচ্চারা ঘরের মধ্যে ছুটে এসে ঢুকল। তারা 'ফাদার' 'ফাদার' বলে কাঁদছিল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু দেখলেন তারা সবাই-ই মেয়ে। বড়টির বয়েস পনেরোর বেশী হবে না। তার কোলে খুবই শিশু একটি বাচ্চা; হাঁটতে শেখে নি। তারা তাদের ছোট ছোট হাত দিয়ে ভাইসাহেবের শরীর ছুঁল। তারা তাঁর দাড়িতে হাত দিল। তাঁর কোটের কোণা দিয়ে রক্তটা মুছিয়ে দিল কাঁদতে কাঁদতে।

তোমরা কারা? নিজেরই অচেনা একটা শান্ত গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি আমাদের পালতেন, তারা সবাই মিলে হৈ-চৈ করে জবাব দিল।

এইসব কুড়ানির দল, কুড়িয়ে-পাওয়া বাচ্চা-কাচ্চা সব, জীর্ণ পোষাক পরা লোকটি বলল। শহরের পাঁচীলটার পাশে যেখানে ওদের ফেলে রেখে যেত, উনি সেখান থেকে কুড়িয়ে আনতেন। বড়টা কেনা-বাঁদী ছিল, পালিয়ে এসেছে। তিনি যে-কোন লোককেই নিতেন।

ভাইসাহেব মরে গেছেন বলে তাঁর একা-একা কাঁদতে ইচ্ছে করল কিন্তু বাচ্চাগুলি তাঁকে ঘিরে ছিল। তাদের ছোট ছোট হাতে তাঁর শরীর প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

আহা, কী ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন, একটি বাচ্চা মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার গাল বেয়ে চোখের জল নেবে আসছিল. সে বলল, তাঁর হাত কী ঠাণ্ডা!

এই বিচিত্র পরিবারের মধ্যে শ্রীমতী ওয়ায়ু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল যে, যা ঘটেছে তিনি তার কিছুই জানেন নি এখনও। তিনি খুব নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন, কে ওঁকে এখানে নিয়ে এল?

জীর্ণ পোষাক পরা লোকটি বুকে একটা চাপড় দিল, আমি, আমি। আমি তাঁকে ঘুরে পড়তে দেখলাম। পথের লোকজন সব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, অনেক রক্ত বেরুল, তখন গ্রীণ ব্যাঙের মাস্তানরাও হাওয়া হয়ে গেল। সুদখোর মহাজনতো গদির ঝাঁপ ফেলে বাড়ি চলে গেল। তা, আমি ভিখিরি, আমার আর ভয় কী? পাদ্রীসাহেব প্রায়ই আমাকে পয়সা দিতেন, বিশেষ করে শীতের সময়। কখনো কখনো তিনি আমাকে এই বাড়িতেও নিয়ে আসতেন, রাতভর ঘুমিয়ে সকালবেলা চলে যেতাম এখান থেকে। আমাকে খেতে দিতেন তিনি।

তুমি ওঁকে বয়ে এনেছ! তিনি বললেন।

এইসব আরো ভিখিরি আর আমি মিলে আনলাম, সে বলল। শ্রীমতী ওয়ায়ু গোটা ছয়েক ভবঘুরে মার্কা লোক দেখতে পেলেন। লোকটি আবার

বলল, দু-একজন লোক কি তাঁর মত অত বড়সড় মানুষকে বইতে পারে ?
শ্রীমতী ওয়ায়ু ভাইসাহেবের শান্ত মুখচ্ছবির দিকে তাকালেন। নিজের জীবনের জন্য কিছু পথ-নির্দেশ পাবার জনা তিনি এসেছিলেন, তার বদলে তিনি বললেন আমার বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবেন।
এইসব বাচ্চাকাচ্চা। তিনি তাদের দিকে তাকালেন, তারাও তাঁকে দেখল।
তোমাদের নিয়ে আমি কী করব ? অনিশ্চয়তার সঙ্গে তিনি বললেন।
আমাদের ফাদার আপনাকে কী করতে বলে গেছেন ? ছোট রোগামতন একটি মেয়ে আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল। তার কাঁখে একটা হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা।
তিনি কেবল সত্যি কথাই কবুল করতে পারলেন, তিনি বলে গেছেন যে আমি তোমাদের খাওয়াব।
বাচ্চাগুলো পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি কবল। রোগা মেয়েটি বাচ্চাটিকে অন্য কাঁখে নিল। সে গম্ভীর ভাবে বলল, আমাদের সবাইকে দেবার মত খাবার আছে তোমার ?
হ্যা, তিনি উত্তর দিলেন।
তবু তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।
আমরা সবসুদ্ধ কুড়িজন। আমার পনেরো বছর বয়েস। ষোলতে পা দিলেই উনি আমাদের ব্যবস্থা করে দেন, রোগা মেয়েটি বলল।
ব্যবস্থা করে দেন ? শ্রীমতী ওয়ায়ু পুনবাবৃত্তি করলেন।
বৃদ্ধাটি এগিয়ে এসে বলল, ষোল পুরলে উনি ওদের ভাল ঘরে বরে বিয়ের ব্যবস্থা করতেন।
শ্রীমতী ওয়ায়ু আঁদ্রে ভাইসাহেবের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখদুটি বোজা। হাতদুটি বুকের ওপর ভাঁজ করা।
এই ঘর থেকে বেরিয়ে এস। তিনি হঠাৎ বললেন, তোমরা সবাই—ওঁকে শান্তিতে থাকতে দাও।
তারা সবাই তাঁর আদেশ পালন করল ; কেবল সেই বৃদ্ধা আর তিনি থাকলেন। ইং দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ইংকে বললেন, তুইও সরে যা ইং।
আমি ঘরের বাইরে দাঁড়াচ্ছি, ইং জবাব দিল।
শ্রীমতী ওয়ায়ু ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। যা তিনি করছিলেন, তা নিয়ে নানা কথা উঠতে পারে। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা কেন একজন বিদেশী ধর্মযাজকের সঙ্গে এক বন্ধ ঘরে থাকবেন, এমন কি সেই ধর্মযাজকের মৃত্যুর পরেও। ভাইসাহেব এখন তাঁর কাছে বিদেশী বা ধর্মযাজক কোনটাই নন। আলাপ ছিল এমন মানুষদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে তিনি

পূজো করতেন। তাঁর বৃদ্ধ শ্বশুর তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। কিন্তু শ্বশুরমশাই অনেক কিছুকেই ভয় করতেন। ভাইসাহেব কাউকেই ভয় করতেন না। জীবন বা মৃত্যু কোনটাকেই তিনি ভয় করতেন না। যখন তিনি জীবিত ছিলেন, শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁকে পুরুষ বলে কখনো মনে করেন নি। মৃত্যুর পরে তাঁকে আজ তাঁর পুরুষমানুষ বলে মনে হল। যৌবনে তিনি নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। তাঁর ওই বিশালকায় দেহে যেন রাজকীয় মহিমা বিরাজ করছে।

তিনি যেন হঠাৎ তাঁকে নতুন আলোয় চিনতে পারলেন।

অপার বিস্ময়ের মধ্যে তিনি আস্তে আস্তে স্বগত ভাবে উচ্চারণ করলেন, তোমাকেই তো আমি ভালবেসেছি!

এই নতুন পরিচয়ের আলোয় ভরে উঠে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচিতিকে গ্রহণ করে নিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর সমগ্র সত্তা যেন মুহূর্তে বদলে যেতে শুরু করল। যদিও স্থানুর মত তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবু তাঁর শরীর কেঁপে উঠল, রক্তস্রোত যেন হৃৎপিণ্ডকে ছোবল দিচ্ছিল, মস্তিষ্ক পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মাথা তুলে তিনি ঘরটার চারদিকে তাকালেন। প্রহরীর মত চারদিকে চার দেয়াল অটল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু তিনি নিজেকে পরিপূর্ণ ও মুক্ত বলে অনুভব করলেন। খাটের ওপর ভাইসাহেবের দেহ সেই আগের মতই শায়িত ছিল কিন্তু যখন তাঁর দিকে তাকালেন তখন তিনি বুঝলেন ভাইসাহেব ওই দেহের বন্ধন ছেড়ে চলে গেছেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। বছরের কোন দিনেই তিনি মন্দিরে ঢোকেন নি বা ভগবানের উদ্দেশ্যে ধূপধুনো জ্বালেন নি। যাঁকে দেখা যায় না এমন কোন ভগবান আছেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না, তবু তিনি নিশ্চিত জানতেন যে এই মানুষটির সত্তা বয়ে চলেছে।

আঁদ্রে, আস্তে কিন্তু স্পষ্ট ভাবে তিনি তাঁর নাম ধরে ডাকলেন। আর কখনো তিনি তাঁকে ভাইসাহেব বলে ডাকবেন না। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আমার মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে। তোমার জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমগ্র সত্তায় যেন শান্তির ছোঁয়া লাগল। সেই শান্তি এতই নিবিড়, এতই প্রাণবন্ত, যা তিনি এর আগে কখনো অনুভব করতে পারেন নি। ভাইসাহেবের প্রাণহীন দেহের কাছে ওই নিরাভরণ ঘরে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেকে সুখী বলে ভাবলেন।

এই সুখ সাময়িক একটা ঘোর নয়। এ যেন একটা শক্তি, যা তাঁর দেহে-মনে কাজ করে চলছিল। তাঁর কাছে এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল যে কতগুলি কাজ

তাঁকে এখন অবশ্যই করতে হবে। [redacted]
হবে কিন্তু না, পুরুৎ ডেকে বা প্রার্থনা করে নয়। তাঁর নিজস্ব কিছু জিনিসের যা হক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, তিনি নিজেই সে ভার নেবেন। আর তারপর তাঁর আরব্ধ কাজ তিনি করতে শুরু করবেন।

প্রশান্ত মনে তিনি পাশের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে ইং এবং অনাথ ছেলে-মেয়েরা ও বৃদ্ধা অপেক্ষা করছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু একটা কাঠের চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা কীভাবে তাঁর মরদহে সৎকার করা হবে সে-সম্পর্কে তিনি কিছু বলে গিয়েছিলেন কি?

তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। শিশুরা ভয় পেয়ে কিছু বলল না। বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জামা দিয়ে চোখ মুছে বলল, নিশ্চয়ই মরার কথা তিনি ভাবেন নি। আমরাও কখনো এরকম যে হতে পারে তা ভাবি নি।

কোথাও কি তাঁর কোন আত্মীয় আছে? তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, যদি থাকে তবে সেখানেই তাঁর দেহ পাঠিয়ে দেওয়া উচিত হবে আমাদের।

কেউ তাঁর আত্মীয়দের খোঁজ রাখত না। কত বছর আগে যে তিনি এখানে এসেছিলেন, তা কেউ জানে না। তারপর তিনি আর ফিরে যান নি।

তাঁর কাছে কি চিঠিপত্র আসত, শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন।

চিঠি এলে তিনি তা পড়তেন না। তাঁর চিঠির লেপাফা কখনো খোলা হত না। কিছুদিন বাদে বাদে আমি সেগুলি নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের জুতোয় লাগিয়ে দিতাম সোল হিসেবে।

আর কখনো চিঠি লিখতেন না?

কক্ষনো না, বৃদ্ধা বলল।

তোমাকে তিনি কখনো কারও কথা বলেন নি?

কোন আত্মীয়-স্বজনের কথা বলেন নি। আমরা শুধু এই দেশের ও শহরের যেসব লোক কোন না কোন ভাবে সাহায্য চায়, তাদের কথাই বলতাম।

শ্রীমতী ওয়ায়ু মনে মনে ভাবলেন আঁদ্রে ছিল পুরোপুরিই তাঁর। আর কেউ না। তিনি একটা সাধারণ কালো কফিন কিনবেন। তারপর তাঁর নিজের জমিতে তাকে সমাধি দেবেন। পাহাড়ের ধারে ধানক্ষেত ঘেরা একটা জায়গা তাঁর মনেও এল। বসন্তকালে ফসলের চারা পোতা দেখতে গেলে তিনি সেখানে একটা গিঙ্কো গাছের ছায়ায় বসে জিরোতেন।

তিনি উঠে দাঁড়াতে বৃদ্ধা ও শিশুরা তাঁর দিকে উৎকণ্ঠাভরে তাকাল। তিনি বুঝতে পারলেন যে তারা সবাই তাদের ভবিষ্যৎ কী, এ-কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই বাড়িটা কি তাঁর নিজের? বৃদ্ধা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না, না, এটা ভাড়াটে বাড়ি। ভূতের বাড়ি

পুরনো বাড়িটার একটা বদনাম থাকায় আমরা এটা সস্তায় পেয়েছি কিন্তু ভূতেরা তাঁকে ভয় করত, আমরা তাই অল্প ভাড়ায় নিরাপদেই এখানে থেকে আসছি।

তাঁর কিছু জিনিসপত্র নেই ?

দু-প্রস্ত পোষাক ছাড়া কিছু নেই। একটা উনি পরতেন আরেকটা আমি কেচে দিতাম। কয়েকটা বই আর ওই ক্রশ—এই সব। একবার উনি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একটা সুন্দর মূর্তি নিয়ে এসে শোবার খাটের পাশে দেয়ালে টাঙিয়ে দেন। একদিন রাত্রে মূর্তিটা পড়ে ভেঙে যায়। তিনি আর কোন ওরকম মূর্তি কেনেন নি। তাঁর একটা জপমালা ছিল। একটা বাচ্চা সেটা নিয়ে খেলতে গিয়ে একটা তার ভেঙে ফেলে। তিনি কিন্তু আর কখনোই সেটা গেঁথে নেন নি ফের। কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গিয়ে হারিয়ে যায়। তিনি বলেছিলেন যে ওতে আমার আর দরকার নেই। বৃদ্ধা থামলেন।

বৃদ্ধার কথা শুনতে শুনতে শ্রীমতী ওয়ায়ন্ ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। কথা শেষ হলে প্রশ্ন করলেন, ওই কালো বাক্সে কী আছে ?

হাতের একটা আঙুল দিয়ে বাক্সটা দেখালেন।

ওটা জাদুর বাক্স। রাত্রিবেলা তিনি ওই বাক্সটার ভেতর থেকে মানুষের গলার শব্দ শুনতেন।

শ্রীমতী ওয়ায়নের মনে পড়ল তিনি এই যন্ত্রের কথা তাঁর কাছে শুনেছিলেন। এগিয়ে গিয়ে তিনি বাক্সটার গায়ে কান পাতলেন কিন্তু কিছুই শুনতে পেলেন না।

আর কাউকে কিছু বলবে না এটা, বুড়ী বুঝিয়ে বলল।

তাহলে তাঁর সঙ্গে এটাকেও আমরা সমাধি দেব, শ্রীমতী ওয়ায়ন্ বললেন।

তাঁর আরেকটা জিনিস ছিল, সেও আরেক জাদুর খেলা। উনি আমাদের বলে দিয়েছিলেন যেন কখনো আমরা ওটা না ছুঁই।

সেটা কোথায় ? শ্রীমতী ওয়ায়ন্ প্রশ্ন করলেন।

বুড়ী খাটের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে একটা লম্বা কাঠের বাক্স বের করে আনল। সেটা খুলে ফেলল। ভেতরে লম্বা নলের মত একটা যন্ত্র।

বুড়ী বলল, রাত্রিবেলা আকাশ পরিষ্কার থাকলে তিনি ডানচোখে ওটা লাগিয়ে আকাশ দেখতেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ন্ তক্ষুনি বুঝলেন, ওটা তারা দেখার জন্য। তিনি বললেন, আমি ওটা নিয়ে যাব।

আচ্ছা, বইগুলি দেখি একবার। তাঁর পোষাক ও ক্রশ দেহের সঙ্গেই কবরে যাবে। বাড়িওয়ালাকে এই বাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হবে।

ছেলেমেয়েরা [redacted]
তাদের আশ্রয় চলে গেল। তাদের আর কিছুই রইল না।
আর হ্যাঁ, তোমরা, তোমরা সবাই, তুমি বুড়ীদিও, আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবে।
বাচ্চাদের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তারা নিরাপদ। নতুন নিরপত্তার স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্বাসে তাদের শৈশব যেন তক্ষুনি চঞ্চল হয়ে উঠল।
তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, কখন—কখন ?
আমি ভাবছি আগামীকাল পর্যন্ত তোমরা তাঁর সঙ্গে এখানেই থাকবে। আগামীকাল এখান থেকে শবযাত্রা করে আমরা ভাইসাহেবকে সমাধি দিতে নিয়ে যাব। সামাধির পর তোমরা আর এখানে ফিরবে না। আমার সঙ্গে যাবে।
অনেক বড় মন মা তোমার। তোমার মনে কত মমতা ! তিনি জানতে পারছেন —ঠিক যেন মা, তিনি সব জানতে পারছেন, বুড়ী আবেগরুদ্ধ গলায় বলল।
কোন উত্তর না দিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়দ্ অল্প হাসলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, আজ দু-বেলার খাবারের ব্যবস্থা আছে তো ? ওদের তো আজকের আর আগামী কাল সকালের খাবার দরকার হবে। কাল দুপুরে ওরা আমার বাড়িতেই খাবে।
উনি সবসময় হাতে একদিনের খাবার রাখতেন।
তাহলে আগামীকাল আমি আসছি। শ্রীমতী ওয়ায়দ্ বললেন। বাচ্চারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের গায়ে চাপ লাগল তাঁর গায়ে। চলে যাওয়া মানুষটাকেও ওরা এভাবে ঘিরে দাঁড়াত। তাঁর দেহের সান্নিধ্য পেত। হয়ত সেই একই আশ্বাস দাবী করছে তাঁর কাছ থেকেও। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, বাচ্চারা—আগামীকাল আবার দেখা হবে।
ঘরে মানুষটার নিষ্প্রাণ দেহ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এখন যেন তিনি অন্য এক নারী।

বাড়ি ফিরে নিজের এই রূপান্তরিত সত্তাকে অনেকক্ষণ ধরে অনুভব করলেন। আঁদ্রের মৃতুকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যদি তিনি বেঁচেও থাকতেন, তবুও নিশ্চয় একদিন সেই পরম মুহূর্ত আসত, যা এসে আবিষ্কার করত যে তিনি তাঁকে ভালবাসেন।
তখন দুটো পথের একটা বেছে নিতে হত। হয় কোন ছুতো করে তাঁর সঙ্গে আর দেখাই করতেন না, নয়ত তাঁকে বলতেন তাঁর ভালবাসার কথা। এটা ঠিক, তাহলেও তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ নেবে আসত।

ুতে ইচ্ছে করছিল না।
এই নতুন অভিজ্ঞতার সমগ্রতাকে তন্নতন্ন করে দেখার জন্য একাকী, পরিপূর্ণ মনে, জাগ্রত চিত্তে বসে থাকতে চাইলেন। তিনি এমন একটি পুরুষকে ভালবেসেছেন, যে একবারও তাঁর হাত ছোঁয় নি; ছোঁয়া যেন তাঁর কাছে অচিন্তনীয় ব্যাপার। অনেকক্ষণ পরে, অন্ধকারে একা-একা হেসে উঠলেন। তাঁর চারদিকে গোটা বাড়িটা অন্ধকার ও নিঃশব্দ।

এই শহরে আগে যেসব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে, তার সঙ্গে অ'াদ্রের অন্ত্যেষ্টির কোন মিল ছিল না। শ্রীমতী ওয়ায়ু এই অনুষ্ঠানকে পারিবারিক অন্ত্যেষ্টির ধ'াচে না করে, ত'ার ছেলের শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করলেন। ছোটরা সেলাই-না-করা সাদা কাপড় পড়ল। যেসব ভিখিরি শবদেহ বহন করল, তারা তাদের জন্য অনুরূপ শোক-বস্ত্র দাবী করল। শ্রীমতী ওয়ায়ু অবশ্য কোন শোক-জ্ঞাপক পরিচ্ছদ পরলেন না।
কুড়িজন মজুর শবাধারটি নগরের নগরের পশ্চিম পাহাড়তলীর গিঙ্কো গাছের নিচে নিয়ে এলো। যেখানে পাহাড় তাঁকে কোলে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি শবযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন।
গভীর করে খোড়া গর্তের মধ্যে যখন শবধারটি নাবিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, কেউ কোন কথা বলল না। চারদিকে নীরবতা। তারপর—শিশুরা কাঁদল। বৃদ্ধাটি ডুকরে কেঁদে উঠল কিন্তু শ্রীমতী ওয়ায়ু নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাটি দিয়ে গর্তটা ভরাট করা হল, তার ওপর উ'চু একটা স্তূপ গড়া হল।
স্মৃতির ভিতর অ'াদ্রে চিরকাল জেগে থাকবে কিন্তু তিনি তাঁকে আর দেখতে পাবেন না! বাষ্পহীন এক অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠল শ্রীমতী ওয়ায়ুর ভেতরে। সব কাজ শেষ হলে শ্রীমতী ওয়ায়ু এই মিছিলটিকে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। শিশুদের নিয়ে গেলেন নিজের মহলে। সেদিন থেকে তাদের গৃহহীন পরিচয় মুছে গেল।

পরদিন ভোরবেলা নিজের পরিচিত ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ুর মনে হল পৃথিবী ঠিক সেই আগের মতই আছে। তফাৎ শুধু এই, ঘুম থেকে ওঠার পর রোজ যে অবসাদ বোধ করতেন আজ তার বদলে যেন উৎসাহ বোধ করছেন! এই সময় ইং এসে ঘরে ঢুকল। ইংকে ভারি অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল। কুঁদুলে গলায় বলল, ভোরবেলা ওঠ নি গো বৌদি?
আজ তো বাদলা দিন, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
কী করে বুইঝলে? এখনও তো পদ্দা তোল নি।

তোর গলা শুনেই বুঝতে পারছি। তোর মুখে যে মেঘ।

আমি তো বৌদি জন্মেও ভাবতি পারি নি, বেবুশ্যে পাড়ার একটা মেয়ে এসে এ-বাড়িতে উঠবে !

তবে যূথিকা বলে মেয়েটা এসেছে ?

সেতো খিড়কীর চাতালে বসে অপেক্ষা করছে।

শ্রীমতী ওয়ায়্‌ উঠে তাঁর সরু পা-দুখানা ফুল-তোলা চটিতে ঢোকালেন। ও কি একলা এসেছে ?

ফোকলা দাঁতের একটা বুড়ী এসে পোঁছে দিয়ে গেল। এখন আর কি, আমাদের জিম্মেদারী, এবার ঠেলা সামলাও !

শ্রীমতী ওয়ায়্‌ খিড়কীর চাতালে যূথিকা নামে মেয়েটিকে দেখতে উঠলেন।

হ্যাঁ বৌদি, মেয়েটাকে এখানে নিয়ে আসি। তুমিওর কাছে গেলে ও নিজেকে একটা কেউকেটা বলে ঠাওরাবে, ইং বলল।

ঠিক আছে। তিনি ইংয়ের দিকে ফিরে বললেন, তুই এখানেই নিয়ে আয়। কয়েক মিনিট পরেই ইং ফিরে এল। তাব পেছনে এল ছোটখাট নধর চেহারার গোলাপী রংয়েব একটি তরুণী।

তিনি মুখ তুলে যূথিকাকে দেখলেন, মুহূর্তেই বুঝলেন, এ সেই ধবনের মেয়ে, যাদের তিনি খুব অপছন্দ করেন। গায়ে-গতরে স্বাস্থ্যবতী। পার্থিব একটি জীব, খড়মড়ে, রগরগে বাসনায টইটম্বুর। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর প্রতিবাদের ভাষাকে নীরব করে দিয়ে গেছেন আঁদ্রে। মনের অন্ধকার পর্দায় আবার ভেসে উঠল আঁদ্রের মুখ। যেন এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকেই তাকিযে আছেন। সেই মুখেব দিকে তাকিযে তিনি মেযেটিকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন,

তুমি কেন এখানে থাকতে চাও ?

বাচ্চাটা হবার আগে আমি থিতি হতে চাই, সে বলল।

বাচ্চা হবে নাকি ?

যূথিকা মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে জোর গলায জবাব দিল, হ্যাঁ !

না। বাচ্চা হবে না, তিনি বললেন।

যূথিকা মাথা তুলে, প্রতিবাদ করার জন্য ঠোঁট ফাঁক করে হঠাৎ কান্নায ভেঙে পড়ল।

তার মানে বাচ্চা হবে না। তিনি আবার বললেন।

ওকে এখানে রাখার দরকার নেই ! ইং বলল।

সুঠাম সুকুমার দীর্ঘ হাত তুলে তিনি বললেন, সেটা আমিই ঠিক করব, তুই এখান থেকে যাতো ইং।

এই পচা ডিমটার কাছে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে, কেমন ? ইং গজগজ করে বলল।

তুই এ-মহলের ফটকের কাছে দাঁড়া গিয়ে। ইং না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর মেয়েটিকে বাগানে পোর্সিলিনের চেয়ারে বসতে বললেন।

যূথিকা বসে বসে ফোঁপাচ্ছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু আবার বললেন, জানো, আমাদের মত বড় মান্যগণ্য পরিবারে তোমার আশ্রয় নেওয়াটা ভারি সংঘাতিক ব্যাপার। তুমি এসে এখানকার সব সুখ ধ্বংস করে দিতে পারো, আবার সুখশান্তি বাড়াতেও পারো। সব কিছুই নির্ভর করছে তোমার সত্যিকারের মনোভাবের ওপর। যদি খাবার আর আশ্রয়ের জন্য আসতে চাও, তবে তুমি তা খুলে বলো। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে তা দেওয়া হবে। শরীর বেচে তা তোমাকে রোজগার করতে হবে না। এমনিতেই পাবে সেসব।

যূথিকা শ্রীমতী ওয়ায়ুর দিকে চতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, মেয়েদের মুফৎসে কে কি দেয় ?

তাহলে আশ্রয়ের জন্যই এখানে আসতে চাও ?

আমি তো তা বলি নি, যূথিকার পাউডার ঘসা মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, আমি ওই বড় মানুষটাকে পছন্দ করি—

শ্রীমতী ওয়ায়ু বুঝলেন, সে তাঁর স্বামীর কথাই বলছে। তিনি তাকে কিছু বললেন না। মেয়েটির অন্তর থেকে সত্য নির্গত হচ্ছে।

কিন্তু বাছা, তিনি যে তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় ?

বয়স্ক লোকদেরই আমি পছন্দ করি। মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল।

অত কাঁপছ কেন ? আমার কাছে কাঁপতে হবে না।

যূথিকা তাঁকে চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করছিল। তিনি বলে চললেন। যেটা সবচেয়ে জরুরী তা হল, তুমি এ-সংসারের সুখ-শান্তি বাড়াবে না কমাবে ?

যূথিকা মাথা তুলে বলল, কথা দিচ্ছি আমি সুখ-শান্তি বাড়াব।

আগামীকাল আমি আমার মত জানাব।

ইং তাড়াতাড়ি এসে মেয়েটিকে নিয়ে গেল।

সে চলে গেলে শ্রীমতী ওয়ায়ু সূর্যালোকে উদ্ভাসিত পথ দিয়ে কিছুটা হেঁটে গেলেন। রোদ্দুরটা চোখে লগেছিল কিন্তু পায়ে উষ্ণতা ভালই লাগছিল। তিনি ভাবলেন, ভালই তো করলাম ! কী করে যে অত ভাল করলাম !

তারপর নিজেকে যাচাই করে দেখলেন। যূথিকা যদি শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে সত্যি ভালবেসে থাকে তবে তা মেনে নিতে হবে। যদি তাঁর স্বামীও যূথিকাকে ভালবেসে থাকেন ? তবে সত্যিকারের সুখ আসবে বাড়িতে। এ-সংসারে

ইং এসে হাত ঝাড়ল। তিনি তাকে বললেন, বিশ্রাম করে আমি খোকার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আমি তবে যাই বৌদি, দাদাবাবুকে বলি গিয়ে, ইং বলল। তার চোখে আবার আনন্দের আভা ফিরে এসেছে। শ্রীমতী ওয়ায়ু তা লক্ষ করলেন, এবং অল্প হাসলেন।

স্বাভাবিক পূর্ণ চেতনায় জেগে উঠলেন তিনি। হৃদয়ে পবিত্র প্রশান্তি বিরাজ করছে। সারা জীবন ধরে এই শান্তি, পবিত্রতা অস্থির হয়ে খুঁজছেন। তাঁর শরীরের মধ্যে ইচ্ছের শেকলে বাঁধা বন্দিনীর মতো রেখেছিলেন নিজেকে। বাসনা বা অভক্তি সত্ত্বেও তিনি তার ইচ্ছেকে জোর করে কত সময়ে কত রকম করে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছেন। এখন তিনি অনুভব করলেন যে তাঁকে আর কখনো কোন ব্যাপারে নিজেকে জোর করে কিছু করতে হবে না।

আঁদ্রে, এটা ভারি অদ্ভুত ! চেনার আগেই তোমাকে মরে যেতে হল, তাই না ?

ইং আতঙ্কিত হয়ে ঘরে ঢুকল, সামনের চাতালটা ভিখিরি ছেলেমেয়েতে ভরে গেছে। আর সেই বেশ্যামাগী ফের এসে দোরগোড়ায় বসেছে। বলে কিনা তুমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছ। শ্রীমতী ওয়ায়ু হাসলেন। বললেন, আমার মনে হচ্ছে একটা রুটি-টুটি পেলে খেতাম।

ইং তাঁর দিকে তাকাল, তুমি খুব বদলেছ, বৌদি। তোমার গায়ের চামড়া গোলাপী দেখাচ্ছে। জ্বরজারি হয় নি তো ?

বিছানার কাছে এসে শ্রীমতী ওয়ায়ুর ছোট হাতখানা নিয়ে সে নিজের গালে ছোঁয়াল।

না জ্বরটর না রে। দিব্যি আছি।

তিনি ধীরে হাত টেনে লেপটা ফেলে দিলেন। ওঠার পর ইং তাঁকে গা ধুইয়ে, পোষাক পরিয়ে দিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু লাইব্রেরীতে এলেন। সাধারণ বুদ্ধিতেই তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর জীবন কতগুলি অমীমাংসিত সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কুড়িটি বাচ্চা বাইরের চাতালে অপেক্ষা করছিল। তরুণী বারাঙ্গনা অপেক্ষা করছিল প্রবেশ-পথের সামনে। সদ্যোজাত বাচ্চা নিয়ে চিউমিং রয়েছে। তাঁর নিজের ছেলেরা ও বৌমারা রয়েছেন। ইং তাঁর প্রাতঃরাশ এনে টেবিলের ওপর সুন্দর সারিবদ্ধ ভাবে প্লেটগুলি সাজিয়ে দিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর হাতে খাবার কাঠিদুটো তুলে নিলেন। চাতালে যে বাচ্চাগুলো আছে ওদের খাওয়ানো হয়েছে কি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

[illegible] না। এত খাবারের জন্য হুকুম যায় নি কিছু, ইং কড়া সুরে বলল। তাহলে আমি এখন হুকুম দিচ্ছি ওদের দুপুরের খাবার জন্য এক্ষুনি ভাত রাঁধা হবে, রুটি কিনে আনা হবে এবং চা বানাবে।

ভাগ্য ভাল যে বিষ্টি হতিছি না। যদি এত লোককে এ-বাড়ির ছাতের নিচে জায়গা দিতি হয়, তবে আমাদের সেই বিষ্টির মধ্যি থাকতি হত। ইং বলল।

সবাইর জন্যই জায়গা আছে এখানে। তিনি বললেন। হঠাৎ অবাক হয়ে তিনি দেখলেন, ইং তার নীল কোটটা চোখের সামনে ধরে কাঁদতে শুরু করেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, তুমি বদলে গেছ, তুমি বদলে গেছ।

কিন্তু মধ্যাহ্নে সে বড় বড় গামলা ভর্তি ভাত পাঠাল চাতালে। শ্রীমতী ওয়ায়ু যখন সেখানে গেলেন তখন ছোট ছোট মেয়েরা পরিতোষের সঙ্গে খেতে শুরু করেছে। যে-বৃদ্ধাটি ওদের তত্ত্বাবধায়ক সে একমুঠ ভাত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছোটদের বলল, ওরে—তোদের মা-জননী এয়েছেন, ওঁনাকে মা বলে ডাক সবাই।

হ্যাঁ, তোমাদের বাবা তো চলে গেছেন, আমিই তোমাদের মা হলাম, হাসতে হাসতে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন। অনাথ শিশুরা ভালবাসা ভবে তাকাল তাঁর দিকে। আকস্মিক ভাবে শ্রীমতী ওয়ায়ু জীবনে এই প্রথমবার তাঁর সত্তার মধ্যে সত্যিসত্যি প্রসব-বেদনা অনুভব করলেন। তিনি আরো অনুভব করলেন, তাঁর সত্তা যেন বিভক্ত হয়ে তাঁর নিজের প্রকৃতির চেয়ে অনেক বড় একটা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই শিশুরা তাঁদের এবং তাঁর। সবাই আমার সন্তান। বলার পর কথাগুলি তাঁর নিজের কিনা সেকথা ভাবলেন। তাঁর কথা শুনে শিশুরা সবাই ছুটে এল তাঁকে জড়িয়ে ধরতে, তাঁকে ছুঁতে, তাঁর গায়ে হেলান দিতে।

তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য যতখানি করতে পারতেন তার সবটুকুই করে গেছেন। তবে তোমাদের তো মায়েরও দরকার? একটি মেয়ের গালের ক্ষতচিহ্নে হাত ছুঁইয়ে বললেন, এটাতে ব্যথা আছে নাকি রে?

অল্প অল্প, মেয়েটি বলল।

কী করে হল এটা?

যে-বাড়িতে কাজ করতাম সে-বাড়ির গিন্নী ঠাকরুণ তাঁর সিগারেটের আগুনটা এখানে চেপে ধরেছিলেন।

কেন রে? তিনি আবার জানতে চাইলেন।

আমাকে তো তিনি কিনে ছিলেন পয়সা দিয়ে—তা আমি বেশী তাড়াতাড়ি

হাঁটতে পারতাম না বলে। এতক্ষণে অনেক নীরব দর্শক চাতালের ধারে জমায়েৎ হয়েছে। চাকর-বাকররা একটা না একটা কাজের ছুতোয় এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

সবশেষে এল যূথিকা। অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বেচারী। তার পেছনে পেছনে তার চাকর-ও এল। যূথিকা বেশ শক্ত হয়ে এসেছিল। এ-বাড়ির এক ছেলেকে সে গর্ভে ধারণ করেছে এই আশায় এক জোবালো দাবী নিয়ে এসেছে সে।

এই যে, দেখছ তো অনেক বাচ্চাকাচ্চা আমার : শ্রীমতী ওয়ায়ু হেসে বললেন। তা তোমার কথা ভুলি নি বাছা, আগে ওদের থাকা খাওয়াব ব্যবস্থা করে দেই, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

একটু থেমে অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, আমার বাচ্চাদের যে কোথায় থাকতে দেই ? খুশিভরা গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন।

এক বিধবা বুড়ী বলল, শোন বোন, ভাল কাজই যখন করছ, তখন ওদের ওই মন্দিরটার মণ্ডপে থাকতে দাও না কেন ?

তিনি বললেন, বেশ বুদ্ধি দিয়েছেন তো। মণ্ডপ ছাড়া আর কোনো জায়গাই এদের রাখার উপযুক্ত হত না। ওখানে খেলার জন্য একটা চাতাল আছে, পুকুর ফোয়ারা সব আছে। আমাদের কুলদেবতা এবার হাতে কিছু কাজ পাবেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। তাঁর পেছনে কলরব করতে করতে বাচ্চারা ছুটে চলল।

ওয়ায়ু-ভবনের পেছনে বিরাট একটা পুরোনো মন্দির ছিল। দুশো বছর আগে এই বংশেরই জনৈকা মহিলা এটা তৈরী করিয়ে ছিলেন। এই মন্দিরের মণ্ডপে তিনি এখন বাচ্চাদের নিয়ে এলেন। কাঠের উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে তিনি মণ্ডপে ঢুকলেন। পদ্মফুল ও ধূপধুনোর গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ছিল। কুলদেবতার বিগ্রহের সামনে ধূপধুনো জ্বলছিল। মন্দির-সংলগ্ন উঠোনে পদ্মফুল ফুটে ছিল। পায়ের শব্দ শুনে বৃদ্ধ পুরোহিত পাকশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। আহার্যের জন্য তিনি উনোনে আঁচ দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছাইকালি।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, আমি উপহার এনেছি, তারপর বাচ্চাদের বললেন, তোমরা সবাই ওনাকে তোমাদের নাম বলো দেখি।

কচি কচি খুশি-ভরা গলায় তাঁরা একে একে নাম বলে চলল। হ্যাঁ ওরা সবাই হল মন্দিরে উপহার।

বৃদ্ধ পুরোহিত এর মধ্যে শুনেছিলেন সবকিছু। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে

শ্রীমতী ওয়ায়্‌দ দেবতার উদ্দেশ্যে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করতে চান, কাজেই তাঁর পক্ষে যতই কষ্টসাধ্য হক না কেন তিনি তাতে বাধা দিতে পারেন না। আর শ্রীমতী ওয়ায়্‌দ মন্দিরের ঘরে ঘরে ঢুকে কোন ঘরটায় কারা থাকবে ব্যবস্থা করছিলেন; এতদিন এইসব ঘরে নিঃসঙ্গ দেবতারা নীরব নয়নে ওয়ায়্‌দ ভবনের চত্বরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

এই ঘরটায় পুঁচকেরা, কারণ করুণাদেবীর বিগ্রহ রয়েছে এখানে; আমার হয়ে সারারাত তিনি তোমাদের ওপর নজর রাখবেন। আর···আর এই ঘরটা হল বড়দের জন্য কারণ এখানে তোমরা সবাই ধরে যাবে। তোমরা কিন্তু জায়গাটাকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

ওদের মুখে সুখের হাসি দেখে ওদের তিনি দেবতার কাছে রেখে চলে গেলেন।

যূথিকা ঠোঁট ফাঁক করে উজ্জ্বল রংয়ের রেশমী রুমালটার এক কোণে তাকাল। কথা বলা আমার পক্ষে কষ্টকর, সে বলল।

তা সত্যি কথা বলার মতো তো কিছু নেইও, শ্রীমতী ওয়ায়্‌দ উত্তর দিলেন।

ঢের কথাই বলার আছে। যদি পেটে এটা না আসত, তবে আমি বলতামও, পেটের ওপর হাত রেখে সে বলল।

শ্রীমতী ওয়ায়্‌দ আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে তাকালেন, তোমার তো মোটাসোটা চমৎকার একটা বাচ্চা হওয়া উচিত। তোমার স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই।

যূথিকা একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, এ-বাড়িতে আমি কীভাবে থাকব?

কীভাবে তুমি থাকতে চাও, তিনি প্রশ্ন করলেন।

আমার তো তিসরী বিবি হিসেবে থাকা উচিত, সে বলল। অত অল্প বয়েসের সুশ্রী একটি মেয়ে যে অমন ধারালো ও পাকা দরদস্তুর করতে পারে তা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার।

কিছু মনে করলেন না তো? যূথিকা ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করল।

মনে করব কেন?

তার মানে আপনি বলছেন যে, আমি এখানে থাকতে পারি, এই বড় বাড়িটায় এবং এখানে আমাকে সবাই তিসরী বেগম বলবে। আর যখন আমার বাচ্চা হবে—

আমি চাই না যে এ বাড়ির কোন ছেলে অবৈধ সন্তান হিসেবে ভূমিষ্ঠ হক; সেটা আমাদের সুনাম নষ্ট করবে। তুমিই জন্মের বীজ নেবার আধার। তোমাকে সম্মান দিতেই হবে।

এবার যূথিকা কেঁদে ফেলল। সেই কান্নার মধ্যে তাকে বলতে শোনা গেল, আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে ঘেন্না করবেন। আপনার গোসার জন্য

আমি তৈয়ার ছিলাম কিন্তু এখন আমি কী বলব তা আমার মালুম নেই। তোমার কিচ্ছুটি বলার দরকার নেই। একজন দাসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি; সে তোমাকে তোমার ঘরটর দেখিয়ে দেবে। দুসরী বেগম ডানদিকের ঘরটায় থাকেন। তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন। দেখবে, তিনি কত ভাল। রূপোর পাইপটা যদি তিনি তোমার ঘরে ফেলে যান, তবে বুঝবে সেটাই তাঁর আসার ইঙ্গিত। যদি পাইপটা হাতে নিয়ে চলে যান, তবে যেন রাগ কোর না।

যূথিকা শ্রীমতী ওয়ায়ুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ওরা আমাকে বলেছিল, আপনি খুব সাচ্চা মানুষ কিন্তু এখন দেখছি আপনার বড়ী মেহেরবানি।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর শরীরে গলা থেকে ওপর পর্যন্ত যেন একটা চকিত তরঙ্গ বয়ে গেল। তিনি বললেন, অন্য কোনদিন যদি তুমি আসতে তবে আমি হয়ত রাগই করতাম কিন্তু আজকের দিনটা আগের দিনগুলি থেকে এত আলাদা যে কী বলব।

মেয়েটিকে না তুলেই তিনি উঠে, চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নিজের মনে মনে বললেন, আমিতো একটা পাজী মেয়েমানুষ। এ-বাড়িতে কত মেয়েমানুষ যে এল তাতে আমার কীই বা এসে যায়। আমার নিজের হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

এই ভাবনার একটা প্রত্যুত্তর আশা করে তিনি থামলেন কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পেলেন না। কেবল তাঁর মনের পরিপূর্ণ শান্তিই যেন এর যোগ্য প্রত্যুত্তর হয়ে রইল। তিনি স্বগত বললেন, ওগো—যদি তুমি বেঁচে থাকতে, আমি তোমাকে আবিষ্কার করতাম। তাহলে কি এই নীরবতার ব্যবধান থাকত? তবু তিনি কোন উত্তর পেলেন না। এই নীরবতার জন্য এক টুকরো হাসি ভেসে উঠল তাঁর ঠোঁটের কোণে।

প্রধান ফটকে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে পিওনীকুঞ্জের মাটি পরীক্ষা করতে দেখলেন তাঁর লম্বা বাঁশের পাইপের পেতল বাঁধানো দিকটা দিয়ে।

ভাল আছ তো গো? শ্রীমতী ওয়ায়ু সৌজন্য সহকারে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, ভাল ভাল। মাটি দেখতে দেখতে তিনি বললেন।

তোমার পাইপটার বারটা বাজাবে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

না গো, দেখছি পিওনীর শেকড়গুলো শক্ত হয়েছে নাকি? এত বিষ্টি হয়েছে যে ভয় হচ্ছে ওদের গোড়া না পচে যায়।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর পেছনে পেছনে তিনি বড় ঘরটায় এলেন।

এইমাত্র যূথিকার সঙ্গে কথা বললাম, মাঝখানের দেয়ালের পাশের টেবিলটার বাঁ

দিকে তিনি বসলেন এবং শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু সচরাচর যে জায়গায় বসেন সে জায়গায়ই বসলেন। বিয়ের পর দিনাবসানের নিভৃত মুহূর্তগুলি তাঁরা এভাবে বসেই কাটাতেন।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু পাইপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। নিজস্ব সহজাত অন্তরদৃষ্টিতে বুঝতে পারেলেন যে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তাঁকে ভয় পাচ্ছেন। তিনি বিচিত্র একটা বেদনা-বোধ অনুভব করলেন। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু তাঁকে কখনো সত্যি সত্যি ভালবাসেন নি। না হলে তিনি তাঁকে অমন ভয় পাবেন কেন? এই মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগে? শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে জিজ্ঞেস করলেন।

ও সব ব্যাপারেই নিচু স্তরের। সেটা আমিও বুঝতে পারি তবে ওর জন্য আমি দুঃখিত। কী জানো, জীবনে কোন্ সুযোগটাই বা ও পেয়েছে? ওর জীবনের কাহিনীটা বড় দুঃখের, বেচারীর!

তবে ও যদি তোমার ভালবাসা পেয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই অসাধারণ।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু যেন কেমন চমকে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শরীর ভাল আছে তো গো? তোমার গলাটা যেন আগের চেয়ে অনেক দুর্বল!

যা সবল আছি এখন, তেমন আর কখনো থাকি নি। তোমার এই যূথিকা সম্বন্ধে আরো কিছু বলো, ওকে তো তুমি ভালবাস।

একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলেন, ভালবাসি কিনা সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তার মানে, তোমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব যা ছিল, ওর সম্বন্ধে তা নেই! ওকে আমি মোটেও তোমার মত শ্রদ্ধা করি না। ওকে আমি প্রশংসা করতেও পারি না। লেখাপড়া জানে না ও। কোন ব্যাপারেই ওর মতামত নেওয়া যায় না।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখ আগের চেয়ে উদ্দীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক দেখাচ্ছিল। তা দেখে তিনি আরেকটু স্বস্তি পেলেন। না তাঁর স্ত্রী রাগ করেন নি। তিনি বললেন, চমৎকার তোমার সাধারণ জ্ঞান। তা, আমি কি বলে যাব, শুনবে?

বাঃ রে, তখন থেকে তোমাকে কত করে বলছি! বলো না, ওকে তুমি কী ভাবে দ্যাখো।

এ-ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন বলো তো?

ধরে নাও যে এ-বাড়িতে চিউমিংকে আমদানী করে তোমার ওপর আমি অবিচার করেছি।

তুমি তো ভাল মনেই করেছিলে।

আমি স্বার্থপরের মত কাজ করেছিলাম। এই প্রথম নিজের কোন কাজ সম্পর্কে শ্রীমতী ওয়ায়ু ত্রুটি স্বীকার করলেন।

এতে তাঁর স্বামী অভিভূত হয়ে পড়লেন।

তোমার মতো কেউ নেই। আমি এখনও বলব যে, তোমার চল্লিশ বছরের জন্মদিন না পেরুলে, পৃথিবীর অন্য কোন নারীকে আমি জানতামই না।
তিনি আবার হাসলেন। বললেন, হায়, মেয়েদের কাছে এই চল্লিশ বছরের জন্মদিনের একমাত্র বিকল্প হল মরণ। যদি তাঁর স্বামীকে তিনি ভালই বাসতেন তবে এ-বাড়িতে যূথিকা আসার আগে তিনি মৃত্যুকেই বেছে নিতেন। না, না, ওইসব মরা-টরার কথা বোল না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওই মেয়েটিকে আমি কীভাবে দেখি, কেমন? বুঝলে, ও না আমাকে খুব শক্তিমান করে দেয়। মনে হয়, আমি খুব শক্তিশালী। আমার ওপর ওর প্রভাব এটাই। হ্যাঁ।
শক্তিশালী? শ্রীমতী ওয়ায়ু শব্দটার পুনরাবৃত্তি করলেন।
ও এত ছোট, এত অজ্ঞ, এত দুর্বল…শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন। নরম পুরু হাসির স্বর ভেসে উঠল তাঁর ঠোঁটে। তিনি আবার বলে চললেন, জানো—আজ অবধি কেউ ওকে এতটুকু যত্নও করে নি। বাস্তবিক, ও একেবারে বাচ্চা। না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই। কেউ ওকে সত্যি করে বোঝে নি। ও খুব সরস ও সাধারণ, বুঝতেই তো পারছ খুব বুদ্ধিমী জীব ও নয়। তবে ওর আবেগ খুব গভীর। ওকে সবসময় পরিচালনা করার মত একজন লোক দরকার। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর কথা শুনছিলেন। সারা জীবনে তাঁর স্বামী কক্ষনো নিজের প্রয়োজন এবং বাসনা ছাড়া অন্যকিছুর কথাই বলেন নি।
তুমি ওকে সত্যিসত্যি ভালবাস।
তাঁর গলায় প্রশংসার সুর ফুটে উঠল এতে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু যেন বিনয় ও গর্বের সঙ্গে সাড়া দিয়ে বললেন, তোমাকে যা বললাম তা যদি ভালবাসা হয়, তবে ওকে আমি ভালবাসি।
দুজনে পরস্পরের এত কাছে আর কখনো আসেন নি। তিনি জানেনই নি যে, এই পুরুষের মধ্যে এরকম একটা হৃদয় লুকিয়ে আছে। তাঁকে যেন নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। এই অনুভূতি তাঁকে বিস্মিত করে তুলল। এটা অবাক হবার মত কিছু না যে অাঁদের মত একজন মানুষ তাঁর মধ্যে ভালবাসা জাগিয়ে তুলবেন কিন্তু যূথিকার মত ছোটখাট গোলাপি রংয়ের পথের একটা অজ্ঞ সাধারণ মেয়ে যে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মধ্যে সেই একই শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে, এটা অলৌকিক ব্যাপার নাতো কী! তুমি কিছু মনে করলে না তো?
করুণ মিনতির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন।
জানো, জানো…আমার খুব আনন্দ করতে ইচ্ছে করছে। তাঁরা একসঙ্গে উঠে মেঝের ওপর বিছানো রোদ্রের আলপনার মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর উষ্ণতা তাঁর দিকে ছুটে গেল এবং তাঁর তাপ সাড়া দিল। তিনি শ্রীমতী ওয়ায়ুর চোখের দিকে তাকালেন। তুমি তুলনাহীনা, শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন।

হয়ত তাই, তিনি সায় দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে হাতটা টেনে নিলেন। এই সময় ইং হঠাৎ "বৌদি" বলে ঘরে ঢুকে লজ্জায় সরে গেল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু যে তাঁর মধ্যেকার পরিবর্তন সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কথা মনে করাটা উচিত হবে না। আসলে তিনি তাঁর পরের কার্যক্রম কিছু ঠিক করে উঠতে পারেন নি। তিনি বুঝছিলেন, জ্যোতির্ময় একটা পথে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। এই পথে চলতে পারলেই যেন কল্যাণ আসবে। এই পথ ছেড়ে ও-পাশে পা দিয়ে ফেললেই তাঁর অনিষ্ট। আঁদ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসাই এই পথের আলো।

তাই পরদিন যখন ইং চিউমিং-এর বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে এলো তিনি আশ্চর্য এক বাৎসল্যরসে ভরে উঠলেন। এই শিশুটিকে দিয়েই তিনি চিউমিংকে এই পরিবারের মালায় গেঁথে নিতে পারেন। যেখানে আগে এই শিশুটিকে মনে হয়েছিল একটা অতিরিক্ত বোঝা এবং চিউমিংয়ের ব্যাপারটা মনে হচ্ছিল ভারি গণ্ডগোলের সেখানে এখন মনে হল, বাচ্চাটা বোঝা তো নয়ই এবং চিউমিংকে নিয়েও কোন গণ্ডগোল নেই। আঁদ্রের মতনই তিনি মা ও শিশুকে সামলাবেন। চিউমিং কোথায় রে?

সে তো রান্নাবান্না দেখছে বাগান দেখছে ইং বলল।

ওর মন ভাল আছে তো?

সে মেয়ে সুখী হবার নয়, হ্যাঁ এই বলে দিনু। ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেই আমরা ভাল করতাম। সবজায়গায় ওই দুঃখী-দুঃখী মুখ দেখতে ভাল লাগে নি বাপু। ধাইমাদের বুকের দুধ কেটে যায় আর তাই বাচ্চাটাও কেঁদেঁপে ওঠে। সে বলল।

ওকে এখানে আসতে বল তো, তিনি বললেন।

দিনটা নিঃসাড়, ধূসর।

গতকালের মত রোদের তেজ নেই। নদী থেকে কুয়াশার গন্ধ ভেসে আসছে। শ্রীমতী ওয়ায়ু সেই গন্ধ নিলেন।

তাঁর কাছেই ঝুড়ি বিছানায় একটা বাচ্চা মেয়ে শুয়ে শুয়ে হাত নেড়ে নেড়ে খেলছিল। নিজের হাত সে ঠিক পাচ্ছিল না।

জীবনের শুরুটা কত ছোট করে! একদিন আমিও তো দোলনায় শুয়ে দোল খেয়েছি—আর আঁদ্রেও। তিনি ভাবলেন। আঁদ্রেকে তাঁর ছোটবেলার চেহারায় ভাবতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মার কথা ভাবতে চেষ্টা করলেন।

নিশ্চয়ই তাঁর মা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর এই ছেলে নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে অন্যকে ঈশ্বরের করুনায় অভিষিক্ত করে চলবে।
দরজা খুলে গেল। চিউমিং ঢুকতেই বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকটা বন্ধ হল। কারণ, চিউমিং দরজাটা বন্ধ করে দিল। চোখ তুলে তাকে দেখলেন তিনি। সে যেন সকালবেলার শিশিরের মত, ঠাণ্ডা, অচঞ্চল ধূসর, মুখ বোজা ঠোঁট ফ্যাকাশে। পাণ্ডুর চোখের পাতা কালো চোখের ওপর ভারি হয়ে নেমে এসেছে।
তোমার খুকীকে একবার দ্যাখো ওর কাণ্ড দেখে ভারি হাসি পাচ্ছে আমার। হাত নিয়ে খেলতে খেলতে একবার তা হারিয়ে ফেলছে এ বার খুঁজে পাচ্ছে। চিউমিং এসে দোলনার গদি বিছানার দিকে তাকাল। সে চোখে স্নেহ নেই। সে বাচ্চাটাকে ভালবাসে না। যেন ওই শিশুটি তার কাছে অপরিচিত।
অন্যদিন হলে তিনি এসব লক্ষই করতেন না। এসব অন্যের ব্যক্তিগত বলে এড়িয়ে যেতেন কিন্তু আজ শ্রীমতী ওয়াংকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার নিজের মেয়েকে ভালবাস না এ-ও কি হতে পারে?
ওকে নিজের বলে মনেই হয় না।
তুমিই তো ওর মা।
সে তো আমার ইচ্ছেয় হয় নি।
দুই নারী চুপ করে রইলেন। দুজনেই শিশুটিকে দেখছিলেন। আগে হলে, বাচ্চাকে ভাল না বাসলে তিনি মাকে বকতেন কিন্তু এখন প্রেম তাকে অন্যভাবে তৈরী করছিল। তিনি চুপচাপ বসেছিলেন।
এই বাচ্চা মেয়েটিকে চিউমিং ভালবাসবে না কেন? হতে পারে, ওর বাবাকে ও ভালবাসে না। ওর বাবাকে, মানে শ্রীযুক্ত ওয়াংকে। আর ও না হয় একদা একজনকে ভালই বেসেছিল, তাই বলে শ্রীযুক্ত ওয়াংকে ভালবাসতে বাধা কোথায়?
তুমি কাকে ভালবাসো? হঠাৎ চিউমিং-এর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি। ওর মুখে রক্তের আভা ছড়িয়ে পড়ল। তার ছোট ছোট কানদুটি পর্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠল।
কাউকে না, এমন সাদামাটা ভাবে উত্তর দিল যে শুনে তিনি হেসে ফেললেন। কী করে তোমার কথা বিশ্বাস করি বলো তো? তোমার গাল, তোমার কানের লাল আভা দেখে কিন্তু সত্যকে আঁচ করা যায়। মুখে উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছ? তুমি ওর বাবাকে ভালবাস নি বলে এই বাচ্চাটাকেও ভালবাস না! কেউ জোর করে ভালবাসতে পাবে না। এজন্য তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। যে অন্যায় আমি করেছি তা আমি জানি। তবে তোমাকে যখন এ বাড়িতে

আনাই, তখন ভালবাসার ব্যাপারে আমি কিছু বুঝতাম না। আমার ধারণা ছিল পশুদের মতোই নরনারীর মিলন ঘটানো যায়। এখন আমি বুঝতে পারছি যে,, পশুদের মতো নরনারীর মিলন ঘটালে, তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে। কারণ মানুষ তো আর পশু নয়। একেবারে না ছুঁয়ে, শুধু চোখের চাওয়ায় একজন আরেকজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেতে পারে। রক্তমাংসের এই শরীরটা না থাকলেও মানুষ ভালবাসতে পারে। রক্তমাংসের বন্ধনটাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূল কথা নয়।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখে এইসব কথা এত অদ্ভুত, এত ভয়ানক যে চিউমিং শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। শ্রীমতী ওয়ায়ুর কথাবার্তা এতদিন যা শুনে এসেছে তা ছিল ভাবাবেগবর্জিত কিন্তু এ তো জলজ্যান্ত সেই শ্রীমতী ওয়ায়ুকেই দেখতে পাচ্ছে চিউমিং। উজ্জ্বল তাঁর চোখ। মার্জিত মসৃণ অবয়ব! স্বাস্থ্যের সুষমা সর্বাঙ্গে! নতুন এক জীবনে যেন তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন। চিউমিং দেখছিল।

এসো, তোমার মনের মানুষটির কথা বলো তো দেখি?

লজ্জা লাগছে যে! জামার কোণ পাকাতে পাকাতে বলল চিউমিং।

লজ্জায় মরতে দেব না তোমাকে, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

এভাবে অনেক করে বোঝাত বোঝাতে শেষে চিউমিং বলল, আপনি আমাকে একজন বয়স্ক লোকের উপপত্নী হবার জন্য এনেছিলেন…কিন্তু…বলতে গিয়ে থেমে গেল চিউমিং।

শ্রীমতী ওয়ায়ু যোগ করলেন কিন্তু অন্য একজন আছেন?

চিউমিং মাথা নাড়ল।

সে কি এই বাড়িতে থাকে?

চিউমিং আবার মাথা নাড়ল!

আমার ছেলেদের মধ্যে কেউ কি?

এবার তাঁর দিকে তাকিয়েই অঝোরে কেঁদে ফেলল চিউমিং।

ফেংমো?

চিউমিং কেঁদে চলল। জট পাকিয়ে গেল এখানটায়। নারী-পুরুষ সম্পর্কের কী জটিলতা! সবই তাঁর নিজের বুদ্ধির দোষ। অপ্রেমের বিষবৃক্ষ!

আর কেঁদ না। সবই আমার পাপ। যেভাবেই হক আমি এর ক্ষতিপূরণ করব। কিন্তু কী যে করব বুঝতে পারছি না। তিনি বললেন।

একথা শুনে চিউমিং তাঁর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগল।

আমি তো বলেই ছিলাম, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। আমার মরণ ভালো। আমার মত এরকম জীবের মরাই ভাল। সে বলল।

প্রত্যেকটি জীবের দরকার আছে এ-জগতে, বলে তিনি চিউমিংকে তুলে ধরলেন। তুমি যে আমাকে বলেছ, এতে আমি খুশিই হয়েছি। এখন আমার অনুরোধ, ধৈর্য ধরে এ-বাড়িতে থাকো। আমি নিশ্চয় এই সমস্যার মিমাংসা করার মত কোন সঙ্কেত পাবো। ইতিমধ্যে যে-সব আশ্রিতদের এনেছি, তাদের দেখাশুনা করো। তাহলে আমার বড্ড উপকার হয়। ওদের এনেছি বটে কিন্তু একটুও সময় দিতে পারছি না।

ওদের কথা শুনে চিউমিং চোখ মুছল। সে বলল, আমি ওদের নিশ্চয়ই দেখব। কেন দেখব না। ওরাতো আমারই বোন। এই বলে বিছানা থেকে নিজের বচ্চাকে তুলে নিয়ে বলল, এই বাচ্চাটাকেও নিয়ে যাচ্ছি—এ-ও তো কুড়ানি অনাথিনী, কারণ ওর মা ওকে ভালবাসতে পারে না, বেচারী !

শ্রীমতী ওয়ায়ু কিছু বললেন না।

কীভাবে চিউমিংকে সুখী করা যায় তা তিনি ভেবে ঠাহর করতে পারছিলেন না। সময় তা খুঁজে বের করবে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মহিলা। জীবনে যেটুকু শিখতেন, সেটুকুর প্রয়োগও করতেন। এই বিরাট বাড়িটা, যা তাঁর জগৎ, এখানে দুটি বিশৃঙ্খল মানুষ বাস করছে—তার মানে এমন দুজন, যারা এই বাড়ির সঙ্গে সঠিক ভাবে যুক্ত নয়, তাই বিশ্বের সঙ্গেও নয়। এরা হল রূলাং আর লিনউয়ি। তাড়াহুড়ো না করে, দিন বয়ে যেতে দিয়ে, তিনি সেই দিনটি নির্বাচন করলেন, যেদিন ওদের সঙ্গে কথা বলবেন। রূলাং বয়েসে বড়, ওর সঙ্গেই প্রথমে কথা বলবেন।

অনেক মাস হয়ে গেল, সেমো আর ফেংমো বাড়ি ছেড়ে গেছে। ছেলেরা ভাল। তাঁর কাছে নিয়মিত চিঠি দিত।

ওইসব চিঠি থেকে শ্রীমতী ওয়ায়ু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর দু'ছেলে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরিত পথে যাচ্ছে। ফেংমো পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে চেয়েছিল। তিনি তাঁকে অনুমতি ও প্রয়োজনীয় পাথেয় দিয়েছিলেন। আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় সমুদ্র-পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তাই তাড়াতাড়ি সব কিছুর যোগাড় করতে হয়েছিল। তার মধ্যে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে সে দীর্ঘতর স্থলপথে না গিয়ে জাহাজেই ফিরত।

সে যদি একমাত্র পুত্র হত তবে শ্রীমতী ওয়ায়ু নিশ্চয়ই এটা অনুমোদন করতেন না কিন্তু তাঁর অনেক ছেলে, তিনি তাই তাকে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য চাপ দেন নি। হেমন্তের শুরুতে সে নিরাপদেই জাহাজে চড়ে পৌঁছেছিল। তবে সেমো সাগর-পাড়ি দিতে চায় নি। তার বদলে সে রাজধানী-শহরে গিয়ে, পারিবারিক ঐশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবাদে ভাল একটা কাজ [illegible]

গেল। এতে শ্রীমতী ওয়ায়ু বা তাঁর স্বামী বিন্দুমাত্র অবাক হন নি। তাঁর মন যত বড়ই হক না কেন, তাঁদের পরিবার যে সারাদেশে গন্যমাণ্য সেটা তাঁদের স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। পরে সেমো আসল কারণটা লিখেছিল। যুদ্ধ বাঁধলে সরকার দেশের অভ্যন্তরে দপ্তর স্থানান্তরিত করবেন। তখন দেশের প্রধান নাগরিকবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারের ওপর সেই পশ্চাদপসরণ বহুলাংশে নির্ভর করবে। এঁদের মধ্যে প্রদেশাঞ্চলে ওয়ায়ু-পরিবারের প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। সেমোকে তাই অনেক বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তাকে এজন্য অনেক ঈর্ষা ও বিদ্বেষও সহ্য করতে হয়েছে এই ডিঙিয়ে যাবার দরুণ কিন্তু সে বয়েসে তরুণ এবং কষ্টসহিষ্ণু—সে নিজেই নিজের পথ করে নিয়েছে।

তার চিঠি থেকে শ্রীমতী ওয়ায়ু অবশ্য বুঝতে পারলেন না যে সে কোন চাকরী করছে। ফেংমোকেই তিনি ভাল জানেন। তার নিজস্ব ধরনে সে তার মন ও হৃদয় মেলে দিচ্ছিল। পূর্ব সমুদ্রের দিকের লোকদের হঠাৎ আক্রমণের খবরে সেমোর ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ফরসালা হয়ে গেল। শ্রীমতী ওয়ায়ু খবরটা পেয়ে খবরের কাগজ, যা তিনি সচরাচর পড়তেন না, আনিয়ে নিলেন। কী কী ঘটছে দেখার জন্য। পড়ে দেখলেন, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে যা পড়েছেন, এ যেন তারই পুনরাবৃত্তি। আগের আগের শতাব্দীগুলিতে এরকম অনেক আক্রমণ হয়েছে এবং তাঁর জাতি রুখে দাঁড়িয়েছে। এবারও তাই দাঁড়াবে। তিনি উদ্বিগ্ন হলেন না। শত্রুরা শত শত মাইল ভেতরে, যেখানে ওয়ায়ু পরিবারের বাড়ি এসে পড়বে, এমন আশঙ্কা ছিল না।

শত্রুরা আকাশপথেও আক্রমণ করছিল। কিন্তু এদিকে বড় কোন শহর নেই। নিজের বাড়িতে শ্রীমতী ওয়ায়ু নিরাপদ। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে কতগুলি দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। সরকারী দপ্তর দেশের অভ্যন্তরে সরিয়ে আনা হল। সেই সঙ্গে সেমোও চলে আসবে। হেমন্তের মাঝামাঝি সেমো লিখল যে সে দশ-বারো দিনের জন্য বাড়ি আসছে।

এই চিঠি পেয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বুঝলেন, রুলাংয়ের ব্যাপারে মোটেই আর দেরী করা চলবে না। তিনি ইংকে পাঠালেন রুলাংকে ডাকতে।

রুলাং এলো।

শ্রীমতী ওয়ায়ু চট করে তাঁর বক্তব্যে এলেন না। তিনি সৌজন্য সহকারে বললেন, ক'সপ্তাহ ধরে কেবলই ভাবছি যে, তোমাকে সাংহাইতে তোমার বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করব। শত্রুপক্ষের আক্রমণের সময় তারা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তো?

বাবা সবাইকে নিয়ে হংকং-এ চলে গেছেন, রুলাং বলল।

আহ্ সেতো অনেকটা দূর, শ্রীমতী ওয়ায়ু সদয়কণ্ঠে বললেন।
খুব একটা দূর না ; আমিই বাবাকে ওখানে যেতে বলেছিলাম।
তোমার কি মনে হয় শত্রুপক্ষ অতদূর যাবে? বুলাংয়ের দ্রুত উত্তরে তিনি খুশি না হয়ে পারলেন না।
যুদ্ধ অনেক দিন ধরে চলবে। তিনি মন্তব্য করলেন।
হ্যাঁ। কারণ অনেক দিন ধরে এর জন্য প্রস্তুতি চলছে। বুলাং বলল।
খুলে বলো তো, কেন একথা বলছ! মেয়েটির নিশ্চিতিবোধ দেখে তিনি কৌতুক অনুভব করছিলেন।
তাই বুলাং বলল, দেখুন মা, পূব সাগরের লোকেরা অনেক দিন ধরেই ভয়ের মধ্যে আছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আর কেন বিদেশী আক্রমণের ভয়। তারা দেখেছে একের পর এক দেশ আক্রমণ করে দখল করে থেকেছে পশ্চিম থেকে বিজয়ীরা এসে এমন কি চেঙ্গিস খাঁ যখন আমাদের দেশ জয় করল, তখনও তারা এই ভয় পেতে শুরু করেছিল। পর্তুগাল, স্পেন থেকে, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে হানাদাররা এসে দেশ দখল করে নিতে থাকে। ইংল্যাণ্ড এসে ভারতবর্ষ দখল করে নিল। আমাদের দেশও বারবার এইসব লোভী পররাজ্যলোলুপ পশ্চিমী শক্তিবর্গদ্বারা বিজিত হয়েছে। পূব সাগরের লোকেরা ভাবল তবে আমাদেরই বা রেহাই মিলবে কেন? এই ভীতি থেকে তারা পররাজ্য আত্মসাৎ করতে লাগল নিজের জন্য। আর আমরা হলাম গিয়ে ওদের নিকটতম প্রতিবেশী।
কোন তরুণীর মুখে এ-সব কথা শুনতে ভয়ানক লাগে। শ্রীমতী ওয়ায়ু অবাক হয়ে শুনে গেলেন। আঁদ্রেও এসব কথা বলেন নি।
কোথায় থেকে এসব কথা জানলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। সেমো আমাকে ফি হপ্তায় চিঠিতে লেখে, বুলাং বলল। তাঁর বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। স্বস্তিতে তিনি বললেন, তোমাদের দুজনের সদ্ভাব ফিরে এসেছে তাহলে?
বুলাংয়ের গাল রাঙা হয়ে উঠল। কাছাকাছি না থাকলে আমাদের খুব মিল থাকে। ও এলেই আবার ঝগড়া করতে শুরু করব।
রূপোর পাইপটাতে তামাক ভরছিলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। কিছুক্ষণ পুত্রবধূর দিকে তাকালেন না। ততক্ষণ উঠোনের বাগানে হলুদ অর্কিডগুলির দিকে চেয়েছিলেন।
হঠাৎ আঁদ্রের অভাব তিনি তীব্র ভাবে অনুভব করলেন। মনে হল আর কোনদিন তিনি তাঁর জীবন্ত মুখের দিকে তাকাতে পারবেন না। সেই মুখ, যা তাঁর মর্মে গিয়ে কী এক অজানা বেদনার ভাষা উচ্চারণ করত।

তিনি সেই নাম-না-জানা বেদনা অনুভব করলেন চোখ বুজে। একসময় ত'ার মনে হল, বূলাং ত'ার হাতটা নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরেছেন। তিনি উষ্ণ একটি গাল এবং তারপরে অন্য গালটির ছেঁায়া পেলেন। তবু তিনি চোখ খুললেন না।

আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি বৌমা, তোমাদের বিবাহিত জীবনকে সুখের করে তুলতে ধরে নাও আমার ছেলেব কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাবে না, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

তিনি যখন চোখ খুললেন তখন ঘর শূন্য।

বূলাং চলে গেছে।

সেদিন রাত্রে ইং যখন শ্রীমতী ওয়ায়ুকে বিছানায় যাবার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ খুলে দিচ্ছিল, তখন সুদীর্ঘ নীরবতা ভেঙে ডাকলেন, ইং!

হ্যাঁ—বৌদি, আয়নায় ত'ার প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল।

তোকে একটা কাজ দেব।

হ্যাঁ, বলো বৌদি।

মাসখানেকের মধ্যেই মেজখোকা বাড়ি ফিরবে।

সে জানি বৌদি। আমবা সব্বাই তা জানি।

কাজটা হল, প্রত্যেক রাত্রে আমার কাজ সেরে তুই মেজবৌমার কাছে গিয়ে আমার জন্য যা-যা করিস, ওকেও তাই তাই করে দিবি।

আয়নার দিকে চেয়ে ইং হাসল কিন্তু শ্রীমতী ওয়ায়ু হাসলেন না। ইং-এর চোখে চোখ না রেখে তিনি বলে চললেন, আমি যা-যা করতুম তার কিছুই ভুলিস না যেন। সুগন্ধি জলে চান, নাক কান এ রকক সাতটি জায়গা সুরভিত করা—যেন মনে হয় শরীরের ভেতরটাই সুরভিত এবং সেই সৌরভই বেরুচ্ছে। তারপর তেল মালিশ করে গা মোলায়েম করা, চুলে সুবাসিত তেল দেওয়া।

আমি জানি বৌদি, অন্তরঙ্গ উষ্ণতার সঙ্গে ইং বলল। হাতে ব্রাশটা নিয়ে সে বলল কিন্তু আমাকে যদি বাধা দেয় তবে কী করব? তোমার সে-বৌমা রূপ-টুপ নিয়ে অতো মাতা ঘামায় না।

ও বাধা দেবে না, দেখিস। ওর এখন সাহায্য দরকার। সব মেয়েদেরই এক সময় তা প্রয়োজন হয়। এখন ও তা বুঝতে পেরেছে। তিনি বললেন।

হ্যাঁ বৌদি, ইং বলল।

নবম চান্দ্রমাসের পঞ্চম দিনে সেমো বাড়ি ফিরে এল।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু নিজেই শ্রীমতী ওয়ায়ুর মহলে এলেন। আজকাল তিনি বড় একটা এদিকে আসতেন না। কাজেই তাঁকে দেখে তিনি বুঝলেন নিশ্চয়ই ছেলেদের সম্পর্কে কোন খবর আছে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু ভাবতে ভাবতে বললেন, আমরা ওকে স্বাগত জানাবার জন্য একটা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে পারি।

শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন, আমার বন্ধুদের বলতে হবে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু একটু ভেবে বললেন, তারপর আমাদের সব দোকানের কর্মচারী, খামারের চাষীদেরও একটা ভোজ দিতে হবে।

সব কুছ, সব কুছ, শ্রীযুক্ত খোসমেজাজে উচ্চস্বরে বললেন।

শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর অর্দ্ধ নিমিলিত চোখে স্বামীকে দেখছিলেন! ভদ্রলোক আবার তাঁর আগের মেজাজ ফিরে পেয়েছেন। যূথিকা তাহলে তার উপকারই করেছে। নিজের মূল্যবোধের ব্যাপারে তিনি সচেতন হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু ব্যর্থ হয়েছেন। নিজের মনেই তিনি এমন ধারণা তৈরী করে নিয়েছেন যেন তাঁকে বাতিলের দলেই তাঁর বৌ ফেলে দিয়েছেন। চিউমিং তাঁর ক্ষতিই করেছে। যূথিকা তার পেশাদারী নৈপুণ্যে সেই সাফল্যের ভাবটা এনে দিয়েছে। যা তাঁর দরকার। একটু হিংসে হলেও শ্রীমতী ওয়ায়ুর মনটা অনেক স্বস্তি পেল। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে তিনি বললেন, তুমি যেমনটি চাও সেরকমই হবে সব। শ্রীযুক্ত গলা নাবিয়ে ফিসফিস করে বললেন, তুমি হয়ত জানো না, সোমো হচ্ছে ছেলেদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। এজন্য, মেজবৌমার রাগী স্বভাব দেখে আমার ভারি কষ্ট হত। যদি কোন নরম-সরম স্বভাবের বুঝদার একটি মেয়েকে ও বিয়ে করত!

শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, দ্যাখো সেমো আর বৌমা দুজনেরই বুদ্ধি আছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই বৌমার সম্পর্কে আমার ভাল ধারনা হচ্ছে।

বুদ্ধির কথা উঠতেই শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বললেন, বেশ তুমিই ঠিক। তাহলে তুমিই সবকিছু আয়োজন করবে, না আমি করব?

বাড়ির ব্যাপারটা আমি দেখছি, তুমি অতিথিদেব নেমন্তন্ন করো, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

খাস খানসামা, ববুর্চি, বেয়ারা, ঝাড়পোঁছ করার ঝিদের ডেকে সব কাজকর্ম বুঝিয়ে দিলেন। নায়েব মশাইকে ডেকে বললেন, যেন ছোট ছেলে ইয়েনমোকে

গ্রামের খামার থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। অনেক মাস ওকে দেখেন নি তিনি। প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষ।

আজ সেমের ফেরার দিন। উড়োজাহাজে আসছে। কাজেই ঠিক সময়টা বলা যাচ্ছে না। শ্রীমতী ওয়ায়ু বূলাংকে দেখতে গেলেন। কী শান্তশিষ্ট, এমন কি একটু যেন লাজুক-লাজুকও দেখাচ্ছিল তাকে। দারুণ টকটকে লাল একটা নতুন পোষাক পরেছিল বূলাং। তার ফর্সা রং ও লাল ঠোঁটের সঙ্গে সেটা মানিয়েছিল ভাল। শ্রীমতী ওয়ায়ু পোষাকটার আঁটসাঁট ছাটকাট ও ঝুল দেখে খুশি হলেন। হাতাটা অবশ্য একটু খাটো। তবে বূলাংয়ের বাহু ও হাতের গড়ন সুশ্রী বলে সে-কথা আর উল্লেখ করলেন না। নিজের গয়নার বাক্সটা খুলতে বললেন ইংকে। তারপর তা থেকে চুণী বসানো একটা আংটি নিয়ে বূলাংয়ের মধ্যমায় পরিয়ে দিলেন। বূলাং আঙুল নেড়ে দেখে বলল, এমনিতে আংটি-পরা আমি পছন্দ করি না কিন্তু এটা আমার দারুণ লাগছে।
তোমাকে মানিয়েছেও। যে মেয়েকে যা পড়লে মানায়! মুখ হাঁ করো দেখি।
বূলাং হা করল। তিনি তার দাঁত ও মুখের ভেতরটা দেখলেন। তারপর অন্তর্বাস ও হাতের তালু দেখলেন। যে সুরভি তিনি ব্যবহার করতেন সেই সুরভি বেরুচ্ছে ওর জামা কাপড় থেকে।
না! তোমার শরীর নিখুঁৎ। তবে তোমার হৃদয় আমি দেখতে পাচ্ছি না।
বূলাং বলল, আপনি যা যা বলে দিয়েছিলেন, আমি তার কিছুই ভুলি নি।

জনমানবহীন একটা মাঠের মধ্যে সেমোকে নাবিয়ে দিতে বৈমানিকের একটু দ্বিধা হচ্ছিল। সেমো হেসে তাকে বলল, আমার নিজের বাড়ি এই শহরে পথ ঠিক চিনে নেব, ভাববেন না।
আর দ্বিরুক্তি না করে পাইলট আবার উড়ে গেল আকাশে। সে ফিরতেই সবাই তাকে জিজ্ঞেস করল, কোন পথে সে এল? সেমো বলল, হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে ভেসে।
লম্বা লম্বা পা ফেলে সেমো এগিয়ে যাচ্ছিল। লিয়াংমোর চিঠিতে সে জেনেছিল যূথিকার কথা। তাই বাবার মহলে গিয়ে অপরিচিতা একটি নারীর মুখোমুখি না হয়ে সে মার মহলের দিকেই পা চালাল কিন্তু সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল বূলাং মার ঘরেই রয়েছে।
তাহলে শেষে এলি খোকা, শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।

বুলাং নীরবে দাঁড়িয়েছিল। ওর শান্ত মুখ দেখে অবাক লাগল সেমোর। আরও অবাক হল যখন মা ওর বুলাংয়ের হাতদুটি ধরে একত্র করে দিলেন। বললেন, ও খুব পালটে ফেলেছে নিজেকে—এখন ও ভারি বাধ্য আর ভাল।
কর্তৃত্বময়ী মায়েদের ছেলেরা যেমন হয়, সেমোও তেমনি নিজের বৌ সম্পর্কে মায়ের এই মন্তব্য শুনে খুশি হল। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন নে এখন বৌমাকে নিয়ে ঘরে যা। আমার কাজ চুকল।
ওরা তখন হাত ধরাধরি করে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর ঘরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু স্মিত মুখে ওদের সেই যাওয়া দেখলেন।
পরের দশ দিন বাড়ি জুড়ে একটানা উৎসব চলল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই এসে ভীড় করতে লাগল। যুদ্ধের গতি ও ফলাফল সরকারের রাজধানী স্থানান্তরে নেওয়া নিয়ে নানান প্রশ্ন করা হতে লাগল সেমোকে।
যে প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছিল তা হল সশস্ত্র প্রতিরোধ অথবা সমস্ত নিয়ে গোপন গেরিলা প্রতিরোধ। অল্প বয়েসের জন্য সেমো সশস্ত্র প্রতিরোধের পক্ষে মত দিল।
যখন নানা টাটকা খবর নিয়ে সেমো রীতিমত উৎসাহিত।
সে অনেক খবর বলছিল। ট্যাক রেডিও মর্ণ্ট বোমারু বিমান।
দশ দিন থেকে এগার দিনের দিন সেমো চলে গেল।
তাকে নিতে প্লেনটা ফিরে এল। এবার বেশ এগিয়ে জনতা তার উড়ে যাওয়া দেখতে জমায়েৎ হয়েছিল। শ্রীমতী ওয়ায়ু যান নি। একা-একা একটা চেয়ারে বসেছিলেন। হঠাৎ বুলাং এসে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাঁটুতে মাথা রাখল। নিজের পোষাকে ভিজে ভিজে কিছুর স্পর্শ পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চোখের জল কেন?
আমরা সুখী হয়েছি। বুলাং ফিসফিস করে বলল। তাহলে এ চোখের জল তো ভাল বলে তিনি বুলাংয়ের মাথায় মৃদু চাপড় দিলেন। আর কিছু বললেন না। বুলাং চোখের জল মুছে হেসে চলে গেল।
যদি এক মুহূর্ত আগেও ভবিষ্যৎ জানা যেত তবে এই জীবনকে কীভাবে সহ্য করা যেত?
যে-বাড়ি উৎসব ও আমোদ আহ্লাদে ভরপুর ছিল, তা হঠাৎ শোকচ্ছায়ায় ভরে উঠল। কে জানতে পারে অনেক উঁচুতে মেঘের রাজ্যে কী ঘটেছিল? পূর্বদিকের সূর্যোদয়ের পথে সেমোর প্লেনটা ছাড়বার আধঘণ্টার মধ্যে, নায়েব খালি পায়ে হন্তদন্ত হয়ে ফটকের কাছে ছুটে এল। তার পেছনে পেছনে এল খামারের সব চাষী ও প্রজারা। তারা চীৎকার করছিল। জামা-কাপড় ছিঁড়ছিল। মেয়েরা এলোচুলে দৌড়ে আসছিল। গোলমালটা এত জোর হচ্ছিল

যে শ্রীমতী ওয়ায়ু অন্দরমহল থেকে তা শুনতে পেয়েছিলেন। বুলাং চলে গেলে, তিনি সবে লাইব্রেরীতে গিয়েছিলেন. কিছুক্ষণ একা বসবেন বলে। সেই সব গোলমালের মধ্যে তিনি নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে উঠে মহলের ফটকে এলেন।

চোখে জল নিয়ে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু সর্বপ্রথমে এবং তাঁর পেছনে বাকী সবাই আসছিল। এমন কি যুথিকাও পেছন পেছন আসছিল। অনাথ মেয়েরা, সেই বৃদ্ধা, বাড়ীর চাকর-বাকররা প্রতিবেশী, রাস্তার পথচারী—সবাই ছিল সেই দলে। শুনছ, ওগো শুনছ, আমাদের খোকা—কথা বেঁধে গেল তাঁর। নায়েবমশাই বলতে শুরু করলেন, আমরা দেখলাম ওই দূর মাঠের দিকে আকাশের মধ্যে আগুন যেন দাউদাউ করে জ্বলছে। দৌড়ে গেলাম সবাই সেদিকে। হায়. হায়. মা-ঠকরুণ কয়েকটা তার, বিদেশী ইঞ্জিনটা আর কিছু ভাঙাচোরা টুকরো—এই শুধু দেখলাম। শরীরের কোন অবশিষ্টও দেখলাম—না।

এই কথাগুলি যেন শ্রীমতী ওয়ায়ুর মর্মে বিঁধে গেল।

তিনি সব বুঝতে পারলেন।

সমাধি যে দেব, তেমন কিছু ভগ্নাংশও নেই। এক ঘণ্টা আগেও অমন যে জলজ্যান্ত ছেলেকে দেখলাম. সে কেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বললেন।

তাঁর জন্য শ্রীমতী ওয়ায়ু দুঃখিত হলেন, তার প্রথম মনে পড়ল বুলাংয়ের কথা। তিনি বললেন. ওর তরুণী স্ত্রীর কথাই আমারা প্রথমে ভাবব।

হ্যাঁ. হ্যাঁ, সবাই সমস্বরে স্বীকৃতি জানাল। এমনও হতে পারে যে বৌদির হয়ত ছেলেপুলে হবে। আঃ ঈশ্বরের কী দয়া, দশটা দিন তারা একসঙ্গে কাটাতে পেরেছে! যদি একটা বাচ্চা হয়. তবে নাতির মুখ দেখে বাবু, মা-ঠাকুরণ আপনারা দুঃখ একটু ভুলতে পারবেন।

এই নতুন আশায় শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল। তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি বরং ওর কাছে যাও। তোমার হাতেই ওর ভার রইল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু একাই সেমোর ঘরের দিকে গেলেন।

সবাই যে যার জায়গায় ফিরে গেল।

বৃদ্ধ পুরোহিত মন্দিরে বিগ্রহের সামনে ধূনো জ্বালিয়ে মৃত সেমোর জন্য প্রার্থনা করতে বসলেন। কী দ্রুত আজকাল ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছে!

হে বিরাট,হে স্বর্গের অধীশ্বর, ওর আত্মাকে তুমি দেখো! ওকে খুঁজে নিয়ে, ওর পরিচিতদের সঙ্গে তুমি মিলিয়ে দিও। যখন পুনর্জন্ম হবে, তখন এই করো, যেন সে আবার এই পরিবারে জন্মলাভ করে।

যে মহলে সে অত সুখী হয়ে ছিল, সেখানে বৃলাং এখন শ্রীমতী ওয়ায়ুর পাশে নিচে মেঝেতে বসে আছে। শ্রীমতী ওয়ায়ুর হাত তার কপালে।

দুজনেই নীরব।

আর বলার কীই বা আছে।

প্রেম ও বেদনায় এই দুই নারী একই সুতোয় গাঁথা।

শ্রীমতী ওয়ায়ুর ইচ্ছে হচ্ছিল, আঁন্দ্রেকে মৃত অবস্থায় দেখে তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল, সেকথা বৃলাংকে বলেন। কিন্তু সে কথা তিনি কখনো বলতে পারেন নি, আর পারবেনও না। তাঁর চেয়ে বৃলাংএর দুঃখ ঢের বেশী ভয়ঙ্কর। তিনি তো আঁদ্রের মৃতদেহটিকে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করতে পেরেছেন। কিন্তু সেমোর কিছুই যে থাকল না। মা হিসেবে ওর জন্মের, ওর শৈশবের, ওর বালক বয়েসের, যৌবনের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। সেমোর কণ্ঠস্বর, তার তর্ক করার ভঙ্গী, বলার ধরন, বিশ্বস্ত মুখের একাগ্রতা সব স্মৃতি এখনও মনে আছে।

কিন্তু বৃলাংএর জন্য কী পড়ে রইল ?

গত দশ দিনে কি ওরা শরীরের রক্তমাংসকে অতিক্রম করতে পেরেছে !

একথা জিজ্ঞেস করার সময় নয় এখন। স্থির নিষ্কম্প ভঙ্গীতে বসে আছে সে। মেয়েটার জন্য মায়া হল শ্রীমতী ওয়ায়ুর।

বৃলাংই প্রথম উঠল। মুখ মুছল। কান্না থামাল। শ্রীমতী ওয়ায়ুকে সে বলল ঃ আপনাকে আমি চিরকাল ধন্যবাদ দেব। কারণ এই কদিনে আমরা ঝগড়াঝাঁটি করি নি।

একা একা থাকতে পারবে এখন ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

পারব, বৃলাং বলল, একসময় আপনার কাছে গিয়ে কিছু প্রশ্ন নিয়ে কথা বলব মা।

বৃলাংয়ের হাত ধরে তিনি বললেন, রাত হক, দিন হক, সবসময় আমার দরজা তোমার জন্য খোলা।

মনে থাকবে, বৃলাং বলল।

তিনি চলে আসবার জন্য পেছন ফিরেছেন, এমন সময় দুম্ করে দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলেন।

তবে কি বৃলাং অন্য কিছু করতে যাচ্ছে। না, না, বৃলাং তা করতে পার না। সে একা একা বসে থাকবে, শুয়ে থাকবে। তারপর আবার জীবনের স্রোতে চলতে থাকবে। সেমো বেঁচে থাকলে, হয়ত ওরা আবার ঝগড়া করত, এই দশ দিনের মধুর ব্যবহার হয়ত চিরস্থায়ী হত না। ওরা বড় সমকক্ষ। ওদের ভালবাসাও বড় বন্য দুরন্ত। প্রত্যেকেই চাইত অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করতে।

কেউ কাউকে স্বাধীনতা দিতে রাজী নয়। এখন ওরা চিরকাল শান্তিতে থাকবে। শান্তিতে! তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন।
মানুষের মুখের সব চেয়ে মধুর শব্দ তো এটাই।

সেমোর অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেল।
পারিবারিক সমাধি ভবনে তার নির্দিষ্ট জায়গায় সেমোর শূন্য কফিনটা নাবিয়ে দেওয়া হল। একটা শাদা মোরগ মেরে তার রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হল। কাগজের তৈরী কিছু যন্ত্রপাতি পোড়ানো হল! কাগজের একটা এরোপ্লেনও তৈরী করা হল, সেটাকেও পুড়িয়ে ছাই করা হল। এরপরে কবরটা মাটি দিয়ে ভরে দেওয়া হল। শাদা কাগজে শিকলি টানিয়ে জায়গাটায় বড় বড় ঘাসের চাবড়া ফেলে সাজিয়ে দিয়ে সবাই ফিরে এল।

একদিন শ্রীমতী ওয়ায়ুর মনে হলো অনেক দিন হল যেন, তিনি চিউমিংকে দেখেন নি তাই রাত্রিবেলা ইংকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল সে তো ওই মন্দিরেই থাকে যেমন তুমি বলে দেছো। তবে সে আজকাল তোমার মেজ-বৌমার কাছে পেরায়ই যায়, গিয়ে বসে, গল্প করে। ভারি ভাব দুজনে, বোনের মত। তোমার ওই যূথি আসার পর থেকে সে তো বেধবার মতোই হয়ে গ্যাচে। দাদাবাবু আর তার ঘরে পা দেয় না। তাই ওরা দুজনে দুজনকে সান্ত্বনা দেয় আর কি!
শ্রীমতী ওয়ায়ু কোন উত্তর দিলেন না। শান্ত মনে তিনি ভাবছিলেন। এরকম বড় বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায় যে যাদের মনের মিল হয় তারা একসঙ্গে থাকে। চিউমিং যদি লিয়ানকে সান্ত্বনা দিতে পারে তো দিক। এমনও হতে পারে যে লিয়াংও হয়ত মন্দিরের বাচ্চাদের জন্য কাজ করতে যেতে পারে এবং তার সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারে। বাচ্চাদের যেভাবেই হক লেখা-পড়া শেখাতে হবে। আঁন্দ্রে চাইতেন যেন ওরা লিখতে পড়তে শেখে। সেদিন শুতে যাবার আগে তিনি ঠিক করলেন যে এ বাড়িতেই ওদের জন্য একটা স্কুল খুলবেন। কিন্তু তিনি এমন নন যে হুড়মুড় করে কোন কিছুতে হাত দেবেন। যা কিছুই করেন, সুপরিকল্পিত পরিচ্ছন্ন ভাবেই করেন এবং বেশ সময় নিয়ে।

পরের বছর আবার একটি বিদ্যুৎ বাহিত চিঠি এল তাঁর সেজ ছেলে ফেংমোর কাছ থেকে। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু টেলিগ্রামটা নিয়ে চাকরের হাত দিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে নিয়ে গেলেন না।

টেলিগ্রামের বক্তব্য অদ্ভুত। সব সম্ভবপর দিক থেকে তিনি চিঠিটা পড়লেন, তবু তা বুঝতে পারলেন না। সে তো আসার কথা জানিয়েছে মাত্র। যদি হাওয়া অনুকূল ও সমুদ্র অশান্ত না থাকে তবে মসখানেক থেকে মাসদুয়েকের মধ্যে এসে পৌঁছুবে। কেন যে সে তাড়াতাড়ি ফিরছে সেকথা কিছুই লেখে নি। যতই ঐ শব্দ ক'টি পড়ছিলেন, ততই তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, আজ যদি আঁদ্রে থাকতেন তবে জিজ্ঞাসা করতেন, ওকে একটু দেখুন তো! ও হঠাৎ এমন সাত তাড়াতাড়ি ফিরছে কেন? ও কি কোন অন্যায় করেছে?

এই ছেলেটি কেবল তাঁরই নয়, যেন আঁদ্রেরও। দুজনেরই ওর শাবক। কিন্তু চোখ বুজলে কবর ছাড়া আর কিছুই ভেসে উঠে না। আঁদ্রে যেন নীরব। স্মৃতির অতল থেকে কোন বানী এসে পৌঁছে না।

ফেংমোর অপ্রত্যাশিত ফিরে আসার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী ওয়াং তাঁর হাতের সব কাজ সরিয়ে রাখলেন। মন্দিরের অনাথ বাচ্চা মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, খুলাং ও চিউমিংয়ের বাইরে যাওয়া সব কিছুই এখন পড়ে রইল। তাঁর প্রথম কাজই হল লিলউয়িকে তার স্বামীর জন্য গড়ে তোলা।

এখন তিনি ঠিক করলেন লিনউয়িকে ডেকে পাঠিয়ে আঁদ্রের উপদেশগুলি জেনে নেবেন। ছেলের জন্যই ডাকছেন এরকম ভান করে লাভ নেই। আসলে তিনি নিজেই সেই বিশেষ কথাগুলি জেনে নিতে চান, আঁদ্রে যা লিনউয়িকে বলেছিল। তিনি আরও জানতে চান, সেই কথাগুলির প্রভাব কতদূর পড়েছে লিনউয়ির মনে।

লিনউয়ি প্রসাধন করে, সুসজ্জিত হয়ে, একদিন তাঁর ঘরে এল। নির্ভীক চোখে তাঁর দিকে তাকাল লিনউয়ি। তিনি মনে মনে বললেন বৌমাকে দেখতে ভারি সুন্দরী। সবল নিষ্পাপ চোখ তবে একটু দুষ্টুমিও ঝিলিক দিচ্ছে থেকে থেকে। আর একটু আলসে, বেপরোয়া আর আমদে।

দ্যাখো, সময় কীভাবে বদলে যায়! ভাবলে আমার হাসিই পায়! যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার চুলের ডগা কোঁকড়ানো দেখে আমি কেঁদে ফেলতাম। এযুগে কোঁকড়ানো চুল হল সৌন্দর্যের চিহ্ন। আবার দ্যাখো, তোমার বড় জা মেং কিন্তু চাইবে না, ওর চুল অমন কোঁকড়ানোই থাকুক। লিনউয়ি তার ছোট ছোট শাদা দাঁত বের করে হেসে উঠল।

তবে আমার মনে হয় ফেংমো হয়ত কোঁকড়ানো চুল দেখে অভ্যস্ত হয়েই আসবে। সব বিদেশী মেয়েদের চুলই কোঁকড়ানো। আচ্ছা, বলো তো, তুমি সবসময় বিদেশী সব কিছুরই অত ভক্ত কেন? তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

বিদেশী সব কিছুরই নয়। ওই রোমশ পাদ্রীবুড়োর মোটেই ভক্ত ছিলাম না। আমি, লিনউয়ি প্রতিবাদের সুরে বলল।

তিনি তো বুড়ো ছিলেন না, মৃদুস্বরে তিনি বললেন।

আমার কাছে—আমার কাছে উনি বুড়োই। উঃ কী রোঁয়া গায়ে—লোমওয়ালা মানুষ দেখলে আমার ঘেন্না ধরে, সে বলল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু দেখলেন তাঁদের মধ্যে এই কথাবার্তা বড় বেমানান হয়ে যাচ্ছে। বললেন, কিন্তু তিনি তো তোমাকে ভাল শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় উনি তোমাকে যা শিখিয়ে গেছেন, তা শুভ। তাই আমার ইচ্ছে, যদি আমাকে সেগুলি বলো।

কথাটা তিনি এমন সুরে বললেন যে, লিনউয়ি বুঝল তাকে অবশ্যই বলতে হবে সেই উপদেশাবলী।

সে একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল। তারপর একটা চুল দুরস্ত করতে করতে বলল, মনে রাখার চেষ্টা করি নি সেসব। তবে উনি সবসময় বলতেন যে ফেংমো খুব বড় কোন কাজ করার জন্য জন্মেছে এবং আমার ভূমিকা হল ওকে সুখী রাখা। যাতে সে আরো ভালো করে কাজ করতে পারে।

তুমি কীভাবে ওকে সুখী করবে? শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রশ্ন করলেন।

উনি বলতেন, আমাকে ফেংমোর জীবনের মূল স্রোতের সন্ধান খুঁজে বের করতে হবে। লিনউয়ি অনিচ্ছুক সুরে বলল। উনি বলতেন, সেই স্রোত থেকে আমি সব কুটো জঞ্জাল সরিয়ে দেব এবং জলের স্তর উঁচুতে রাখতে হবে। আমি কখনোই বাধার মত থাকব না ওই জলস্রোতে। ওর জীবন আমি দু-ভাগে ভাগ হতে দেব না।

হ্যাঁ। শ্রীমতী ওয়ায়ু ভাবলেন, এসব কথা অ্যান্ড্রেরই বটে। তিনি বললেন, বলো বৌমা, এসব তো ভাল কথাই।

লিনউয়ি বলতে লাগল, উনি বলতেন যে ফেংমো যে কাজ করছে সে বিষয়ে বই-পত্র পড়ব আমি এবং ওর চিন্তা-ভাবনা বুঝতে চেষ্টা করব। তাঁর মতে যদি আমি ফেংমোকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ না করি, তবে ও সারা জীবন নিঃসঙ্গই থেকে যাবে। ফেংমোর নাকি আমাকে খুব দরকার।

লিনউয়ি শ্রীমতী ওয়ায়ুর মুখের দিকে তাকাল তারপর মন্তব্য করল, তবে সেই দরকারের কথা ফেংমো নিজে জানে কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

তার দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, তুমি ওকে ভালবাস? পুত্রবধূকে প্রশ্ন করার পক্ষে এটা খুবই অদ্ভুত প্রশ্ন। তবে শ্রীমতী ওয়ায়ু ছাড়া আর কে-ই বা এমন প্রশ্ন করার ঝুঁকি নিতেন। লিনউয়ির চোখ জলে ভরে

হবেন না শ্রীমতী ওয়ায়ু। তখন সে বুলাং-এর যাবার কথা বলবে। আর বূলাংকে জিজ্ঞেস করলে বলবে, সে বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল করবে গ্রামে। বিধবার সৎকর্ম করতে চায়। তাই এতে আপত্তি করার কথা নয়। অনেক আলাপ আলোচনা করে এরকমই ঠিক হল। চিউমিং বলল সেই আগে কথাটা পাড়বে। অস্বীকার করলে তখন বূলাং যাবে। বৌমার কথা ঠেলতে পারবেন না তিনি।
ফেংমো কোথায় তা জানত চিউমিং। তবু সে ঠিক করেছিল, তার সামনেই কথাটা বলবে। বাচ্চাটাকে লাল একটা জামা পরিয়ে নিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে, কপালে টিপ দিয়ে নিয়ে গেল। আগেভাগে কোন খবর না দিয়েই ঢুকে পড়ল ঘরে।
শ্রীমতী ওয়ায়ু দোরগোড়ায় তাকে দেখতে পেলেন। সূর্যের আলো চাতাল থেকে সরে গেছে। মৃদু কমলা রংয়ের আভা লেগে রয়েছে চারদিকে। ঘরের মধ্যে কুসুম কুসুম ছায়া। মেয়ে কোলে নিয়ে চিউমিং দাঁড়িয়েছিল। অতৃপ্ত ভালবাবসা সত্ত্বেও চিউমিংকে ভারি নরম ও জীবন্ত দেখাচ্ছিল। চিউমিং সতর্কভাবে ফেংমোকে নমস্কার জানাল, বাড়ি ফিরে এলেন সেজবাবু ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো তো ? ফেংমো বলল।
ভালই আছি। চিউমিং বলল।
তারপর চিউমিং শ্রীমতী ওয়ায়ুর দিকে তাকাল। তিনি তাকে বসতে বললেন। চিউমিং বসে তার বক্তব্য জানাল। সব শুনে শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, বেশ ভাল, ভালই তো। নিজের জন্য অনুমতি পেয়ে চিউমিং বূলাংয়ের কথা বলল। চিউমিং বলল, বূলাং গ্রামে একটা স্কুল চালাতে চায়।
ফেংমো মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে বসেছিল। একথা শুনেই সে বলে উঠল, আরে! আমিও তো সেজন্যই বাড়ি ফিরে এলাম।
ওর কথায় চিউমিং একটু ঘাবড়ে গেল এবং শ্রীমতী ওয়ায়ুও বোঝা গেল মুশকিলে পড়েছেন।
তুই তো আমাকে এ-কথা বলিস নি আগে, তিনি ফেংমোকে বললেন।
সেকথা তো ওঠে নি। সময় হলেই বলতাম, ফেংমো বলল।
দাঁড়া, বলে চিউমিংকে বললেন, আর কিছু বলবে ?
না, চিউমিং বলল।
তবে তোমারা দুজনেই যেতে পারো গ্রামে। আমি নায়েবমশাইকে বলে দিচ্ছি, তোমাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে আর স্কুলের আসবাব জোগাড় করে দিতে। তোমাদের কী কী দরকার তার একটা লিষ্ট করে দিও। ইংকে বলে দেব ছুতোর ডেকে তৈরী করে দেবে। তোমাদের সঙ্গে দুজন ঝি ও একজন

ঠাকুর যাবে। বাবুর্চি সে ব্যবস্থা করে দেবে।

মেয়েকে কাঁধে নিয়ে শ্রীমতী ওয়ায়ুকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিউমিং চলে গেল। চিউমিং চলে গেলে তিনি ফেংমোকে বললেন, এবার বল, তোর কী ইচ্ছে ?

ফেংমো দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। আসন্ন রাত্রির শীতলতা ছড়িয়ে পড়ছিল সে বলল, নিজেকে কোন কাজে উৎসর্গ করা দরকার। ব্রাদার অাঁদ্রে আমাকে এরকম শিক্ষাই দিয়েছিলেন। ধর্ম আমার জন্য নয়। আমি তো আর ধর্মযাজক নই। কর্মে আমার আপন ভূমিকা। সেই কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই।

কিন্তু কোন্ কর্ম, কোন্ কাজ. ফেংমো একটু থামল। তারপর বলল, ঘটনাচক্রেই সেটা ঠিক হয়ে গেল। বিদেশে থাকার সময় আমাদের দেশের একটি ধোপার কাছে আমি জামা-কাপড় ধুতে দিতাম। একদিন কাপড় আনতে গেলে, সে আমাকে একটা চিঠি পড়তে দেয়। লোকটা দক্ষিণাঞ্চলের। কুড়ি বছর দেশছাড়া সে। দেশ থেকে কোন চিঠি এলে সে না পারত পড়তে, না পারত তার জবাব লিখতে। নিরক্ষর মানুষ। কলেজে গিয়ে দেখি হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সেখানে নানা বিষয় নিয়ে পড়ছে। অথচ এত কাছের একটি মানুষ লিখতে পড়তেই পারে না। তখন আমার মনে হল, আমাদের গ্রামেরও নিশ্চয় একই অবস্থা।

ওদের শিখে কী লাভ ? ওরা তো জমি চষবে, !

কিন্তু মা, পড়তে শেখা মানে—মনের অন্ধকারকে দূর করা।

এতো তোর সেই মাস্টার মশাইর কথা।

আমি তা ভুলি নি মা।

বূলাং-বৌদি আমাকে ঠিকমতো সাহায্য করতে পারবে, ওঁর কথা আমি আগে ভাবি নি। লিনউয়িও সাহায্য করতে পারবে। আমরা নিজেদের কথা ভুলে যাব। যদি গ্রামে আমাদের কাজ সফল হয়, তাব সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে।

তিনি দেখলেন, ফেংমোর তরুণ মুখটি এক আশ্চর্য দীপ্তিতে ভরে গেল ! যা তোর ভাল মনে হয় তাই কর খোকা, তিনি বললেন।

জেগেই বিছানায় শুয়ে ছিলেন শ্রীমতী ওয়ায়ু। আজকাল অনেক সময় এরকম থাকেন। এতে তাঁর খারাপ লাগত না। জেগে শুয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হল, বাড়িটা রাত্রিতে যেন জেগে আছে ! দিনে যা ছিল না। মনে মনে সারা বাড়িটা পরিক্রমা করে নিলেন। বয়স্ক ননদরা দূরের মহলগুলিতে আছেন। যে-মহলে যূথিকার সঙ্গে তাঁর স্বামী বাস করছিলেন।

উঠল। সে ফিসফিস করে বলল, ও যদি বাসত তবে আমিও বাসতে পারতাম।
ও কি তোমাকে ভালবাসে না? শ্রীমতী ওয়ায়ু জিজ্ঞেস করলেন! লিনউয়ি এত জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করল যে তার চোখের অশ্রুবিন্দু নীল স্যাটিনের পোষাকের ওপর ছিটকে এসে পড়ল। না, ফেংমো আমাকে ভালবাসে না।
দুহাতে মুখ ঢেকে সে কাঁদতে লাগল। তিনি বাধা দিলেন না। মেয়েদের সবরকম ঝঞ্ঝাট কমাতে কান্নার মত আর কিছু নেই।
খানিকক্ষণ পবে তিনি বললেন, আহ্ ফেংমো কাউকে ভালবাসে না। ওর এই একটা অভাব বোধ আছে। আমরা এটা সারিয়ে তুলবই।
সহজ সরল সান্ত্বনার কথাগুলি মর্মস্পর্শ করল লিনউয়ির মনে। সে উঠে বলল, ধন্যবাদ মা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

শীতের আগেই ফেংমো ফিরল। হেমন্তের রেশ তখন সবে গেছে।
ফেংমো এসে ঘরদোর দেখে প্রথম মন্তব্য করল, কিছুই তো বদলায় নি দেখছি।
বদলাব কেন আমরা, তিনি উত্তর দিলেন। তবে তুই বদলে গেছিস খোকা।
ফেংমো বলল, মেজদাকে দেখছি না যে?
শ্রীমতী ওয়ায়ু সুচারুভাবে তাঁর চোখ মুছলেন। বেঁচে থাকতে যাকে সর্বক্ষণ না দেখেও চলত, মৃত্যুর পর এখন তার শূন্যস্থান যেন বড়ো অপূরণীয় লাগে।
মেজবৌদি কেমন আছেন? ফেংমো জিজ্ঞেস করল।
চুপচাপ আছে। দেখি, কী করা যায় ওর জন্য। এত কম বয়েসে তো আর কেউ সন্ন্যাসিনী হতে পারে না।
উনি নিশ্চয় আবার বিয়ে করবেন না? ফেংমো বলল।
যদি করে তো ওকে সাহায্যই করব। শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন।
ফেংমো এতে ভারি অবাক হয়ে গেল। তার মা যে পরিবারের ওপরে এ-বাড়ির কোন মেয়েকে বিচার করবেন, তা ভাবা তার কল্পনাতীত।
ওর বিস্ময় দেখে তিনি বললেন, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু শিখছিও তো। ভেতরের স্রোত যদি নির্মল হয় তবে জীবনটা ভালই চলে।
ব্রাদার আঁদ্রে তাই বলতেন। ফেংমো বলল, আচ্ছা, তোমার মনে আছে তাঁকে? একটু ইতস্তত করে বললেন, আছে।
হঠাৎ ফেংমো বলল, কেন যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম সেকথা কেউ জানে

না। কাউকে বলি নি। তোমাকেই বলছি। তুমিই তো ব্রাদারকে এ-বাড়িতে এনেছিলে। জানো মা, ওখানে আমি একটি বিদেশী মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। সে-ও আমাকে ভালবেসেছিল তারপর আমরা সরে দাঁড়ালাম।

কোন দুঃখে খোকা ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি ওকে লিনউয়ির কথা বলেছিলাম, ফেংমো বলল।

একেবারে সব শেষে বললি ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমাকে একসময় বলতেই হল।

তুই লিনউয়িকে যেন দেখিস।

দেখব।

অনেকক্ষণ মা ও ছেলে বসে রইলেন নিঃশব্দে। আরও বসে থাকতেন যদি না চিউমিং এসে ঢুকত। বেশ কিছুদিন ধরে বলি—বলি করেও কথাটা বলতে পারছিল না চিউমিং। এখন সে একটা অনুরোধ করার জন্য এসে ঢুকল।

রূলাং-এর সঙ্গে চিউমিংয়ের বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। রূলাং যত তার মৃত স্বামীর গল্প করত, ততই চিউমিং দেখল তার মন ফেংমোর কথা বেশী ভাবছে। এক রাত্রিবেলা ঘুম আসছিল না বলে ওরা নিজেদের খুব গোপন কথাগুলি আলোচনা করছিল। একসময় চিউমিং ফেংমোর কথা বলল, জানো, আমি ভারি পাজি। তোমার দেওরের কথা অষ্টপ্রহর না ভেবে পারি না। বুক জ্বলে যায়।

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে রূলাং শুনছিল। হঠাৎ সে বলল, ঈস ! যদি তুমি আর আমি এই বাড়িটা ছেড়ে যেতে পারতাম ! এই বাড়িটার বিরাট পাঁচীলের ভেতর আমরা বন্দিনী হয়ে আছি। গোটা পরিবারটা যেন থাবা উঁচিয়ে আছে। আর দ্যাখো, ভালই বাসি আর ঘেন্নাই করি আমরা দু'জনেই খুব একরকম। না—বলো ?

তবে এই পাঁচীলের ভেতর আমরা নিরাপদ আছি, চিউমিং বলল। সে একটু ভীরু প্রকৃতির। রূলাং-এর সাহসিকতা সে যেমন প্রশংসার চোখে দেখে, তেমনি ভয়ও পায়।

আমরা কেউ কারোর চেয়ে নিরাপদ নই, রূলাং বলল।

এই সময় দু'জনে একই চিন্তা করছিল। তাদের চোখে চোখে কথা হল।

এখানে থাকতে যাব কেন ? রূলাং বলল।

বাইরে যাব কীকরে গো ? চিউমিং বলল

তারপর তারা পরিকল্পনা করল তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে। চিউমিং আর তার পুরোনো গ্রামে ফিরতে পারবে না। তাহলে মনে হবে ওয়ায়ু পরিবার থেকে সে বিতাড়িত হয়েছে। তাই ঠিক করল যে, ওয়ায়ুদের কোন গ্রামে গিয়ে সে থাকবে। তবে যুবতী একটি মেয়েকে একা ছাড়তে রাজী

মারা যায় নি সে? মালিক প্রশ্ন করল। অতিথিরা বেশ অবস্থাপন্ন। তাই তার গলায় সমীহের ভাব ফুটে উঠল। না, না, মরে নি। আমার ঠাকুমা খুব বদরাগী আর দজ্জাল মহিলা ছিলেন। আমরা পরপর তিন বোন হওয়ায়, ঠাকুমা রেগেমেগে শেষটিকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। সে-বছব কীভাবে এ-অঞ্চলে এসে পড়েছিলেন আপনারা? মালিক জিজ্ঞেস করল।

আমরা উত্তরাঞ্চলের রাজধানীর কাছে থাকি। সে-বছবটা ভারি খরা গিয়েছিল। ফসল মোটে হল না। তাই আমবা এদিকটায় চলে এলাম। এদিকে তখন প্রাচুর্য ছিল খাবারের। আসার পথে মা আমাদের সবচেয়ে ছোট বোনটির জন্ম দেন।

পান্থশালাব মালিক একটু ভাবল। তারপব বলল, তাহলে হুজুর এই পান্থশালাতেই হবে। কারণ, দ্বিতীয় আর কোন পান্থশালা এ-শহরে নেই। পূর্ব-পুরুষের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

আমার মা ও যেন এই পান্থশালার কথাই বলেছিলেন। আমবা তাই থেকে গেলাম এখানে। আমার মা এখনও তাঁর সেই হারানো মেয়ের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন।

দাঁড়ান, আমি গিয়ে সমাজে জানাচ্ছি সব কথা। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ জানেন তবে তিনি শ্রীমতী ওয়ায়ু, এ আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি।

পান্থশালাব মালিক তাই সেরা পোযাক-পরিচ্ছদ পবে, অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার পরে এক সন্ধ্যেবেলা শ্রীমতী ওয়ায়ুর কাছে খবর পাঠাল যে সে তাঁর সঙ্গে একটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলতে চায়। পান্থশালার মালিকরা আগে ওয়ায়ু ভবনে গৃহভৃত্যের কাজ করত। কাজেই তার সাক্ষাৎকাব সহজেই মঞ্জুর হল। বড় হলঘরটায় সাক্ষাৎকাব হল। এবার আর তিনি শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুকে ডাকেন নি। বাত্রির খাওয়া হয়ে গেলে ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে বেরুতেও চাইতেন না।

লোকটি শ্রীমতী ওয়ায়ুকে সবকথা জানালে তিনি বললেন, মেয়েটির মাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

পরদিন ছেলেটি তার মাকে নিয়ে হাজির হল শ্রীমতী ওয়ায়ুব কাছে।

শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রথমে বুঝতে পারেন নি, এঁরা কীরকম পর্যায়ের লোক। যখন দেখলেন, দাসীর হাতে ভর দিয়ে বয়স্ক মহিলাটি আসছেন, তখন বুঝলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের।

অভ্যথনা আপ্যায়নের পরে মহিলাটি বললেন, পশ্চিমের দিকে যেতে আমরা এখানে এসে পড়েছি। এদিকটা অনেক আগে থেকেই নিশ্চয়ই নিরাপদ এলাকা। যতটা গেলে চলত, তার চেয়ে দুশো মাইল বেশী এসে পড়েছি। একটা কারণও অবশ্য আছে। রেশমী রুমালে চোখ মুছে তিনি বললেন।

শ্রীমতী ওয়ায়্ বললেন, যা বলতে চান বলুন।

দেখুন, আমি জানি আমার সন্তান মরে নি। মেয়ের আমার এমন স্বাস্থ্য ছিল—আমার অন্য কোন সন্তানেরই তেমন স্বাস্থ্য হয় নি। ওদের বাবা পর্যন্ত আমার শাশুড়ির কথা মতো বাছাকে মেরে ফেলতে চান নি। মানুষটা তিনি ভাল ছিলেন। তবে আমার শাশুড়ি ছিলেন যেমন খাণ্ডার তেমনি দজ্জাল মেয়েমানুষ। হায়, সেই মানুষ আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। মার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে কিছু বলতে সাহস পেতেন না তিনি। বড্ড বেশী ভালোমানুষ ছিলেন তিনি।

কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করলেন মহিলা। দেখুন, কীভাবে শাস্তি পেলাম আমরা! একটার পর একটা ছেলে মরে গেল। শুধু এই ছেলেটিই বেঁচে আছে। তাই এখন সেই হারানো মেয়েকে খুঁজে পেতে চাই। সেজন্যই এত দূরে এসেছি।

আপনি ঠিক জানেন যে আপনার সেই মেয়েটিকে মেরে ফেলা হয় নি? শ্রীমতী ওয়ায়্ জিজ্ঞেস করলেন!

ঠিক জানি। আঁতুড়-ঘরে শুয়ে শুয়েই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, আমার স্বামী তাঁর মাকে অনুনয় করছেন যেন বাচ্চাটাকে না মেরে শহরের সীমানায় পাঁচীলের কাছে ফেলে রেখে আসা হয় এবং শাশুড়ি তাতে রাজীও হয়েছিলেন।

আচ্ছা, আপনার সেই বাচ্চা মেয়েকে কি একটা লাল রংয়ের রেশমী কোটের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছিল? শ্রীমতী ওয়ায়্ প্রশ্ন করলেন।

বৃদ্ধা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার পুরোনো লাল কোটের মধ্যে জড়িয়ে। আমি ভেবেছিলাম যে যদি ওকে ওতে জড়িয়ে দেই তবে কারুর না কারুর চোখে ও পড়বে।

শ্রীমতী উঠে আলমারির কাছে গেলেন। সেখানে তাঁর নিজের অনেক ভাঁজ করা পোষাকের মধ্যে চিউমিং-এর নিজের পোষাকটাও ছিল, প্রথম সাক্ষাতের সময় সে তাকে যা রাখতে দিয়েছিল। তিনি বললেন, এই যে সেই কোটটা। বৃদ্ধার মুখ সীসের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। কোটটা দুহাতে ধরে তিনি বললেন, এই সেই কোট! কিন্তু খুকী কোথায়?

বেঁচে আছে, শ্রীমতী ওয়ায়্ বললেন।

তারপরে চিউমিং কী করে এ-বাড়িতে এল সেই কাহিনী বৃদ্ধা শুনছিলেন। কাঁদছিলেন। অধীর হয়ে উঠছিলেন। আবার পরক্ষণেই ভয়ে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। চিউমিং যে শ্রীযুক্ত ওয়ায়্কে খুশি করতে পারে নি বা তার কদর বুঝেও কেন যে শ্রীমতী ওয়ায়্ তাকে গ্রামে গিয়ে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন, সে-কথা বলা সোজা ছিল না।

সেখান থেকে তিনি মনটা তুলে নিলেন। সে-জীবন যে কী, তা তিনি জানেন। কোন মতামত প্রকাশ করার আগে ক্লান্তি এসে তাঁকে পেঁচিয়ে ধরে। সেই বয়স্ক মানুষটির মামুলি জীবন চলছে। খাদ্যগ্রহণ করছেন, সেবা গ্রহণ করছেন। যূথিকা একটু মোটা হয়ে গেছে। একটু আলসে। দিনই হক, রাত্রিই হক, সর্বদাই একটা ঘুম-ঘুম ভাব। সে শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর প্রতি তাঁর কর্তব্য নিপুণভাবে সম্পন্ন করত। রেশমী কাপড়, জড়োয়া গয়না, নানা সুখাদ্য উপহার পেয়ে সে দিব্যি তোয়াজেই আছে। এই বাড়িতে সে সুরক্ষিত। শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর মা যে ভোগের জীবন শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন, এই উপপত্নী যেন সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ করলেন। প্রচুর খেয়ে, মদ্যপান করে, অবশ্যই যূথিকার সঙ্গে তিনিও এখন বেশ স্থূলকায় হয়ে উঠেছেন। বারবণিতাদের ঘরে আর যেতেন না। এমন কি পুরোনো ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারার অভ্যেস পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। তাঁরা বেশ পরিতৃপ্ত। তাঁর নিজের বাড়িতে এখন ক্বচিৎ শ্রীযুক্ত ওয়ায়ুর নাম শোনা যায়। ভাবতে ভাবতে একবার শ্রীমতী ওয়ায়ুর মনে হল যে তাঁর বিয়েটা কি ব্যর্থ হয়েছে!

ফেংমো যেন বাড়িতে তার তীব্র উৎসাহের শিখা দিয়ে গ্রাস করতে চাইছিল সবকিছু। কাকভোরে উঠত আর খেত সন্ধ্যের পরে। সকালে উঠেই ঘোড়ায় চড়ে সে গ্রামে চলে যেত, যেখানে তার প্রথম স্কুল খোলার কথা। ছোটদের জন্য, বয়স্কদের জন্য, মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা স্কুল খোলার পরিকল্পনা ছিল তার। সবাইকেই স্কুলে পড়তে হবে।
বয়স্করা এতদিন লেখাপড়া নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দিব্যি ছিল। এখন এই উৎসাহী যুবকের পাল্লায় পড়ে তারা বেজায় বিব্রত বোধ করতে লাগল। কাজেই নানান অভিযোগ উঠতে লাগল।
আমাদের দিন তো ঘনিয়ে এসেছে, আর এসব কেন বাপু—। অথবা বলি, এতদিন বেঁচে থেকে কোন জ্ঞানগম্যি কি হয় নি, না বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি আমাদের, যা বুদ্ধি আছে তাই ঢের। এমনধারা সব গ্রাম্য কথাবার্তা।
কিন্তু ফেংমো একেবারে অদম্য। এসব কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয় সে। শেষে গ্রাম্যবৃদ্ধরা শ্রীমতী ওয়ায়ুর কাছে দরবার করতে এল। বড় হলঘরটায় প্রজাদের নালিশ শুনলেন শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু এবং শ্রীমতী ওয়ায়ু। বাড়ির তৈরী পিঠে কাগজে মুড়ে এনেছিল তারা নজরানা হিসেবে।
শ্রীযুক্ত ওয়ায়ু বলে বসলেন, এরা তো ঠিকই বলছে।
আমার ছেলেরই দোষ। ওকে আমি বলব বাড়িতে ফিরে আসতে যাতে তোমরা শান্তিতে থাকতে পারো।

শ্রীমতী ওয়ায়ু সবকিছু জানতেন বলে চাইছিলেন না যে তাঁর স্বামী অজ্ঞতার বশে কোন কথা বলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে চল্লিশোর্দ্ধে ব্যক্তিরা অনিচ্ছুক হলে স্কুলে পড়বেন না। তিনি এটাও বললেন যে লেখাপড়া হিসেব-পত্র শিখলে তাদের নিজেদেরই সুবিধা হবে। ঠকবার ভয় থাকবে না। আপোষ-হিসেবে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

ক্রমশ দেখা গেল গ্রামবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতা জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল এবং অন্যান্য গ্রামেও স্কুল খোলার ডাক আসতে লাগল।

এর মধ্যে বুলাং ও চিউমিংও গ্রামে গিয়ে থাকছিল স্কুলের কাজে।

একদিন ফেংমো এসে সরাসরি শ্রীমতী ওয়ায়ুকে বলল, জানোই তো মা, কোন মেয়েই আমাকে চট করে টলাতে পারে না।

শ্রীমতী ওয়ায়ু বললেন, চিউমিং-এর কথা বলছিস?

তুমি কী করে বুঝলে মা?

আছে, আমার অনেক উপায় আছে। তিনি বললেন। নে বল, কী বলবি? আমি বলছিলাম কী যে, লিনউয়িকেও আমি গ্রামে নিয়ে যেতে চাই আমার কাছে। তোমার অনুমতি চাই।

শ্রীমতী ওয়ায়ু মনে মনে হাসলেন। ফেংমো বৌকে কাছে নিয়ে যেতে চায় রক্ষাকবচ হিসেবে। যেন কোন মোহিনী মায়ায় ধরা না পড়ে সে। তিনি অনুমতি দিলেন।

ফেংমো লিনউয়িকে নিয়ে চলে গেল। বিশাল বাড়িটার আরেকটা মহলে তালা পড়ল। মনটা ভাল লাগছিল না শ্রীমতী ওয়ায়ুর। একবার ভাবলেন চিউমিংকে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলেন। তারপর ভাবলেন, না থাক।

পরের বছর লিনউয়ির প্রথম বাচ্চাটা হবার সময় একটা ভারি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সে-বছর বিরাট পশ্চাদপসরণের বছর। পূর্ব সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ থেকে শত্রুপক্ষ এ-দেশের অনেক জমি দখল করে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎখাত করে দিল। তাড়া খেয়ে তারা পালাতে লাগল। ওয়ায়ু-ভবন যে-শহরে, সেটা ওই উদ্বাস্তুদের পালানোর পথে পড়ে। তাই অনেকে এই পথেই পালাতে লাগল। কেউ কেউ বেশীদিন থেকে গেল এই অঞ্চলে। এদের মধ্যে ছিল বয়স্ক একজন বিধবা যিনি তাঁর ছেলে পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনী নিয়ে স্থানীয় একটা পান্থশালায় বেশ কিছুদিন থেকে গেলেন। ওই ছেলেটিই তার একমাত্র পুত্র। পান্থশালার মালিককে একদিন ছেলেটি কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন, অনেক বছর আগে আমার মা তাঁর এক মেয়েকে হারিয়ে ফেলেন। এখানে হারানো ছেলেমেয়েদের খোঁজ পাবার কোন উপায় আছে?

জানানোর পর এইসব চিঠিতে চিউমিং লিখত যে সে ভালো আছে, বাচ্চাটা বাড়ছে. এইসব। যুদ্ধের শেষে পিকিং-এর বিগতদার এক ছোট ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ভদ্রলোক দেশী ও বিদেশী জিনিস বিক্রির দোকান ছিল। তার আগের পক্ষের দুটি ছেলে ছিল। তারা সহজেই চিউমিং-এর ভারি ন্যাওটা হয়ে পড়ল। পরে চিউমিং-এর প্রথমে একটি, পরে যমজ ছেলে হয়েছিল। তার কোল ও সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এদিকে ফেংমোর পরিবারও বাড়ছিল। তার অন্তর্জীবন যাই হক না কেন, জৈবজীবন বেশ ফলন্ত হয়ে উঠেছিল। লিনউয়ির একটি ছেলে একটি মেয়ে ও পরে আরও দুটি ছেলে হয়েছিল। প্রত্যেকবার বাচ্চা হবার সময় সে ওয়ায়ু-ভবনে ফিরে আসত এবং এক মাসের হলে আবাব ফিবে যেত পল্লী-ভবনে। ফেংমো তার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করত না বটে, তবে তা মোটের ওপর ছিল কঠোর। শ্রীমতী ওয়ায়ু জানতেন যে সে কখনো লিনউয়িকে ভালবাসতে পারবে না। আবার এটাও সেই সঙ্গে জানতেন যে তার ভালবাসার দরকারও নেই। তার নিজের ভেতরেই যথেষ্ট আগুন আছে—অন্য ধরনের বাসনার আগুন যার শিখা ভালবাসাকে পেরিয়ে আরও ঊর্ধ্বচারী হতে চায়। সে সাধারণ মানুষের কল্যাণ বিধানের চেষ্টায় বিভোর হয়ে আছে। স্কুল চাই, আরো, আরো অনেক অনেক স্কুল চাই গ্রামে গ্রামে। স্কুল হয়ে গেলে চাই হাসপাতাল অনেক অনেক হাসপাতাল। সে তার যাবতীয় রেশমী পোষাক বাক্সবন্দী করে তুলে রেখে, সূতীর সাধারণ পোষাক পরতে লাগল, যা অনেকটা ইউনিফর্মের মতো দেখতে। তাতে না আছে সম্ভ্রান্ত বংশের মর্যাদার চিহ্ন, না কোন জমকালো অলঙ্করণ। একেবারে সাদামাটা বেশবাস। তার ওই গম্ভীর মুখাবয়ব আঁদ্রেকে মনে করিয়ে দেয়।

সাগরপারের যে বিদেশী মেয়েটিকে ভালবেসেছিল, তাকে সে আর কখনো চিঠি লেখে নি। সে কোন ব্যাপার আংশিক ভাবে করতে পারত না। তার উৎসাহ সবদিকে ছুটে যেত একসঙ্গে। এই উৎসাহকে সবাই প্রশংসা করত যতক্ষণ না তা পরিবারের সদস্যদের স্পর্শ করত। ফেমো শুধু গ্রামের লোকদের বিদ্যাদান করেই ক্ষান্ত হয় নি। ইয়েনমোকে শিক্ষা দিয়েই তৃপ্ত হয় নি। তার উৎসাহ বড়দার অন্দর পর্যন্ত হানা দিল। সমস্যাটা এরকম দাঁড়িয়েছিল, ফেংমো তার স্কুলের জন্য যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক পায় নি। তখন বড়বৌদি মেংকে আলসেমি করে বসে বসে মুটোতে দেখে, সে একদিন তাকে জিজ্ঞেস করল, যে রুলাং ও লিনউয়িকে সাহায্য করতে পারবে না কেন? বয়স্ক নারীদের সাক্ষর করা বা সেলাই শেখানোর কাজে রুলাং ও লিনউয়ি

হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল।

আমি? আমি তো বাপের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আর কখনো সদরের চৌকাঠ পার হই নি, মেং হতচকিত হয়ে বলল।

কিন্তু বৌদি, আপনার এটা করা উচিত। আপনার বাচ্চাদের জন্য নার্স আছে, আপনার বড় ছেলের জন্য মাস্টার, আপনার গৃহস্থালী সামলাবার জন্য চাকর আছে। আপনি অনায়াসে রোজ দু-এক ঘণ্টা করে আমাদের সাহায্য করতে পারেন, ফেংমো বলল।

মেং খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, মাপ করো বাপু। তোমার দাদা এতে মোটে মত দেবে না।

কিন্তু বৌদি, আপনি লেখাপড়া শিখেছেন। আমাদের দেশে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিরই একমাত্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেই শিক্ষাকে ব্যবহার করার অধিকার নেই।

বেশ, আমি তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস করব, মেং ওকে নাছোরবান্দা দেখে বলল।

মেং কাঁদতে কাঁদতে ফেংমোর প্রস্তাবটা পেশ করল লিযাংমোর কাছে। সে বলল, ওর কথা শুনে নিজেরই খারাপ লাগছে।

লিযাংমো শুনে রেগে গেল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে ভাঁজ করে রেখে বলল, ফেংমোটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। এযে রীতিমত উপদ্রব! আশ্চর্য! ওর মাথায় নিত্যনতুন চিন্তা ঘুরঘুর করে, আর ও সেগুলি নীরিহ লোকগুলোর মাথায় ঢোকায়। এই সেদিন কয়েকজন মোড়ল এসে বলল যে এখন থেকে ওরা আর দালালের কাছে ফসল বেচবে না। যা বেচবার ওরা সরাসরি বেচবে। তা, শুধোলাম কী করে হিসেবপত্তর রাখবে হে ভালো মানুষের পো। তা দেখলাম ফেংমো ওদের হিসেব করার আঁক শিখিযে দিয়েছে। আচ্ছা, বলো তো এই দালালরা যাবে কোথায়, খাবে কী? এই দুনিয়াতে সবারইতো জায়গা আছে। যতসব আদিখ্যেতা।

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে থেকে সে মেংকে বলল, দ্যাখো বড়বৌ, আমি তোমাকে বারন করে দিচ্ছি তুমি ফেংমোর সঙ্গে কোন বাক্যালাপই করবে না। ওর সঙ্গে আমি নিজেই কথা বলছি।

দোকান থেকে আগে বেরিয়ে লিংয়ামো একদিন নিজেই গ্রামে চলে এল। গ্রামের নবার্জিত পরিচ্ছন্নতা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। অবাক-ভাবটা গোপন রেখে সে এগিয়ে গেল। শেষপর্য্যন্ত দুই ভাইতে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। বিশেষ করে সাদাসিধে পোষাকে লিনউয়িকে দেখে সে খুব চটে গিয়ে বলল, এ-ধরনের বেশবাস বাড়ীর মর্যাদার পরিপন্থী। এতে বুলাং ও প্রতিবাদ করে। হাসপাতাল স্কুল সবকিছুতেই তার আপত্তি। গরীবদের এত দিলে

বৃদ্ধা কৃতজ্ঞতা ও ক্ষোভের সঙ্গে সব কিছু শুনছিলেন। সবশেষে শ্রীমতী ওয়ায়্ বললেন, তবে চলুন—আমরা গ্রামে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে আসি। দেখবেন, আপনার মেয়েকে যত্নেই রাখা হয়েছে। কাজেই আর দেরী না করে তিনি সীডান গাড়িখানা বের করতে বললেন এবং তারা দুজনে গ্রামে চলে গেলেন। এমনি অনেকদিন ধরেই শ্রীমতী ওয়ায়ুর গ্রামে যাবার কথা ছিল। কিন্তু বেশী ঠাণ্ডা, বেশী গরম এবং মাঝেমাঝেই ঠাণ্ডা-জ্বরের দরুণ তাঁর আর গিয়ে ওঠা হয় নি। এছাড়া বই পড়ার ঝোঁকটাও ছিল। এবার গিয়ে যা দেখলেন তাতে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। সারা গ্রাম ঝকঝকে তকতকে। বেশ সচ্ছলতা সবাইর। গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। গ্রামবাসীরা সগর্বে একটা মাটির বাড়ি দেখাল, যেখানে তাদের স্কুল বসে। ফেংমো তাঁকে তার স্কুল সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলত এবং তিনিও 'ও তাই নাকি, আচ্ছা বেশ, ভালো তো'—এরকম সব মন্তব্য করে যেতেন। এখন বুঝতে পারছেন যে আগে তিনি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। একজন ছুটে গেল আগেভাগে খবর দিতে। সবাই তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য। লিনউয়ি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। তাঁকে এ-কথা জানানো হল। লিনউয়ির স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তার গাল টুকটুকে লাল। ঠোঁটে রং না দেওয়া সত্ত্বেও তা ডালিমের মতো রাঙা। গায়েও বেশ ভারি-ভারিক হয়েছে। সে তার লম্বা চুলের কোঁকড়ানো ডগাগুলো ছেঁটে ফেলেছিল। এটা দেখে শ্রীমতী ওয়ায়্ পরম পরিতুষ্ট হলেন।

সবচেয়ে খুশি হলেন লিনউয়ির হাবভাব দেখে। তার চালচলনে সশ্রদ্ধ ভাবটা এসেছে, ক্ষিপ্রতার সংযোগ হয়েছে সেই সঙ্গে। আগের সেই আল-সেমি ভাবটা আর নেই।

ফেংমোর বাড়িতে গিয়ে তারা বসলেন। পুরো কাহিনীটার পুনরাবৃত্তি করা হল এবং চিউমিং ও তার বাচ্চাকে ডেকে পাঠানো হল।

চিউমিং এসে দাঁড়াতেই মা ও মেয়ে দুজনে দুজনের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। তারা পরস্পরের পরিচয় যেন বুঝতে পারল। দুজনের মুখের সাদৃশ্য এত বেশী যে নাড়ীর যোগ না থাকলে এমনটি হয় না। যারা দেখছিল, তারা সবাই হেসে উঠল, বিচিত্র এক কাহিনীর ঐন্দ্রজালিক উপসংহার দেখে। শ্রীমতী ওয়ায়্ আগাগোড়া চুপ করে থাকলেও তিনিই সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন।

মাগো, আমার মা, চিউমিং কেঁদে উঠল।

এই তো আমার খুকী, আমার হারানিধি, বৃদ্ধা বললেন। মা ও মেয়ে দুজনেই

কাঁদছিলেন। বৃদ্ধা তাঁর নাতিকে কোলে নিলেন। মেয়েটা কেঁদে হাত-পা ছুঁড়ছিল। তাকে কষে একটা চড় মারল। মেয়েটা আরও জোরে কেঁদে উঠল। বৃদ্ধা চিউমিংকে বকলেন। নটেগাছটি মুড়োলো—এমন ভাবে আবার সব কিছু সহজ হয়ে গেল। বৃদ্ধা নিশ্চয়ই তাঁর হারানো মেয়েকে আর নাতিকে নিয়ে যাবেন। চিউমিং এজন্য শ্রীমতী ওয়ায়ুর অনুমতি চেয়ে নেবে।
আমি যাব দিদি? ভীরু স্বরে চিউমিং জিজ্ঞেস করল।
শ্রীমতী ওয়ায়ু দেখছিলেন যে চিউমিংকে ভাল দেখাচ্ছে না। গ্রামের পরিচ্ছন্ন আলো বাতাস, তরতাজা খাবার দাবার সত্ত্বেও চিউমিংকে যেন কেমন পাণ্ডুর দেখাচ্ছে! তার চোখ কোটরাগত। সে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে! তিনি আরও লক্ষ করেছিলেন যে সে লিনউঁয়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল বারেবারে। নাঃ মেয়েটার এখানে থাকা পোষাবে না। এখান থেকে ওর চলে যাওয়াই ভালো। তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন।
যদি তোমার গর্ভধারিনী জননী না হয়ে অন্য কেউ হতেন, তবে আমি তোমাকে যেতে দিতাম না। ভগবান আজ মা ও মেয়েকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আমি কী করে তোমাদের আলাদা রাখব? তুমি নিশ্চয় যাবে। তবে তার আগে আমি তোমার ও তোমার মেয়ের জন্য নতুন জামা তৈরী করিয়ে দেই এবং পথে যা যা লাগবে তার যোগাড় করে দেই। এ বাড়ি থেকে তুমি খালি হাতে যেতে পারবে না।
বৃদ্ধা প্রতিবাদ করে বললেন, তার কোনো দরকার হবে না। কিন্তু শ্রীমতী ওয়ায়ু ছাড়লেন না। বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।
এরপর অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, চিউমিং মেয়েকে নিয়ে মার সঙ্গে সেই পান্থ-শালায় ফিরে গেল। তখন থেকে মার সঙ্গেই সে থাকতে লাগল।
শ্রীমতী ওয়ায়ুও কিছু বললেন না। কেবল ওদের যাবার সময় চিউমিং-এর মাকে একান্তে ডেকে বললেন, আপনার খুকীকে একলা থাকতে দেবেন না ভাই। ভাল একটি পাত্র দেখে তার হাতে ওকে তুলে দিন। ও নতুন করে জীবন শুরু করুক।
বৃদ্ধা সেই মর্মে কথা দিলেন। চিউমিং ওয়ায়ু ভবন ছেড়ে যাবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু তৈরী হয়ে গেলে সে মার সঙ্গে চলে গেল। শ্রীমতী ওয়ায়ুকে আলাদা করে বিদায় জানাবার জন্য আর সে এল না।
তিনি বুঝলেন, এটা বিস্মরণ বা অকৃতজ্ঞতার জন্য নয় বরং এটা এজন্য যে ফেংমোর মার সঙ্গে তার আর কিছু বলার নেই। সে তাঁর স্নেহ প্রীতি পাবে। এরপর থেকে চিউমিং-এর সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয় নি। প্রতি বছর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিজে তলায় সই করে তাঁকে একটা করে চিঠি দিত। শুভেচ্ছা

ছেলেটিকে দেখছিলেন তিনি। অবিকল আঁদ্রের মতো কালো চোখ তবে ততটা আযত নয। হ্যাঁ, আঁদ্রের মতোই হাতের ও মাথার গড়ন। সবই আঁদ্রের থেকে ছোট ও সবু সবু।

নিঃশ্বাস ফেলে মুখ ঘোবালেন তিনি। আপনি আপনার কাকাকে খুঁজতে এখানে এসেছেন? তিনি প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। আমার বাবা-মা জানতেন তিনি কোথায আছেন। যদিও অনেক বছর হল তিনি কোন চিঠি দিতেন না। এখান দিযে যাবার সময মনে হল, যাই না একবার। খোঁজ নিযে দেখি না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। তরুণটি বলল।

তিনি আমাদের জমিতে চিরনিদ্রায নিদ্রিত হযে আছেন।

আমার ছেলে আপনাকে সেই কবর দেখাতে নিযে যাবে তিনি বললেন।

কযেক মূহূর্ত তারা নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত করলেন। শ্রীমতী ওযাযু বিচিত্র এক ঈর্ষা অনুভব করছিলেন। চোখ বন্ধ করে স্মৃতির কোমল চন্দকার পটে আঁদ্রের ছবি দেখতে পেলেন।

আহ, আঁদ্রের তাহলে আত্মীয পরিজন ছিল—তারা অনেক দূরের মানুষ।

তরুণটি হেসে বলল আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন যে তিনি কেন সব ছেড়েছুড়ে এতদূরে এসে থাকতেন।

ফেংমোই বলল আমরা কী করে জানব? তা বুঝতে পারি নি আমরা।

উনি নিজের ধর্মসম্প্রদাযের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। গীর্জা কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবিশ্বাসী বলে ধর্মচ্যুত করেন। তিনি ছিলেন সমর্থনহীন অনিকেত মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানি না আমরা। অর্থ সাহায্য করলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন না, তরুণটি বলল।

কিন্তু তিনি কোন অন্যায করেন নি ফেংমো বলল। না, তা তিনি করেন নি। তিনি এরকম ভাবতেন। তিনি ভাবতেন নারী ও পুরুষ দিব্যজীবনের অধিকারী। আমাদের যুগে এ-রকম ধারণাকে 'পাপ' বলে ধরা যায না। কিন্তু তাঁর যুগে তা ছিল ভযঙ্কর পাপ। তিনি কার্ডিনালকে একটা চিঠি লিখে তার মনোভাব জানিযেছিলেন। আমার বাবাকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে তিনি সব কথা খুলে জানিযেছিলেন। তাঁর কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নি। মা বলতন তাঁর নিঃসঙ্গতার জন্য তাঁর মাথার গোলমাল হযেছিল,

সব কথা ফেংমো তর্জমা করে বুঝিযে দিচ্ছিল শ্রীমতী ওযাযুকে। তিনি নীরবে শুনছিলেন। তাঁর নিজের স্বজাতীযরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল! চোখ বুজে তিনি স্বগত বললেন, কিন্তু আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করি নি আঁদ্রে।

অনেকক্ষণ এভাবে বসে রইলেন তিনি ! ফেংমো একটু উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। তারপর তিনি বললেন, এই ভদ্রলোককে বলে দাও যে তাঁর কবর এখান থেকে অনেকটা পথ। পথ খুব সরু ও বিচ্ছিরি। আর গেলেও কবর ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।

তরুণটি শুনলেন, তারপর বললেন, যদি অত দূরেই হয় তবে না যাওয়াই ভাল। আমাকে আবার জাহাজ ধরতে হবে ঠিক সময়ে। তাছাড়া, কবর ছাড়া কিছু যখন নেই-ই সেখানে।

বিদায় জানিয়ে তরুণটি চলে গেল ফেংমোর সঙ্গে। ওরা চলে গেলে শ্রীমতী ওয়ায়ন্ যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন কিছুক্ষণ একা থাকার দরকার তাঁর। অাঁদের সম্পর্কে টুকরো টুকরো খবরগুলি একত্র করে নেবেন তিনি। এতদিন তিনি এখানে নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষের মতোই তো ছিলেন ! এবার পূর্ণাঙ্গ পটভূমির মাঝখানে তাঁকে দেখার পালা।

তবে শুধুই কি নিঃসঙ্গ ? তাঁর ওই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েরা. ওই ভিখারীরা ওরা তো ছিল।

আর তিনি নিজে—কেমন করে প্রাণের অন্তঃপুরের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিলেন তাঁকে, তা কি তিনি নিজেই জানেন ? বোধহয়, না। অাঁদেকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে-ই দ্বারমুক্ত করে সেই অচেনা অতিথিকে স্বাগত জানিয়েছিলন। সেই অতিথি তাঁকে দিয়েছিলেন শাশ্বত জীবনের সন্ধান।

হ্যাঁ, তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে তাঁর দেহের মৃত্যু হলেও আত্মা অগ্রসর হয়ে চলবে। তিনি কোনো দেবতার পূজো করেন নি। কোনো ধর্মমতেই তাঁর বিশ্বাস ছিল না কিন্তু ভালবাসাকে পেয়েছেন চিরকালের জন্য। তাঁর নিদ্রিত সত্তার দরজায় করাঘাত করে ভালবাসাই আপন সুর শুনিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিয়েছে, করেছে মৃত্যুহীন।

তিনি বুঝতে পারছেন, তিনি সেই অমৃতের কন্যা যার মৃত্যু নেই। যা শাশ্বত। যার ক্ষণকালের বীণায় বাজে চিরকালের আনন্দ ঝংকার।

বড়লোকদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা থাকল কোথায় ? সেই বিরাট ঝগড়ার পর লিয়াংমো ফিরে গেল।

আজকাল শ্রীমতী ওয়ায়ু তাঁর মহল ছেড়ে বড় একটা বেরুতেন না। বেরুলে, মন্দিরে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখে আসতেন। এ ছাড়া, শহরের দক্ষিণাঞ্চলে যে বৌদ্ধ আশ্রমটা ছিল, তাতে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। এঁরা শহরের সীমানার কাছে যে পাঁচীলটা ছিল সেখানে পরিত্যক্ত শিশুদের কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে কোন চাষী বা দয়ালু ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতেন। আঁদ্রের আদর্শ অনুযায়ী, তিনি আশ্রমকে এ-রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনিও মন্দিরের আশ্রিত মেয়েরা ষোলয় পা দিলেই, তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

ফেংমোর রকম সকম দেখে একদিন তিনি আঁদ্রেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা বলুন তো, মা-বাবার প্রতি কি ছেলের কোন কর্তব্য নেই ?

আঁদ্রে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, এ-কথার উত্তর দেবার মত লোক আমি নই।

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, পিতৃগৃহ ছেড়ে ছেলেকে কতদিন বাইরে থাকতে অনুমতি দেওয়া যায়।

আঁদ্রে এক ভাবেই বলেছিলেন, পিতৃগৃহ তো কোন ছেলের জন্মস্থান মাত্র, এর বেশী আর কিছু নয়।

এখন লিয়াংমোর অভিযোগ শুনে সেকথা মনে পড়ল। লিয়াংমো ফেংমোর নামে অভিযোগ করছিল।

শ্রীমতী ওয়ায়ু অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। নীরবতার মূল্য তিনি জানতেন। শেষে বললেন, দ্যাখ কারু মন বা আত্মাকে তার নিজের ছাঁচেই গড়ে নিতে হবে। তোমাকে যেমন কেউ অন্যের মতো চলতে বাধ্য করতে পারে না, তেমনি তুমিও কাউকে তোমার ইচ্ছেমত চালাতে পারো না। তুমি তোমার জায়গায় থাকো। ফেংমোকে তার জায়গায় থাকতে দাও।

তবে ওকে আমার মহলে আসতে বারণ কোর, লিয়াংমো রেগে বলল।

বেশ বলব, শ্রীমতী ওয়ায়ু প্রতিশ্রুতি দিলেন। সে কথা তিনি অবিলম্বে রাখলেন।

বছরগুলি পার হয়ে যাচ্ছিল সূর্যের আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতিতে। শ্রীমতী ওয়ায়ু ক্বচিৎ তাঁর আপন মহল ছেড়ে বাইরে পা দিতেন। তবু চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট খবর রাখতেন। ধৈর্যশীলা শ্রোতা এবং ধীরস্থির বিচক্ষণ অভিমতের জন্য তিনি বরাবরই খ্যাত ছিলেন। অনেকেই পরামর্শ নেবার জন্য আসত। শহরেও গ্রামাঞ্চলে সব বড়

ব্যাপারই তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হত। যেমন লিটল সিসটার সিয়া এক শীতে মরে গেলে তাঁর মৃতদেহ কীভাবে কী করা হবে সেকথা তিনিই স্থির করে দিয়েছিলেন। শেষদিকে মহিলা খিটখিটে হয়ে উঠেছিলেন। নিজের ধর্মের ও নিজের দেশের লোকদের সঙ্গেই ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি মরে গেলে, তাঁর রান্নার ঠাকুর ছাড়া শোক করবার মতো কেউই ছিল না। শ্রীমতী ওয়ায়ুই তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করে দেন।
আঁদ্রের ছবির সামনে, মাটির তৈরী দেবতাদের সামনের ভূমিতে লিটল সিয়াকে কবর দেওয়া হল।

যুদ্ধের শেষে সারা দেশ জুড়ে একটা হতবুদ্ধিকর বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা গেল। বহিরাগত অনেক আগন্তুক এসে সেই বিশৃঙ্খলার সমাধান করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে লাগল। ওয়ায়ু পরিবারকে তা স্পর্শ করল না। কিন্তু ওই সব বিদেশীরা এ-অঞ্চলেও আসা-যাওয়া করতে লাগল। কারণ ফেংমো তাদের নেমন্তন্ন করে আনত। পশ্চিমের লোক শুনলেই ফেংমো তাকে ডেকে পাঠাত তার কাজ সম্পর্কে উপদেশ পরামর্শের জন্য।
এইসব বিদেশী অতিথিদের অবশ্য শ্রীমতী ওয়ায়ু অভ্যর্থনা জানাতেন না, কারণ তিনি তাঁদের ভাষা জানতেন না। একদিন ফেংমো তাঁকে বিশেষ ভাবে বলে পাঠাল যে সমুদ্র পেরিয়ে একজন বিদেশী এসেছেন, যার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ কারণ আছে। তিনি সম্মতি দিলেন। ফেংমো সঙ্গে করে এক দীর্ঘকায় বাদামী চামড়ার এক তরুণ বিদেশীকে নিয়ে এল। তাঁর বাদামী রং দেখে তিনি অবাক হয়ে ফেংমোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।
ইনি কি বিদেশী?
ইনি বিদেশী, তবে এঁর পূর্বপুরুষ ইতালীর লোক। ইতালী তাঁদের জন্মভূমি, ব্রাদার আঁদ্রের দেশ, ফেংমো বলল।
শ্রীমতী ওয়ায়ুর মন যেন আলোড়িত হয়ে উঠল! ভাষার ব্যবধান ভুলে তিনি ঝুঁকে পড়লেন সামনে। রূপোর হাতলওয়ালা লাঠিটার ওপর তাঁর হাত কেঁপে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সেই বিদেশী পাদ্রী সাহেবকে চিনতেন?
ফেংমো এগিয়ে এসে কথাটার তর্জমা করে দিল। তার তর্জমার সাহায্যে শ্রীমতী ওয়ায়ু ও সেই তরুণের কথাবার্তা হল ঃ
আমি তাঁকে চিনতাম না। আমার বাবা-মা তাঁর কথা বলেছিলেন। তিনি আমার কাকা।
আপনার কাকা! আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তিনি! শ্রীমতী ওয়ায়ু মন্তব্য করলেন।